এই পৃথিবী পান্থনিবাস

রমাপদ চৌধুরী

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২ কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬
মুদ্রাকর
শ্রীসুকুমার চৌধুরী
বাণী-শ্রী প্রেস
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬
প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
নিউ প্রাইমা প্রেস

প্রচ্ছদপট
শ্রীসমীর সরকার

পাঁচ টাকা

এ উপন্যাসে বর্ণিত হোটেলটি যদি কোন সত্যিকার হোটেলের সঙ্গে মিলে যায় তা হলে সেই হোটেলের মালিককেও কেউ যেন হিমাদ্রিবাবু মনে না করেন। অন্যান্য চরিত্রগুলিও সকলেরই চেনাজানা, সুতরাং কোন বিশেষ ব্যক্তি নয়।

এই লেখকের

॥ উপন্যাস ॥

দ্বীপের নাম টিয়ারঙ

লালবাঈ

প্রথম প্রহর

দুটি চোখ দুটি মন

অরণ্য আদিম

॥ গল্প ॥

দরবারী

আপন প্রিয়

কথাকলি

কখনো আসেনি

পিয়াপসন্দ্

মুক্তবন্ধ

॥ প্রবন্ধ ॥

রূপযানী

পত্রনবীশের শুভদৃষ্টি

ছবিকে দিলাম

হাবেভাবে, কথায় বার্তায়, এমন কি চেহারাতেও কোন রসের পরিচয় নেই। তবু ভদ্রলোক যে রসিক তার প্রমাণ হোটেলটির নামকরণে। বড় বড় চৌকো পাথরের দেয়াল বাড়িটার। এ অঞ্চলের অন্য সব বাড়ির মতই। ইঁটের দাম এখানে বেশী, পাথর সস্তা, আরো সস্তা পাথুরে-শরীর লোকগুলোর মজুরী। তাই কাছাকাছি টিলার ঢল কেটে, যাকে এখানকার লোকরা বলে পাথরের খনি, সেই খনি থেকে পাথর এনে বাড়ি বানায় সকলে। এখান থেকে সমুদ্র খুব বেশী দূরে নয়, তাই ইঁট তো দূরের কথা, লোহাতেও নোনা ধরে। পাথরের বাড়িগুলো কিন্তু টেঁকে অনেকদিন। টেকসই অথচ সস্তা বলেই হিমাদ্রিবাবুর হোটেলটাও পাথরের তৈরী।

মজবুত হলেও বাড়িটার শ্রী নেই। লম্বা ব্যারাকের মত। সারি সারি ঘর, সারি সারি জানালা ওপরে নীচে। নীচে আটখানা ছোট ছোট ঘর, দোতলায় আট খানা। প্রতিটি ঘরের সামনে ক্যালেণ্ডারের তারিখ কেটে বসিয়ে নম্বর আঁটা হয়েছে। ওদিকে দরমার দেয়াল আর টিনের ছাউনী দেওয়া রান্নাঘর, জলঘর, আরও কি কি। তারও ওপাশে দু'খানা ঘরে হিমাদ্রিবাবুর সংসার।

হোটেলটার সামনে খানিকটা বাগান। বাগানে পনেরো আনা গাঁদা ফুলের গাছ। সারি সারি হলুদ রঙের, গেরুয়া রঙের গাঁদা ফুল ফুটে থাকে। ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটে রজনীগন্ধা, গোলাপ, যুঁই। আর পাতাবাহার।

স্টেশন থেকে যে বড় রাস্তাটা মন্দিরের দিকে গেছে, তার পাশেই হিমাদ্রিবাবুর হোটেল। রাস্তা থেকেই দেখা যায় পাথরের দেয়ালে বড় বড় হরফে লেখা আছে, 'পান্থপাদপ'।

'পান্থপাদপ' যিনি হোটেলের নাম দিয়েছেন, তিনি অন্তত একটি ক্ষেত্রে রসিক, কিন্তু যাদের জন্যে এই হোটেল, তাঁরা সকলেই রসজ্ঞ নাও হতে পারেন, এই আশঙ্কায় নামটার নীচেই বড় বড় হরফে ইংরেজী ও বাংলায় লেখা আছে, 'স্যানাটোরিয়াম অ্যাণ্ড হোটেল'।

নানা লোকের আনাগোনা হয় এখানে। কেউ আসে পুরোনো দিনের অপূর্ব কারুকার্যের নিদর্শন ঐ আকাশচুম্বি মন্দিরটা দেখতে, কেউ তীর্থ করতে, কেউ বা কুণ্ডের জল খেয়ে শরীর সারতে। হ্যাঁ, মন্দিরের কাছেই একটা কুণ্ড আছে, দুধের মত তার জলের রঙ, দুধের চেয়েও নাকি উপকারী তার জল। গুজব ছড়াতে ছড়াতে এতদূর গিয়ে পৌঁচেছে যে, ভারতবর্ষের সব প্রান্ত থেকেই হতাশ-রুগীর দল একবার না একবার আসবেই এখানে।

সম্প্রতি ব্যবসা জেঁকে উঠছে হিমাদ্রিবাবুর, আরো একটা কারণে। এই কুচালি গাছের জঙ্গল আর পাথুরে টিলার অঞ্চলটুকু একটা বড় শহর হয়ে উঠছে। শহর হয়ে উঠছে বলেই ব্যবসার টানে নিত্যদিনই লোকজনের আগমন ঘটছে। দুদিনই থাক, দশদিনই থাক, হিমাদ্রিবাবুকে কিছু দিয়ে যেতেই হবে। কারণ এখানে আর কোন হোটেল নেই। নেই বলেই 'পান্থপাদপ'কেও হোটেল বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয় সকলে।

'পান্থপাদপের' মালিক হিমাদ্রিবাবুও হোটেলটির মতই জরাজীর্ণ। দীর্ঘ অথচ শীর্ণ কালো চেহারা, মাথার চুল সব কটি বয়সের আগেই সাদা হয়ে গেছে, চোখদুটো পুরু চশমার আড়ালে

আরো ঘোলাটে দেখায়। সব মিলে চেহারাটা কেমন যেন খেজুর গাছের মত রুক্ষ।

ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই এক কাপ চা খেয়ে বাগানে ঢোকেন হিমাদ্রিবাবু। না, ফুলের বাগানটায় নয়। পিছন দিকে খানিকটা জায়গা জুড়ে বেগুনের চারা বসিয়েছেন, দুটো লাউ গাছ উঠেছে রান্নাঘরের চালায়, খুরপি হাতে সেগুলোরই তদারক করেন, ঝারায় করে জল দেন। তারপর এটা সেটা সারতে সাতটা বাজে, ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি। এক বাণ্ডিল ছাপানো হ্যাণ্ডবিল থাকে হাতে, একখানা বাঁধানো খাতাও।

হ্যাণ্ডবিলে হোটেলের গুণগানে ভরা নানা ভনিতা, দরদাম, সকালে কি খেতে দেওয়া হয়, চা ক'বার। জ্ঞাতব্য বিষয় সবই লেখা আছে হ্যাণ্ডবিলে। আর বাঁধানো খাতাটায় পাতার পর পাতা জুড়ে খ্যাত, অল্পখ্যাত, অখ্যাত ব্যক্তিদের মন্তব্য। এ হোটেলে যাঁরাই এসেছেন, তাঁরাই দু'চার লাইন লিখে দিয়ে গেছেন প্রশংসা করে।

স্টেশনে পৌঁছে সাইকেলটা তারের বেড়ায় ঠেসিয়ে রেখে প্লাটফর্মে ঢোকেন হিমাদ্রিবাবু। তারপর কোলকাতার গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন।

প্রতিদিনই দু'চারজন নামেন এখানে। হিমাদ্রিবাবু নতুন লোক দেখলেই এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করেন, হ্যাণ্ডবিল এগিয়ে দিয়ে পুরো হ্যাণ্ডবিলটাই প্রায় মুখস্থ বলে যান। তারপর বাঁধানো খাতাটা মেলে ধরেন: দেখুন না কে কি বলেছেন।

দেখার দরকার করে না, সারা রাত ট্রেন-দুর্ভোগের পর যাত্রীরা তখনকার মত একটা আস্তানা পেলেই বেঁচে যায়। এক কথাতেই রাজি হয়ে যায় অনেকে।

হিমাদ্রিবাবু নিজেই কুলি ডাকেন, রিক্সা ঠিক করে দেন। তারপর রিক্সার পাশে পাশে সাইকেল চালিয়ে এনে হাজির করেন তাদের এই 'পান্থপাদপে'।

সেদিনও এমনি নতুন যাত্রী খুঁজতেই এসেছিলেন।

ট্রেনটা তখনও পুরোপুরি থামে নি।

হিমাদ্রিবাবু দেখলেন, চলন্ত ট্রেনেরই একটা কামরার দরজা খুলে এক ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন।

এ-চোখ হিমাদ্রিবাবুর চেনা। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝে নিয়েছেন, এমনভাবে তাকানোর অর্থ, ফাঁপরে পড়েছি, উদ্ধার করো।

খদ্দের বেছে নিতে জানেন হিমাদ্রিবাবু, খুচরো যাত্রীর চেয়ে লাভ বেশী 'ফ্যামিলি' পেলে। অর্থাৎ একসঙ্গে অনেকগুলি খদ্দের পাবার সম্ভাবনা থাকলে সেদিকেই ছুটে যান। তাই ট্রেন থামতেই ভদ্রলোকের কাছে ছুটে গেলেন তিনি।

নমস্কার করে বললেন, কোথায় উঠবেন, হোটেলে তো?

আগন্তুক ভদ্রলোকের এমনিতে রাশভারী চেহারা। গায়ে ওভারকোট, হাতে ছড়ি, কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা ফ্লাস্ক।

হিমাদ্রিবাবুকে দেখে, তাঁর কথা শুনে একটু যেন নিশ্চিন্ত হলেন ভদ্রলোক। জিগ্যেস করলেন, হোটেল আছে এখানে ভালো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, একটাই আছে, আমারই হোটেল। দি পান্থপাদপ হোটেল অ্যাণ্ড স্যানাটোরিয়াম। মাথা পিছু চার টাকা, ছোটদের হাফ চার্জ···এই দেখুন না হ্যাণ্ডবিল ·····

ভদ্রলোক হ্যাণ্ডবিলটা নিলেন হাত বাড়িয়ে, কিন্তু পড়ে দেখলেন না। বললেন, চলুন দেখি তো আগে।

হিমাদ্রিবাবু সকলের কাছেই ঐ এক কথা শোনেন। জানেন

তিনি, দেখে পছন্দ হোক্ আর না হোক্ তাঁর হোটেলেই থাকতে হবে, যদি ধর্মশালায় না থাকে।

কুলি হুটো ততক্ষণে মালপত্র নামিয়ে ফেলেছে। ট্রেনের কামরা থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন বর্ষীয়সী এক মহিলা, কুড়ি বাইশ বছর বয়সের একটি আধুনিকা মেয়ে, আর দশ বারো বছর বয়সের একটি ফুলপ্যান্ট পরা ছেলে।

কুলির মাথায় ট্রাঙ্ক-বেডিং, স্যুটকেশ, বেতের বাক্স, কুঁজো, টিফিন-কেরিয়ার, আরো পাঁচটা টুকিটাকি তুলে দিয়ে হিমাদ্রিবাবু স্টেশনের বাইরে এসে রিক্সা ঠিক করে দিলেন। নির্দেশ দিয়ে দিলেন রিক্সাওয়ালাদের। না দিলেও চলতো, কারণ হিমাদ্রিবাবুকে তারা সকলেই চেনে। যেদিন হিমাদ্রিবাবুর স্টেশনে আসতে দেরী হয়ে যায়, সেদিন নতুন আগন্তুকদের তারাই নিয়ে গিয়ে তুলে দেয় পান্থপাদপে। হিমাদ্রিবাবুব কাছ থেকে যাত্রী প্রতি চার আনা বখ্‌শিস পায় তার জন্যে।

ভদ্রলোককে সপরিবারে রিক্সায় তুলে দিয়ে নমস্কার করলেন হিমাদ্রিবাবু। বললেন, চলুন আপনারা, আমি যাচ্ছি পিছনে পিছনে।

বলেই আবার স্টেশনের দিকে ছুটলেন তিনি। আরো কেউ নতুন যাত্রী আছে কিনা দেখতে। এবারের মরশুমটা ভালো, ভিড় লেগেই আছে। যদি হু'চারজন আরও পাওয়া যায়, এই আশায় তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন হিমাদ্রিবাবু। ওপর-নীচে পাঁচখানা ঘর এখনও খালি পড়ে আছে, তিন নম্বরের ছোকরাটি আজকালের মধ্যেই হয়তো চলে যাবে।

না, সব মুখচেনা লোক। নতুন কেউ নেই। বেশীর ভাগই নতুন শহরের সরকারী চাকুরে, হু'চারজন পাণ্ডা, আর সব স্থানীয় কুলিমজুর চাষাভুষো।

বাঁধানো খাতার মধ্যে হ্যাণ্ডবিলগুলো রেখে সাইকেলে উঠলেন হিমাদ্রিবাবু। মনে মনে অঙ্ক কষলেন, তিন জন অ্যাডাল্ট, তিন চারে বারো; হাফচার্জ একটা, বারো আর দুই চোদ্দ টাকা দিনে। ভদ্রলোক ক'দিন থাকবেন কে জানে। দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছেন, না চেঞ্জার? বাবা সিদ্ধেশ্বর, যেন চেঞ্জারই হয়। স্যানিটারী স্যানিটারী করে চেঁচায় সকলে, এবারটা যদি ভালো যায়, স্যানিটারীই করে দেবো পরের বার।

নিজের মনেই সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ছেড়ে একটা হাত কপালে ঠেকালেন হিমাদ্রিবাবু।

সিদ্ধেশ্বরের উদ্দেশে, না স্যানিটারীর উদ্দেশে, কে জানে।

হাওয়া বদল করতে এসেছেন অনেকেই। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যে বাড়িগুলো সারা বছর নির্জন পড়ে থাকে, এ-সময়টা সেগুলোই কলকণ্ঠে মুখরিত হয়ে ওঠে। এ-ছাড়া মন্দিরের কাছ ঘেঁষে আছে ধর্মশালা, কিন্তু তীর্থযাত্রীর ভিড়ে সেখানে আর তিলধারণের স্থান নেই।

যাঁরা বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছেন, তাঁরা সকলেই প্রায় প্রাতঃভ্রমণে বের হন সূর্য ওঠবার আগেই। ফেরেন, কোলকাতার ট্রেন শিস্ দিয়ে চলে যাবার পর।

সরু রাস্তার দু'পাশে সরে গেল চেঞ্জারের দল, সাইকেল-রিক্সার ঘন্টি শুনে। ফিরে তাকালেন কেউ, তাকিয়ে কেউ খুশী হলেন, কেউ মুচকি হাসলেন। কেউবা বিরক্ত হলেন।

অজয় সেনের পরিবার এ আধা-জংলা জায়গায় ঠিক যেন খাপ খায় না।

কোন একটা আমেরিকান আপিসের মোটা মাইনের অফিসার অজয়বাবু। অজয়বাবু বললে উনি অবশ্য চটে যান। বলেন, বাবুটাবু আমি পছন্দ করি না।

অর্থাৎ মিস্টার সেন বললে উনি খুশী হন।

মিস্টার সেনের স্ত্রীর বয়স যদিও চল্লিশোর্ধে, তবু তাঁর শরীরের গড়ন, আর বেশবাস প্রসাধনের কৃতিত্বে দেখায় যেন মেয়ে রুমার দিদির বয়সী। অচেনা অনেকে এমন ভুল করে, এবং ভুল যে করে সে কথাটা রুমার মা শ্রীলেখা দেবী নিজেই সকলকে বলে বেড়ান। কিন্তু তা বলে প্রসাধনের দিকটা খাটো করার পক্ষপাতী নন তিনি। রীতিমত আধুনিকা সাজতে দ্বিধা নেই তাঁর।

তবু এই অচেনা জায়গাতেও, স্বামীর সঙ্গে এক রিক্সাতে চড়তে রাজী হলেন না তিনি। দুটো রিক্সাতেই বাক্স বেডিং উঠলো। আর বেডিং-এর ওপর পা তুলে একটায় বসলেন শ্রীলেখা দেবী, মেয়ে রুমাকে নিয়ে, আরেকটায় অজয়বাবু, তাঁর ছেলে রেশমকে নিয়ে।

ধীরে ধীরে স্টেশনের ভিড় থেকে ছিটকে এসে স্যানাটোরিয়মের রাস্তায় নামতেই রুমার মনটাই সবচেয়ে প্রফুল্ল হয়ে উঠলো।

এই প্রথম সে কলকাতার বাইরে এলো।

রুমার সমস্ত মন যেন ঝুমঝুমি বাজালো। কি সুন্দর, কি সুন্দর!

বেডিংয়ের ওপর পা তুলে এভাবে বসতে রুমার যদিও অস্বস্তি হচ্ছিল, বিশেষ করে রাস্তার লোকগুলোর চোখের সামনে দিয়ে এ-ভাবে যেতে, তবু তার মনের ভেতরটা যেন চঞ্চল হয়ে উঠতে চায়।

এই নতুন জায়গার, না-দেখা জায়গার সবটুকু যেন একসঙ্গে দেখে নিতে চায় সে। দুর্ভিক্ষের ক্ষুধায় মানুষ যেমন ধীরেসুস্থে খেতে পারে না, এক গ্রাসে, না চিবিয়ে, স্বাদ না নিয়ে শুধু গিলে

ফেলতে পেলেই তৃপ্তি পায়, তেমনি রুমার চোখদুটোও যেন এতকাল ক্ষুধার্ত ছিল। এই ঠাণ্ডা হাওয়া, সবুজ প্রান্তর, দূরে দূরে খাটো মাপের টিলা, রাস্তার দু'পাশে কেয়ার ঝোপ, কেয়া আর বেতের, সরু সরু কচি-সবুজ বেতের স্ফুলিঙ্গ, কুচালি গাছের জঙ্গল, দূরে দূরে মন্দিরের চূড়া।

পিছনে পিছনে চলেছে দু'খানা রিক্সা।

মায়ের কাছ থেকে শুনে ডাক দেয় রুমা।—এই রেশম, ঐ দেখ্ বেত গাছ। আর ওগুলো কেয়া, ফুল ফোটেনি এখনও।

বাপের কাছ থেকে শুনে রেশম পিছনে তাকিয়ে চিৎকার করে, এই দিদি, এগুলো নাক্স ভমিকার গাছ।

একটার পর একটা নতুন তথ্যে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে রুমা আর রেশম। কিন্তু রাস্তার বাঁক ঘুরতেই রুমার মন হঠাৎ যেন চুপসে গেল।

এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা পাথরের ছোট ছোট বাড়িগুলো চোখে পড়েছে এতক্ষণ, ভালও লেগেছে, কিন্তু এমনি একখানা বাড়িই যে পান্থপাদপ স্যানাটোরিয়ম তা কল্পনাও করেনি।

লম্বা ব্যারাকের মত দোতলা বাড়িটার সারি সারি জানালার ওপর পাথরের দেয়ালে আলকাতরা দিয়ে লেখা নামটা চোখে পড়তেই কেমন যেন মুষড়ে গেল রুমা।—এই!

রিক্সা থামতে না থামতেই হিমাদ্রিবাবুর সাইকেলও এসে পৌঁছল। হিমাদ্রিবাবু এগিয়ে এলেন। চিৎকার করে ঝি চাকরদের ডাকলেন, বললেন, মালপত্র ছ' নম্বরে তুলে নিয়ে চল।

মিস্টার সেনের ইচ্ছে ছিল, হোটেলটা আগে একবার দেখে নেবেন। দেখে পছন্দ হলে তবেই, কিন্তু শরীর আর মনের শ্রান্তিতে হাল ছেড়ে দিলেন তিনি।

হোটেলের সামনে এক টুকরো গাঁদা ফুলের বাগান। পিছনের দিকে লাউ কুমড়ো বেগুনের। দরমার আড়াল দেওয়া রান্নাঘর, ক্ষয়ে যাওয়া সিঁড়ি, দরজা জানালার পাটাগুলোর পরস্পরের সঙ্গে যেন সতীন সম্পর্ক, কিছুতেই মিলেমিশে থাকতে চায় না, কড়া মেজাজের স্বামীর চড়চাপড় খেয়ে পাশাপাশি বন্ধ হয় বটে, কিন্তু দু'জনের মাঝখানে ফাঁক থেকে যায় অনেকখানি।

আর দরজার পর্দাটা যেমন পুরোনো, তেমনি নোংরা। দেখেশুনে মনে মনে বিরক্ত এবং হতাশ হলেও মিস্টার সেন পাইপে দেশলাইয়ের কাঠি খুঁচিয়ে ময়লা পরিষ্কার করতে করতে বললেন, ঠিক আছে।

ছ' নম্বর আর সাত নম্বর পাশাপাশি দু'খানা ঘর একেবারে এক কোণের দিকে। দুটো ঘরের মাঝখানে একটা দরজা, ইচ্ছে করলে খুলে দু'ঘরের মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা চলে। আর কোণের ঘরটায় চার চারটে জানালা, আলো-হাওয়া-রোদ কোনটারই কমতি নেই। সুতরাং এর চেয়ে ভাল আর কি আশা করা যেতে পারে।

হোটেলের চেহারা দেখে, ঘর দেখে, মেয়ের সঙ্গে চোখোচোখি করে হাসলেন শ্রীলেখা দেবী।

হিমাদ্রিবাবু ততক্ষণে হাঁকডাক শুরু করেছেন।—কৌতুকী, ও কৌতুকী। জিনিসগুলো ছ'নম্বরে দিয়ে যা।

নারীকণ্ঠের উত্তর এলো নীচে থেকে।—যাউছি বাবু!

হিমাদ্রিবাবু বললেন, ব্রেকফাস্ট দিতে বলবো?

'ব্রেকফাস্ট' কথাটা সাধারণত হিমাদ্রিবাবু ব্যবহার করেন না। বলেন, চা-জলখাবার। কিন্তু মিস্টার সেনের পোশাক পরিচ্ছদ, হাতের পাইপ, সাহেবী মেজাজ দেখে মুখ ফসকে 'ব্রেকফাস্ট' কথাটা বেরিয়ে গেল।

অজয়বাবু সায় দিতেই হিমাদ্রিবাবু ঠাকুরের উদ্দেশে হাঁকডাক করতে করতে নেমে গেলেন।

আর রুমা চাপা স্বরে বললে, কি ছিরি হোটেলের!

রেশম কিন্তু দিদির মত গলার স্বরটা চেপে রাখতে পারলো না। প্রায় চিৎকার করেই বলে উঠলো, ধর্মশালা মা, ধর্মশালা!

মিস্টার সেনও হাসলেন।

ইতিমধ্যে একটা ট্রাঙ্ক আর একটা বেডিং ঘাড়ে করে যে এসে দাঁড়ালো, তার দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল চারজনেই। একাধারে স্তম্ভিত আর বিরক্ত।

এই নাকি কৌতুকী? কৌতুক সত্যিই তার চেহারার কোন্ জায়গায় তা কেউই খুঁজে পেল না।

এমন কুৎসিত চেহারা কোন নারীর হতে পারে বিশ্বাস হয় না যেন। কালো শরীরের যতুটুকু নিরাবরণ—হাত, গলা, চিবুক—সর্বত্র কদর্য উল্কির নক্সা। শ্রীহীন মুখখানা উল্কির কলঙ্কে যেন আরও বীভৎস, আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বিস্ময় মানতে হয় তার শক্তি দেখে। যে ট্রাঙ্ক আর বেডিং মাথায় তুলতে হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল স্টেশনের কুলি, কৌতুকী অবলীলায় সে হুটোকে বয়ে নিয়ে এসেছে সিঁড়ি ভেঙে।

ঘরে হু'খানা ছোট ছোট তক্তপোশ, একখানা ছোট টেবিল, একটা নড়বড়ে চেয়ার।

বাক্স আর বেডিং তক্তপোশের ওপর নামিয়ে রাখলো কৌতুকী। ক্রমে ক্রমে বাকী মালপত্তরও নিয়ে এলো।

তারপর যা বললে তার অর্থ হলো, কুঁজোয় জল এনে দিচ্ছি, যখন যা দরকার আমাকে ডাকবেন।

রুমা ফিসফিস করে মাকে শুনিয়ে বললে, তাই যাও বাবা, বেশিক্ষণ থাকলে গা বমি বমি করবে।

রুমার কথা শুনে সকলেই হেসে উঠলো, আর কৌতুকী কি বুঝলো সেই জানে, সেও হেসে উঠলো অপরিষ্কার হলদে ছোপ ধরা দাঁত বের করে।

ঠাকুর ট্রে হাতে চা-খাবার নিয়ে ঢুকতেই কৌতুকী চলে যাচ্ছিল। রুমা ডাকলে, কৌতুকী, হাত পা ধোবো কোথায়? জল?

কৌতুকী হেসে বললে, আস, দেখাই দিব।

সুতরাং তার পিছনে পিছনে গিয়ে জলঘরে পৌঁছলো রুমা।

যেমন হোটেল তেমনি বাথরুম।

বাথরুমের পাশেই একটা কুয়ো। এ অঞ্চলের কুয়ো যেমন হয়। হাত পাঁচেক নীচেই জল, কিন্তু কুয়োর চারপাশে দেয়াল দেওয়া নেই। একটু পা পিছলে গেলেই একেবারে কুয়োর মধ্যে পড়তে হবে।

সেই কুয়ো থেকে জল তুলে দিতে শুরু করলো কৌতুকী। আর এই দু'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রুমা শুনতে পেলো, হোটেলের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি সব ঘর থেকেই মাঝে মাঝে ডাক আসছে কৌতুকীর উদ্দেশে।

—কৌতুকী, জল দিয়ে যা।

—কৌতুকী, কাপড় কাচি দিলা?

—কৌতুকী, কাপ প্লেটগুলো নিয়ে যা।

—কৌতুকী, আমারো বাচ্চারো কাঁথা শুকাই কিরি কোঁয়ারে রাখিলা?

শোনে আর কৌতুকী সাড়া দেয়। —যাউছি, যাউছি

পেটের ভেতর একটা চাপা হাসি যেন ফেটে পড়তে চায়। কোন রকমে হাসি চেপে কাপড় বদলে রুমা বেরিয়ে এলো কাঁধে গোলাপী তোয়ালেটা ফেলে।

ভিজে শাড়িটা তুলতে যাচ্ছিল রুমা, একরকম তার হাত থেকেই কেড়ে নিলো কৌতুকী।

রুমা হাসতে হাসতে ওপরে উঠে এলো। আর উঠে আসতে আসতে দেখলো, আট নম্বরের বৃদ্ধ লোকটি পুরু লেন্সের চশমার আড়াল থেকে রুমার শরীরটা তন্ন তন্ন করে দেখছেন।

বিশ্রী একটা অস্বস্তি থেকে রেহাই পাবার জন্যে তাড়াতাড়ি একরকম ছুটতে ছুটতেই—রুমা পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো।

আট নম্বরের লোকটি বৃদ্ধ হলেও রসিক। দেহের যৌবন বহুকাল আগেই কেটে গেলেও মনের যৌবন তাঁর বোধহয় কাটেনি। নামটাও তাঁর সার্থক, অন্তত তাঁর ধারণা।

রমণীরঞ্জন দত্ত।

বছর আষ্টেকের হাফ-প্যান্ট পরা একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন তিনি। এসেছেন দুধ কুণ্ডের জল খেয়ে নিজের পেটের গোলমাল সারাতে। কিন্তু সেটা স্বীকার করেন না। বলেন, এসেছি ছোট ছেলেটার জন্যে।

সকাল বিকেল বেড়াতে বেরিয়ে সেই দিকটাতেই যান, যেদিকে চেঞ্জারদের ভীড়। অর্থাৎ যেদিকে আধুনিকা মেয়েদের ভিড় সবচেয়ে বেশি। বয়সের ভারে একটু কুঁজো হয়ে যাওয়ায় সুবিধেই হয়েছে তাঁর। শ্যেন দৃষ্টিতে কোন মেয়ের দিকে যখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন তখন চট্ করে কেউ ধরতে পারে না। ধরতে পারে না আরেকটা কারণে। তাঁর চশমার লেন্স এত পুরু যে, অন্যলোকে তাঁর চোখের তারা দেখতেই পায় না। আর রমণীবাবু নিজেও যে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন, তা নয়। আসলে, চোখে একটু ঝাপসা দেখেন বলেই অমন ঝুঁকে পড়ে দেখতে হয় তাঁকে।

আরেকটা রোগ আছে রমণীবাবুর।

প্রতিদিন অন্য অনেকের মতই গৌরীকুণ্ডে স্নান করতে যান তিনি। স্নান অবশ্য অনেকেই করতে যায়, কেউ কেউ সাঁতারও কাটে, কিন্তু রমণীবাবু কাঁধে গামছা আর হাতে তেলের শিশি নিয়ে গিয়ে বসেন গৌরীকুণ্ডের ধারে, তেল মাখেন আধ ঘণ্টা ধরে, গল্পগুজব করেন এর ওর সঙ্গে, তারপর দু'মিনিটে স্নান সেরে নিয়ে কিছুক্ষণ রোদ পোয়ান।

আসলে স্নানটা তাঁর উপলক্ষ্য।

গৌরীকুণ্ডের দুটো ঘাট পাশাপাশি। বেশ কাছাকাছি। একটা পুরুষদের, অন্যটা মেয়েদের। আর রমণীবাবু স্নান করতে এসে ভুলে যান যে, তাঁর সঙ্গে আট বছরের একটি ছেলে আছে। যতক্ষণ পারেন মেয়েদের সিক্তবসন জলকেলী দেখেন তিনি, কখনো আড় চোখে, কখনো বা সোজা চোখেই।

তাই রুমাকে দেখে সবচেয়ে বেশি খুশী হলেন রমণীবাবু।

কিন্তু খুশী হয়েছেন এমন ভাব দেখাতে তিনি রাজী নন। 'কালে কালে মেয়েগুলো হলো কি' গোছের মুখের ভাব এনে ন' নম্বরের দরজায় গিয়ে উঁকি দিলেন।

—সুপ্রিয়বাবু!

সিগারেট ধরিয়ে ইংরেজী একটা নভেলের পাতায় মুখ ডুবিয়ে বসেছে সুপ্রিয়, হঠাৎ ডাক শুনে চমকে চোখ ফেরালো।

রমণীবাবু 'কিন্তু' 'কিন্তু' করে বললেন, ও পড়ছিলেন? স্টাডি? থাক্। ভাবলাম, চুপচাপ বসে আছেন বুঝি একা একা....এলোনলি।

—না, না, না, আসুন আসুন। সম্ভ্রমের সঙ্গে বিছানার চাদরটা ভাল করে টেনে দিয়ে বসতে বললে সুপ্রিয়।

ভরসা পেয়ে গিয়ে বসলেন রমণীবাবু, বিছানার এক কোণে। তারপর মিটি মিটি হেসে বললেন, ইয়ংম্যান আপনারা, সারা দিন ঘরে বসে থাকেন কি করে?

সুপ্রিয় হেসে বললে, কোথায় আর যাবো।

রমণীবাবু মাথা নাড়লেন।—তা ঠিক। তা ঠিক। কোথায় আর যাবেন। এখানেই তো এসে হাজির হয়েছে।

—কে? চমকে উঠলো সুপ্রিয়।

রমণীবাবু কৌতুকের হাসি হেসে বললেন, বিদুষী মশাই, বিদুষী। দেখেন নি, ছ' নম্বরে যে এসে গেছে।

—ও। বলে নিরুৎসাহ করে দিলো সুপ্রিয়।

কিন্তু নিজে নিরুৎসাহ হতে পারলো না। দোষও নেই তার। সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছে বি-এ পাশ করে। দু' বেলা সেফটি রেজর বুলিয়ে দাড়ি গোঁফ কড়া করবার চেষ্টা কি অকারণ!

রমণীবাবু বেরিয়ে এসে নিজের ঘরে যেতেই টুথ ব্রাশ নিয়ে বেরিয়ে এলো সুপ্রিয়

অন্যদিন অবশ্য আরো দেরীতে দাঁত মাজে সে, আর এত সময়ও লাগে না। কিন্তু রমণীবাবুর কাছ থেকে খবরটা পাওয়ার পর থেকেই বিদুষী মেয়েটিকে একটি বার দেখার জন্যে তার মনের মধ্যে যেন আকুলিবিকুলি শুরু হয়ে গেল।

দাঁত মাজতে মাজতে বারান্দার এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারী শুরু করে দিলো সুপ্রিয়। যদি একটিবার বেরিয়ে আসে মেয়েটি।

পায়চারী করতে করতে ছ' নম্বরের সামনে এসে একবার করে উড়ন্ত পর্দার ফাঁকে উঁকি দেয়।

কিন্তু না, মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে না। আর দেখতে না পেয়েই অধৈর্য হয়ে ওঠে সুপ্রিয়। স্বাভাবিক অপেক্ষা দ্রুতগতিতে ছুটতে থাকে ব্রাশটা, মাড়ির ওপরে নীচে ভিতরে বাইরে। টুথ ব্রাশ নয়, যেন মেল ইঞ্জিনের পিস্টন।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও যখন রুমার দেখা পাওয়া গেলনা, তখন বিরক্ত হয়েই সুপ্রিয় হাঁক ছাড়লো।—গৌতমবাবু!

গৌতম ওদিকের ঘরে একটা বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে ক্যারম খেলছিল। সে উঠে আসতেই সুপ্রিয় বললে, চলুন, একটু বেড়িয়ে আসি।

গৌতম সুপ্রিয়রই সমবয়সী। আলাপ ছিল না। মাত্র আগের দিন এসেছে সে। এসে উঠেছে সুপ্রিয়র রুম-মেট হয়ে। অর্থাৎ ন' নম্বরের দু'খানা তক্তপোশের একখানা গৌতমের। শরীর সারাতে নয়, ব্যবসার ধান্দায় এসেছে সে।

কিন্তু এসেই বড় আপন জন হয়ে গেছে হোটেলশুদ্ধ লোকের। বিশেষ করে সুপ্রিয়র। দু'জনের গলায় গলায় বন্ধুত্ব, যেন কতকালের ভাব।

সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল গৌতম। বললে, চলুন।

দু'জনেই বেরিয়ে গেল। একজন মনের ক্ষোভে, আরেকজন গোপন লোভে। শুধু বের হবার মুখে গৌতম একবার জিগ্যেস করলে, কটা বাজলো সুপ্রিয়বাবু!

দশ নম্বরের ঘরে ব্রজমাধব ভট্‌চায। লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা। পরনে লুঙি, গায়ে ফতুয়া। মুখে বিশুদ্ধ পূর্ববঙ্গের ভাষা। কোন একটা সওদাগরী আপিসে কাজ করেন, ছুটি নিয়ে বেড়াতে এসেছেন। সঙ্গে এসেছেন········না, বরং তিনিই এসেছেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে।

স্ত্রীর চেহারাও স্বামীর চেয়ে খাটো নয় কোনদিকে। মেজাজটা স্বামীর চেয়ে কড়া। কোন একটা মেয়েদের ইস্কুলে শিক্ষকতা

করেন। বয়স যদিও তাঁর চল্লিশের ওপরে, তবু পাঁচ বছরের ছেলেটিকে দেখে বোঝা যায়, বিবাহ করেছেন যৌবনকে বিদায় দিয়ে।

হিমাদ্রিবাবু থেকে শুরু করে হোটেলের সকলেই তাঁকে মিসেস ভট্চায বলেন।

প্রাতঃভ্রমণ সেরে বেলা নটার সময় ফিরে আসতেই আট নম্বরের রমণীরঞ্জন দত্ত এগিয়ে এলেন।

একমুখ হাসি নিয়ে বললেন, মর্ণিং ওয়াক সেরে এলেন নাকি?

লজ্জিত হবার চেষ্টা করে মিসেস ভট্চায বললেন, বেলা নয়টার সময় বাইরাইলে কি তারে মর্ণিং ওয়াক কয়?

রমণীবাবু হেসে বললেন, তা বেলা বারোটা অবধি তো মর্ণিংই —এ. এম. বলে না?

ব্রজমাধববাবু ততক্ষণে তালাচাবি খুলে ঘরে ঢুকেছেন। ধুতি-পাঞ্জাবী পরলে বোধ হয় তাঁর শরীর জ্বালা করে। তাই মিনিট দুয়ের মধ্যেই লুঙি আর ফতুয়া পরে বেরিয়ে এলেন তিনি।

আর বাচ্চা ছেলেটা মায়ের হাঁটু ধরে ঝুলে রইল।

ব্রজমাধববাবু বেরিয়ে আসতেই রমণীবাবু বললেন, ওদিকে সব নবাগতরা এসে গেছেন, ছ' নম্বর সাত নম্বর ফুলফিল্ড্।

অকারণে ইংরেজী বলা এবং হাস্যকর ইংরেজী বলাটা যে রমণীবাবুর রোগ তা সকলেই জেনে গেছে। তাই মিসেস ভট্চাযকে আর হাসি চাপতে হয় না।

নতুন খবর শুনে তিনি শুধু বললেন, আবার কাগো জবাই কইরা এলেন হিমাদ্রিবাবু?

রমণীবাবু ফিসফিস করে মিসেস ভট্চাযের প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, সাহেব, সাহেব। মেমসাহেব মিসিবাবাও আছে।

মিসেস ভট্‌চায প্রথমটা বুঝতে পারেন নি। আতঙ্কে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলেন। কিন্তু রমণীবাবুর হাসি দেখে, আর ছ' নম্বর ঘর থেকে কয়েকটা ভেসে আসা কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলেন।

বললেন, যাই গিয়া আলাপ কইরা আসি।

পর্দাটর্দার ধার ধারেন না মিসেস ভট্‌চায। ছেলে টমকে সঙ্গে নিয়ে এপাশ থেকে বার তিনেক উঁকি দিয়ে শেষ পর্যন্ত পর্দা ঠেলে ঢুকেই পড়লেন।

সামনে রুমাকে দেখতে পেয়ে জিগ্যেস করলেন, আইজোই আইলেন বুঝি?

রুমার সঙ্গে শ্রীলেখা দেবী তখন হোল্ড-অল খুলে তক্তাপোশের ওপর বিছানা পাতবার চেষ্টা করছেন। এভাবে, বলা নেই কওয়া নেই, এক ভদ্রমহিলাকে ঢুকে পড়তে দেখে শ্রীলেখা দেবী বিরক্ত হলেন, রুমা স্তম্ভিত।

তবু সৌজন্যের হাসি হেসে রুমা বললে, হ্যাঁ।

—ক্যান যে আইলেন এই হোটেলে। খাইতে দেয় না, খাইতে দেয় না।

হিমাদ্রিবাবু আদর আপ্যায়ন করে লোক আনেন বটে, কিন্তু খেতে দেন না পেট ভরে—এইটেই মিসেস ভট্‌চাযের সবচেয়ে বড় অভিযোগ। আরেকটা অভিযোগ হলো, হোটেলের রান্না ভাল নয়। ঝাল দেয় না, তেল দেয় না, শুধু সেদ্ধ আর সেদ্ধ। পেঁপে সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ, কাঁচকলা সেদ্ধ।

শুনে আশ্বস্ত হলো রুমা। হোটেলের রান্নাকে তার ভয় শুধু ঝাল আর তেলের জন্যে। তবু সে-কথাটা চেপে গেল সে।

প্রশ্ন করলে, আপনারা বেড়াতে এসেছেন বুঝি?

—না, না, প্যাটের গোলমাল আছে, তা শোনলাম, এইখানকার ছুধকুণ্ডের জল খাইলে রোগ সারে। কিছু না কিছু না।

রুমার মা হেসে বললে, আমরাও তো সেইজন্যেই এসেছি। কাজ হয় না কিছু? কি বুঝছেন?

—আরে না দিদি, ঐসব কিছুই না।

বলে চলে গেলেন মিসেস ভট্চায। বোধহয় মিস্টারের ডাক শুনতে পেয়ে।

আর মা-মেয়ে আধখোলা হোল্ড-অলের ওপর হেসে লুটোপুটি খেলো।—এসেছেন পেটের রোগ সারাতে, ঝাল দেয় না, তেল দেয় না বলে রাগ!

হাসি সামলে সবে আবার বিছানা পাতায় মন দিয়েছে রুমা, হিমাদ্রিবাবু এসে হাজির হলেন।—ওকি করছেন? কৌতুকীকে ডাকলে তো ঐ করে দিতো।—কৌতুকী, কৌতুকী।

সাড়া না পেয়ে হিমাদ্রিবাবু আবার ডাকলেন, ও হরতুকী।

—যাউছি বাবু। উত্তর এলো নীচে থেকে।

হিমাদ্রিবাবু বললেন, কৌতুকী আসছে, ও করে দেবে সব। কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো আপনাদের?

অসুবিধে হলেও কে আর মুখের ওপর বলে।

শ্রীলেখা দেবী বলে উঠলেন, না না, অসুবিধে কেন হবে।

—হলে বলবেন কিন্তু। বলেই চলে গেলেন হিমাদ্রিবাবু।

আর কৌতুকী এসে ঘরে ঢুকলো।

রুমা আতঙ্কগ্রস্তের মত বলে উঠলো, না না, তুমি যাও, আমরাই করে নিচ্ছি।

আসলে কৌতুকীর ঐ চেহারাটা কিছুতেই যেন বরদাস্ত করতে পারছে না রুমা। ওকে বিছানাপত্তর ছুঁতে দিতেও রাজী নয়।

রুমা আর শ্রীলেখা দেবী কাজ সারতে না সারতে নীচে থেকে হাতমুখ ধুয়ে এলেন মিস্টার সেন।

বললেন, একটু সামনের রাস্তাটায় ঘুরে আসি। শীত করছে। একটু রোদ লাগিয়ে আসি গায়ে।

রুমা আর রেশম বললে, আমরাও যাবো।

শ্রীলেখা দেবীকে রেখে তিনজনে সবে সিঁড়িতে পা দিয়েছে, পিছন থেকে রমণীবাবু বললেন, কোথায় চললেন? চলুন, আমিও যাচ্ছি।

বলে পিছনে পিছনে বেরিয়ে পড়লেন।

তারপর মিস্টার সেনের পাশাপশি হাঁটতে হাঁটতে বললেন, আজ এলেন বুঝি? নিউকামার, অ্যাঁ?

দশটা পনেরো মিনিটে কোলকাতাগামী একখানা ট্রেন আসে। যখন আসে, 'পান্থপাদপ' থেকে দেখতে পাওয়া যায়, শব্দ শোনা যায়। কারণ পান্থপাদপের দক্ষিণ আর পশ্চিম-দিক একেবারে ফাঁকা। মাঝে মাঝে দু'চারটে গাছ, দূরে একটা নাম-না-জানা মন্দির, আর বাকীটা শুধুই ধানজমি। সেই ধানজমিরই ওপার দিয়ে রেল লাইনটা ঘুরে এসেছে।

মাঝখানে আর কোন ব্যবধান নেই, কোন আড়াল নেই, তাই চোখেও দেখা যায়, ঝকমক আওয়াজও কানে আসে। কিন্তু তারপরই আরেকটা আওয়াজ শুরু হয়, যা শুধু কানে আসে নয়, কান ঝালাপালা করে দেয় স্যানাটোরিয়ামের প্রতিটি বাসিন্দের।

ইঞ্জিনের হুইস্‌ল শুনতে পেলেই দশ নম্বর থেকে ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের ছেলে টম আর এগার নম্বরের বাদল ছুটে বেরিয়ে আসে। তারপর হোটেলের লম্বা বারান্দার এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি দু'জনে ছোটাছুটি শুরু করে ইঞ্জিনের বিভিন্ন শব্দের

অনুকরণে বিচিত্র সব মৌখিক আওয়াজ তুলে। ঝিকঝিক, ঝুকঝুক, ঝমঝম, পিঁপিঁ, খনখন, ঢংঢং—আরো নানান অভিধান-বহির্ভূত শব্দ করতে করতে দুটি বাচ্চা ছেলে ছোটাছুটি শুরু করে। আর যতক্ষণ ট্রেনটা দেখা যায় ততক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে দু'জনে সুর করে করে এক নাগাড়ে চিৎকার করে চলে : রেলগাড়ী চললো, রেলগাড়ী চললো।

তাদের 'রেলগাড়ী চললো'র জ্বালায় সারা হোটেল অতিষ্ঠ। আর এই জ্বালা একবার দু'বার নয়, দিনে অন্ততঃ দশবার। কারণ দিনে আপ ডাউন গুণে দশটা ট্রেন আসে যায়।

সকলেই বিরক্ত হয়, আবার সকলেই হাসে। ছেলেমানুষ—যদি এই চিৎকারে একটু আনন্দ পায়, বাধা দেবে কেন।

আজকেই ধমক দিতে গিয়েও থেমে গিয়েছিলেন শিবনাথবাবু। বাদলের মুখের দিকে তাকিয়ে ধমক দিতে ইচ্ছে হয়নি।

টমের মুখে বাপ-মায়ের মত অতটা পূর্ববঙ্গীয় টান নেই, কিন্তু তেজ আছে, উগ্রতা আছে। বাদল ঠিক তার বিপরীত।

মুখখানাও মিষ্টি, স্বভাবটাও মধুর। তার বাপ-মায়ের মতই। বাপ সুশান্ত রেজ টাটার ইঞ্জিনিয়ার। বয়স তিরিশ পার হয়েছে সবে। যেমন মিশুকে তেমনি ভদ্র। বাদলের মা আরো মিশুকে, আরো মিষ্টি তাঁর ব্যবহার। সব সময়েই মুখে চোখে একটা কৌতুকের ভাব, হাসিখুশী। হোটেলের মালিক হিমাদ্রিবাবুর মেয়ে বেলু থেকে শুরু করে সকলেই ডাকে গৌরীদি বলে।

কুণ্ডের জলে স্নান করতে গিয়েছিলেন তিনি, গোলাপী তুর্কী তোয়ালেটা বুকের ওপর দিয়ে দু' কাঁধে ছড়িয়ে নিয়ে ভিজে কাপড়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিরছিলেন।

পান্থপাদপের স্নানের ঘরটা যেমন ছোট তেমনি নোংরা।

রোদ ঢোকেনা একরত্তি। দিনের বেলাও আলো জ্বালতে হয়। তাই প্রতিদিনই তিনি কুণ্ডের জলে স্নান করতে যান।

হিমাদ্রিবাবুর মেয়ে বেলু দূর থেকে তাঁকে ফিরতে দেখেই ছুটে গেল।—গৌরীদি, গৌরীদি!

শীতে কাঁপতে কাঁপতে এক মুখ হাসলেন গৌরীদি।—কি ব্যাপার, ইস্কুল নেই আজ?

—না গৌরীদি। আজ কিন্তু দুপুরে ঘুমোলে চলবে না, ক্যারম খেলবো আজ।

—কেন, আবার আমাকে কেন ভাই? তোমার চিত্রাদি, সুপ্রিয়দা, শিখিনী....

বেলু হেসে বললে, ও মা, আরেকজন এসে গেছেন, দেখেন নি?

—কই না তো। কে?

বেলু হাসলো।—ফ্যামিলি।

বাপের কাছে শুনে শুনে কথাটা সেও রপ্ত করে ফেলেছে। বললে, বড় ফ্যামিলি। অজয়বাবু, অজয় সেন—খুব বড় চাকরী করেন কোলকাতায়। রুমাদি তাঁর মেয়ে, আর রেশম....কি সুন্দর দেখতে রুমাদিকে।

দ্রুত হাঁটতে হাঁটতেই কথা বলছিলেন গৌরী দেবী, স্নানের ঘরের সামনে পৌঁছে বললেন, যাই কাপড়টা ছেড়ে আসি।

বলেই কৌতুকীর উদ্দেশে হাঁক ছাড়লেন, কৌতুকী, ও কৌতুকী, আমার কাপড়টা দিয়ে যাও।

—যাউছি মা। ছাইয়ের গাদায় বসে ওদিকের ডোবার ঘাটে বাসন মাজতে মাজতে সাড়া দিলো কৌতুকী।

কৌতুকী শুকনো শাড়ীটা এনে দিতেই স্নানের ঘরে কপাট লাগালেন গৌরী দেবী।

কাপড় ছেড়ে যখন বেরিয়ে এলেন, একটি সভ্য ফোটা রজনী-গন্ধার মত সুন্দর দেখালো তাঁকে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নিজের ঘরটির দিকে যেতে যেতে মাঝপথে বাদল এসে হাঁটু জড়িয়ে ধরলো তাঁর।

—কি রে? সস্নেহে জিগ্যেস করলেন ছেলেকে।

বাদল মিঠে মিঠে হাসি হেসে বললে, মা, কি সুন্দর লাগছে তোমাকে।

হেসে উঠেই গৌরীদেবী এ-পাশ ও-পাশ তাকালেন। এদিকে দাঁড়িয়ে আছেন বারো নম্বরের শিবনাথবাবু। রোদ পোয়াচ্ছেন। ওদিকে সুপ্রিয় আর গৌতম—নিজেদের মধ্যে গৌরী দেবী যে-দুটি ছেলের নামকরণ করেছেন জগাই মাধাই।

বাদলের কথায় তাই লজ্জিত হয়ে উঠলেন গৌরীদেবী। অস্বস্তিতে অপ্রতিভ হাসি হেসে ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

সুশান্তবাবু খবরের কাগজ পড়ছিলেন বিছানায় বসে।

গৌরীদেবী হেসে উঠে বললেন, তোমার ছেলে বাপু এত লজ্জায় ফেলে।

—কেন, কি করলো?

গৌরীদেবী কথাটা বলতে গিয়ে কেমন অস্বস্তি বোধ করলেন, হেসে বললেন, কিছু না।

গৌরীদেবী লজ্জা পেলেন বটে, কিন্তু বারো নম্বরের শিবনাথবাবুর কানে বাদলের কথা পৌঁছয় নি। তিনি তখন শিখিনীর সঙ্গে গল্পগুজবে মত্ত।

শিখিনী তার নাম নয়।

তের নম্বরে, অর্থাৎ বারান্দার একেবারে ও-প্রান্তের ঘরটিতে দিনকয়েক আগে এসেছে মেয়েটি। জাতি পাঞ্জাবী, কিন্তু কোলকাতায় বছর দশেক ছিল বলে ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারে। বয়েস বোধহয় আঠারোও পার হয় নি। একটি আঁটোসাঁটো গোলাপ কুঁড়ির পাপড়িগুলো যখন সবে খুলতে শুরু করে ঠিক তেমনি রূপ মেয়েটির। যেমন রঙ, তেমনি গড়ন। উগ্র যৌবনের প্রলেপ আছে সুঠাম দেহের প্রতিটি রেখায়। লাবণ্য নেই, কিন্তু নবনীর মত অন্য এক কোমলতা আছে মুখেচোখে। সবে মিলে কি এক মাদকতা, যে মাদকতা তার দেহের চেয়ে দেহবাসই বেশি স্পষ্ট করে তুলেছে। ছন্দময় বুকের তরঙ্গ সুদৃঢ় উরজবন্ধনে বন্দী, সুডোল জঙ্ঘা আর সুন্দর বাহু ঘিরে ফিকে কমলা রঙের নাইলনের শাড়ী।

প্রথম থেকেই পান্থপাদপের নারী পুরুষ উভয়বিধ বাসিন্দেরই চোখ পড়েছিল তার ওপর। পাঞ্জাবী শিখের মেয়ে বলেই সকলে তার নামকরণ করেছিল 'শিখিনী'।

মেয়েটি দিব্যি মিশুকে কিন্তু। হবে না কেন। যে মেয়ে আঠারো বসন্তের যৌবন নিয়ে একা একা বেড়াতে এসেছে, লজ্জা আর ভয় এ-দুটো তার কাছে অজানা।

তেরো নম্বরের ঘরখানি নিয়ে একাই আছে শিখিনী। সারাদিন টোঁ টোঁ করে ঘুরে বেড়ায় এ-মন্দির সে-মন্দির, কখনো পথে পথে, আর দুপুরে বা সন্ধ্যায় ক্যারম-বোর্ড পেতে খেলতে বসে হিমাদ্রিবাবুর মেয়ে বেলুর সঙ্গে, গৌরীদেবীর সঙ্গে, এমন কি সুপ্রিয়র সঙ্গেও।

আগের দিন রাত্রে তার পাশের খালি ঘরটায় দুটি লোককে বাক্স-বেডিং নিয়ে আসতে দেখেছিল শিখিনী। তাদেরই একজন শিবনাথবাবু।

প্রকৃতিটা মিশুকে বলেই শিবনাথবাবুর সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করছিলো সে। সুযোগ জুটছিল না।

রোদ-পোয়াতে শিবনাথবাবু বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই শিখিনীও ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।—আপনি কাল রাতমে এলেন বাবুজী?

চমকে উঠে ফিরে তাকালেন শিবনাথবাবু। ফিরে তাকিয়ে আরেকবার চমকে উঠলেন।

কোন রকমে বললেন, হাঁ, আপ?

মেয়েটি যে বাঙালী নয়, তার চেহারার দিকে তাকিয়েই শিবনাথবাবু বুঝতে পেরেছেন।

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, আমি বাংলা জানে। কোলকাত্তায় ছিলাম বহুৎ দিন।

—তাই নাকি? বাঃ! সত্যিই তো, বেশ ভালো বাংলা জানেন। বেড়াতে এসেছেন বুঝি?

শিখিনী হেসে বললে, নাহি। ইণ্টারভিউ দিতে। মেয়েদের স্কুলের নোকরীর ইণ্টারভিউ দিতে এসেছি, ভাবলাম দু'চার রোজ দেখে যাই শাহারটা। আপনি? চেঞ্জার?

শিবনাথবাবু হেসে বললেন, না। আমি এসেছি ব্যবসার জন্যে। রোজলার কোম্পানীর রিপ্রেজেণ্টেটিভ আমি, আর সঙ্গে এসেছে আমার মেকানিক। আশিটা ফ্যান দিয়েছিলাম গরমেণ্টকে, ষাটটা খারাপ হয়ে গেছে—তাই···

—আশিটার ভিতরে ষাটটা খারাপ? খিলখিল করে হেসে উঠলো শিখিনী।

হাসিটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছিল বলেই পছন্দ হলো না শিবনাথবাবুর। বোঝাতে চেষ্টা করলেন, দোষ তাঁর কোম্পানীর নয়। আসলে এখানকার লোক সব জংলী, পাখা চালাতে জানে না।

শিখিনী হেসে বললে, পাংখা তো বাবুজী সুইচ্ টিপলেই চলে, ও তো এরোপ্লেন না আছে, কি পাইলট হতে হবে চালাতে হলে।

তর্ক এমনিতেই পছন্দ করেন না শিবনাথবাবু, আর এ তো সুন্দরী এক তরুণীর সঙ্গে তর্ক। হার মানতে ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর, কিন্তু দীর্ঘদিনের পেশায় নিজের কোম্পানীর গুণগান করে এসেছেন, রোজলার কোম্পানীর পাখার ত্রুটি আছে এ-কথা স্বীকার করে নিয়ে কোম্পানীর সুনাম খর্ব করতে মন রাজি হলো না।

তাই বললেন, বিশ বছর আমি রোজলারকে রিপ্রেজেণ্ট করছি—ইণ্ডিয়াজ বিগেস্ট ফ্যান-ম্যানুফ্যাকচারার্স—কোনদিন কোন কমপ্লেন হয়নি।

শিখিনী খিলখিল করে হেসে উঠলো শিবনাথবাবুর কথা বলার ভঙ্গিতে।

শিবনাথবাবু এবার আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারলেন না, সহ্য করার শক্তি হারালেন। বললেন, হাসবেন না, হাসবার কথা নয়। যাঁরা পাখার খোঁজ রাখেন তাঁদের জিগ্যেস করবেন রোজলারের কথা। কথায় বলে, ইউ ক্যান রেকমেণ্ড রোজলার টু ইওর ফাদার।

এবার আর শিখিনী হাসলো না। নাটুকে ভঙ্গিতে হাত জোড় করে বললে, মাফ কিজিয়ে। আপনার কোম্পানীর বদনাম করবো না আর।

বলেই লম্বা প্যাসেজের ও-প্রান্তে চলে গেল, যেদিকে ছ-নম্বর আর সাত-নম্বর ঘর—যে ঘরে আজই একটি ফ্যামিলি এসে উঠেছে—মিস্টার এ. কে. সেন, তদীয় পত্নী, রুমা আর রেশম।

শিবনাথবাবু একটু আহত হয়েই চিৎকার করতে শুরু করলেন, মিস্ত্রী, ও মিস্ত্রী!

লুঙি পরে গেঞ্জির ওপর একটা তুষের চাদর জড়িয়ে যে বাইরে এলো তাকে শিবনাথবাবু নিজে মিস্ত্রী বলে ডাকেন, কিন্তু অন্য লোকের কাছে পরিচয় দিতে হলেই বলেন, আমার মেকানিক।

মিস্ত্রী তা শুনে খুশীই হয়। নিজে সে অশিক্ষিত হলেও শব্দ দুটোয় যে সম্মানের পার্থক্য অনেকখানি তা বোঝে। গাড়োয়ান কি কোচোয়ানের সঙ্গে ড্রাইভার, আর ড্রাইভারের সঙ্গে প্লেনের পাইলটের পার্থক্যের মতই।

কিন্তু শিবনাথবাবু এমন চিৎকার করে 'মিস্ত্রী' বলে ডাক দেওয়ায় সে মনে মনে একটু অসন্তুষ্টই হলো। এমন একটা ছিমছাম রূপসী মেয়ের শ্রবণশক্তির নাগালের মধ্যে 'মিস্ত্রী' বলে না ডাকলে কি চলতো না।

তবু কোম্পানী যখন তাকে শিবনাথবাবুর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে তখন মনের রাগ মনেই চেপে রাখতে হবে। তা না হলে দালাল ব্যাটাকে···

বিরক্তির মুখে মিস্ত্রী বেরিয়ে আসতেই শিবনাথবাবুর আহত বিষণ্ণ মুখখানা সহৃদয় হাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। —কি খাবে বলো মিস্ত্রী, স্পেশাল চার্জ দিয়ে অর্ডার দিই। আগে এসেছি তো এখানে, যা খেতে দেবে, পেট ভরবে না।

খাবার কথায় মিস্ত্রী খুশী হয়ে উঠলো। বললে, তা মুর্গীটুর্গী হলে····

—বেশ তো, তাই বলি। ফাউল কারী আর রুটি? খেয়ে নাও মিস্ত্রী, খেয়ে নাও, খরচ তো কোম্পানীর। আর ও শালারা আমাদের যা ঠকায়····

—'আমাদের' কেন বলছেন? প্রতিবাদ করে মিস্ত্রী। হেসে বলে, খরিদ্দারকে ঠকায় না? নাম হয়ে গেছে বলে যত রাবিশ মাল ছাড়ছে বাজারে···

শিবনাথবাবু এক মুখ হেসে বললেন, তা যা বলেছো মিস্ত্রী, যেখানে একবার পাখা বিক্রী করে আসি, সেখানে আর দ্বিতীয়বার যেতে সাহস হয় না, ঠ্যাঙানি দেবে এই ভয়ে। নেহাৎ এটা গরমেণ্টের ব্যাপার তাই আসতে হলো। তা, ক'দিন লাগবে সারাতে?

মিস্ত্রী হেসে বললে, তাড়া কিসের বাবু, সাতদিনের টি. এ. তো নেবেন···

শিবনাথবাবু তাড়াতাড়ি শুধরে দেন, আহা হা, তা বলছি না, টি. এ. সাতদিন কেন দশদিন নেবো, কিন্তু দু'তিন দিনের মধ্যে সারানো হয়ে গেলে এদিক-ওদিক একটু বেড়ানো যেতো এই পয়সায়।

মিস্ত্রী চালাক লোক, কোনো কথা দিলো না। বললে, দেখি তো আগে পাখাগুলোর অবস্থা।

কিন্তু মনে মনে বললো, শালা দালালী করে কমিশন খেয়েছে, আবার সারাবার নাম করে টি. এ. খাবে। বেশ আছে।

সকালে সেই যে সেন-পরিবারকে হোটেলে তুলে এনে প্রাথমিক ব্যবস্থার নির্দেশ ইত্যাদি দিয়ে হিমাদ্রিবাবু নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন, তারপর তাঁর দেখা পাওয়া গেল বারোটার সময়।

এই সময়টায় তিনি বাজার করেন প্রথমে। বাজার মাইল-খানেক দূরে। সেখানে গিয়ে নিজে দেখেশুনে জিনিসপত্র কেনেন। শুকনো কপি, পচা আলু, বাসি মাংস, চালানি মাছ ইত্যাদি যা কিছু সস্তায় পাওয়া যায় সেগুলো খুঁজে খুঁজে রীতিমত কম দামে কিনে না আনলে স্যানিটারীর ব্যবস্থা হবে কোন টাকায়!

আসলে হিমাদ্রিবাবু কৃপণ ন'ন, পান্থপাদপের সুনাম তিনিও চান। এবং সে জন্যে একসময় তিনি এত ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন যে, সুনাম যে ভাবে বাড়তে শুরু করেছিল ঠিক সেইভাবেই লাভের অঙ্ক কমতে শুরু হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোভ জয় করে পান্থপাদপের সুখ্যাতির দিকেই নজর রেখেছিলেন। ইদানীং দুটি কারণে চরিত্র টলমল করতে শুরু করেছে তাঁর, বুঝেছেন যে খ্যাতির চেয়ে অর্থটা অনেক বড়ো জিনিস। কারণ-দুটোর একটা হলো যাত্রীদের প্রশংসাবাক্যে কার্পণ্য। শত চেষ্টা করেও তাদের পুরোপুরি খুশি করতে পারেন নি হিমাদ্রিবাবু। শেষ পর্যন্ত সবাই বলেছে, স্যানিটারী ব্যবস্থা নেই। আর স্যানিটারীর ব্যবস্থা করতে হলে লাভের অঙ্ক বাড়াতেই হবে। এ-ছাড়া আরেকটা চাপে পড়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন হিমাদ্রিবাবু। তাঁর ক্রমবর্ধমান পরিবারের চাহিদা মেটাবার দায়িত্বে। সারা বছরে শীতের মরশুমে মাস দুই তিন চলে এই পান্থনিবাস, অন্য সময়ে দু'একজন ব্যবসাদার ক্বচিৎ দেখা দেয়। সুতরাং, এই সময়ের মধ্যেই যা-কিছু রুজি রোজগার।

পরিবারটিও ছোট নয় তাঁর। বড় ছেলেটি বাউণ্ডুলে, আড্ডা দিয়ে বেড়ায়, থিয়েটর করে, পুজোমণ্ডপে ভলেন্টিয়ার হয়। কিন্তু বাপের ব্যবসায় কুটোটি কেটে দুটো করবে না। বাজার করতে দিয়ে দেখেছেন হিমাদ্রিবাবু, টাকায় দু'আনা অন্তত সরিয়ে রাখে সে। যাত্রীদের দেখাশোনার ভার দিয়ে উল্টো বিপত্তি। মেয়েদের দিকে, বিশেষ করে কমবয়সী মেয়েদের এত বেশি যত্নআত্তি শুরু করে যে, তারা পালাবার পথ খোঁজে। তাই হোটেলের চৌহদ্দির মধ্যে ঢোকা বারণ তার। কিন্তু দু'বেলা ভাতের থালাটা এগিয়ে দিতে হয়। এরপর আছে মেয়ে বেলু, এবং তার পরেও আরও তিনটি। এত বড় পরিবারের খরচ চালানো তো সহজ নয়।

তাই সকালে বাজারটা নিজেই করেন। তারপর সেগুলো হোটেলে পৌঁছে দিয়েই চলে যান দু'-মাইল দূরের নতুন শহরে। সেখানে একটা দর্জির দোকান খুলেছেন সম্প্রতি।

এগারোটার সময় বেরিয়ে পড়েন দোকান থেকে। ফিরে এসে যাত্রীদের খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্বাবধান করেন নিজে সামনে দাঁড়িয়ে। আর সেই সময়েই হিমাদ্রিবাবুর হাঁকডাক চিৎকার শুনতে পায় সকলে।

সেদিনও ঠাকুর-চাকরদের উদ্দেশে হাঁক ছাড়তে ছাড়তে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসতেই সামনে পড়ে গেল সুপ্রিয় আর গৌতম।

সত্ত বেড়িয়ে ফিরেছে তখন দু'জনে।

হিমাদ্রিবাবু হঠাৎ থেমে পড়েই বললেন, এই যে সুপ্রিয়বাবু, খেতে দেবে নাকি ?

—আরে থামুন মশায়। ট্রাউজার্সের ক্রিজ ঠিক করতে করতে সুপ্রিয় জবাব দিলে, এখানেও যদি তাড়াহুড়ো করে খেতে হবে তো বাড়ীতে থাকলেই হতো। বেড়াতে এসেছি ছুটি নিয়ে, যখন খুশী হয় খাবো বেড়াবো ঘুমোবো।

কড়া জবাবে একটু অপ্রতিভ দেখালো হিমাদ্রিবাবুকে। কোন রকমে সামলে নিয়ে বললেন, বেশ বেশ, যখন ইচ্ছে হবে বলবেন। বলে দ্রুত পায়ে ছ'নম্বরের দিকে চলে গেলেন। নতুন এসেছে পরিবারটা, তার ওপর চারজন মেম্বার, সুতরাং প্রথম প্রথম যত্নআত্তি তাদের একটু বেশীই পাওনা।

সুপ্রিয় হেসে বললে, এঁর শুধু খাইয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্তি, বুঝলেন গৌতমবাবু।

গৌতম সায় দিলো, বললে, যা বলেছেন।

আসলে গৌতমের তখনও রীতিনীতিগুলো রপ্ত হয় নি। সবে

কটা দিন আগে এসেছে সে। তবে ভাগ্য ভাল যে এসেই সুপ্রিয়র মত রুম-মেট পেয়েছে। তার জন্যে মনে মনে সে খুশীও হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এদিকে সূর্য মাথার ওপর উঠেছে, গরম কাপড়ের নীচে সারা গা চিড়বিড় করছে। স্নানের সময়ও যে হয়নি তা নয়।

গৌতম জিগ্যেস করলে, কটা বাজলো সুপ্রিয়বাবু?

হঠাৎ যেন চটে গেল সুপ্রিয়।—আপনি কি মশাই, কেবল কটা বাজলো আর কটা বাজলো!

গৌতম মুখ কাচুমাচু করে বললে, না, মানে আসবার সময় ভুলে ঘড়িটা ফেলে এসেছি কিনা।

সুপ্রিয় হেসে বললে, আহা, ঘড়ির সঙ্গে স্বভাবটাও ফেলে আসেন নি কেন তাই তো জিগ্যেস করছি। নিন—

বলে হাত থেকে ঘড়িটা গৌতমকে দিয়ে সুপ্রিয় বললে, বাঁধুন, আপনার হাতেই বাঁধুন, বারবার আর কটা বাজলো জিগ্যেস করবেন না। এসেছি ছুটি উপভোগ করতে....

সুপ্রিয়র অবশ্য বিরক্ত হবার যথেষ্ট কারণ যে ছিল না তা নয়। গৌতমের এই স্বভাবটা একরকম মুদ্রাদোষ। পাঁচ মিনিট অন্তর জিগ্যেস করবে, কটা বাজলো সুপ্রিয়বাবু। প্রথম যেদিন এলো গৌতম, সেদিন রাত্রে, সুপ্রিয় তখন শুয়ে পড়েছে। ঘড়িটা বালিশের তলায় লুকিয়ে রেখে সবে আলো নিভোতে যাবে, অমনি ওপাশের খাট থেকে গৌতম প্রশ্ন করলো, কটা বাজলো সুপ্রিয়বাবু। নিরুপায় অবস্থা। বালিশের তলা থেকে ঘড়ি বের করে কটা বাজলো জানাতে হলো। তারপর আলো নিভিয়ে ঘড়িটা নতুন করে লুকিয়ে রাখতে হলো পায়ের দিকে।

দোষ ছিলো না অবশ্য সুপ্রিয়র। অজ্ঞাতকুলশীল রুম-মেট, সেদিনই এসেছে, চট্ করে বিশ্বাস করাও তো উচিত নয়।

একটা আতঙ্ক নিয়েই ঘুমিয়েছিলো। আর ঘুম থেকে উঠেই দেখেছিলো জিনিসপত্র সব ঠিক আছে কিনা, ঘড়ি ঠিক আছে কিনা।

সব ঠিক আছে দেখে যত না লজ্জা পেয়েছিল সে, তার চেয়ে বেশী লজ্জা পেয়েছিল গৌতমের সঙ্গে আলাপ জমে উঠতেই। চমৎকার মিশুকে লোক, শুধু সুপ্রিয়র সঙ্গেই নয়, পান্থপাদপের প্রত্যেকটি বাসিন্দের সঙ্গেই আলাপ জমিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যে। ও-প্রান্তের পাঞ্জাবী মেয়েটি থেকে শুরু করে হিমাদ্রিবাবুর ফ্রক পরা মেয়ে বেলু পর্যন্ত সকলের সঙ্গেই। কখনো এর সঙ্গে ক্যারম খেলছে, কখনো ওর সঙ্গে লুডো খেলছে।

গৌতমকে প্রথম দিন সন্দেহের চোখে দেখেছিলো বলেই হয়তো মনে মনে একটু অনুতপ্ত বোধ করছিলো সুপ্রিয়। আর সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যেই ঘড়িটা খুলে এগিয়ে দিলো গৌতমের দিকে।

গৌতম ঘড়িটা নিলো হাত বাড়িয়ে, কব্জিতে বাঁধলো। তারপর হেসে বললে, ভালই হলো, হোটেলের টাকা কম পড়ে যায় তো এটা বেচে দিয়ে চলে যাবো।

কৌতুকটা উপভোগ করলো সুপ্রিয়। বললে, তা করবেন, কিন্তু কম দামে বেচে দেবেন না যেন। নগদ দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়ে কিনেছি মাসখানেক আগে।

একে একে সকলেই স্নান সেরে আসে, কেউ পান্থপাদপের জলঘরে, কেউ বা গৌরীকুণ্ডে। তারপরই আহারপর্ব।

মিনিট কয়েকের জন্যে হিমাদ্রিবাবুর হাঁকডাকে, ঠাকুর-চাকরের

আনাগোনায়, থালা-বাসনের ঝনঝন আওয়াজে সারা হোটেল গমগম করে ওঠে।

তারপরই নিঃঝুম দুপুর। নির্জন, নিঃশব্দ, শান্ত দুপুর।

শুধু শিবনাথবাবু তাঁর মিস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যান দূরের নতুন শহরটার উদ্দেশে। আশিটা পাখার মধ্যে ষাটটা বিকল হয়ে পড়ে আছে। তাই সারাতে এনেছেন মিস্ত্রীকে। নিজে এসেছেন সম্ভবতঃ স্তোকবাক্য দিয়ে সরকারী আপিসকে শান্ত করতে।

শিবনাথবাবু বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই পাঞ্জাবী মেয়েটিও রিক্সা ডাকলো। ইস্কুলের চাকরীটার ইণ্টারভিউ দিয়ে এসেছে সে, কি ফল হলো যদি জানা যায় কেরানীবাবুদের সঙ্গে দু' চারটে মিঠে কথা বলে।

আট নম্বরের রমণীরঞ্জন দত্ত কুৎকুতে চোখে এপাশ ওপাশ তাকিয়ে দেখলেন। বারান্দাটা নির্জন, কেউ কোথাও নেই। দশ আর এগারো নম্বরের দরজা বন্ধ হয়ে গছে। না গৌরীদেবী, না মিসেস ভটচায—কারও দেখা পাওয়া যাবে না এখন আর।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালেন রমণীবাবু, শুয়ে পড়বেন কিনা ভাবলেন। ছ'নম্বর থেকে হৈ-হল্লা হাসি-হুল্লোড় ভেসে আসছে রুমা আর রেশমের।

আর একবার আশায় আশায় চৌকাঠ ডিঙোতে গিয়ে ফিরে তাকালেন। দেখলেন, ছেলে তাঁর কপাল অবধি লেপ ঢাকা দিয়ে পিটপিট করে তাকাচ্ছে বাপের দিকে। দেখেই চটে গেলেন।

ধমক দিয়ে বললেন, ঘুমো, ঘুমো।

সঙ্গে সঙ্গে মাথা পর্য্যন্ত লেপটা টেনে দিলো তাঁর সুবোধ ছেলে।

কিন্তু চোখ বুজলো না। আসলে রমণীবাবু কখন চোখ বোজেন সেই অপেক্ষাতেই চুপচাপ পড়ে রইলো। বাপকে ঘুমোতে দেখলেই ছোটে সে হিমাদ্রিবাবুর বাড়ীতে, ক্যারম বোর্ড নিয়ে বেলুর সঙ্গে বসে যায়। কোনদিন বা বাদল আর টমকে নিয়ে খেলতে বসে শিখিনীর সঙ্গে।

আজ রুমাদি বলে রেখেছে দুপুরে খেলবে। তাই চোখ বুজে পড়ে রইলো ও।

রুমাদের অবশ্য দুপুরে ঘুম দেওয়ার বালাই নেই। দুপুরে ঘুমোনো রীতিমত দিশী ব্যাপার, তাই মিস্টার সেন সেটা পছন্দ করেন না। পছন্দ না করলেও স্ত্রী শ্রীলেখা দেবী একবার গড়িয়ে না নিয়ে পারেন না। আজ নয় মিস্টার সেন সাহেব হয়েছেন, কিন্তু শ্রীলেখা দেবীকে ঠিকুজী কুষ্ঠী মিলিয়েই বিয়ে করেছিলেন, যখন মাইনে পেতেন দেড়শো টাকা। তাই সেদিনের দিশী অভ্যাসগুলোর অনেক কিছুই শ্রীলেখা দেবীর একেবারে বিসর্জন দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

ছেলেমেয়েদের জ্ঞান হওয়ার আগেই অবশ্য মিস্টার সেনের উন্নতি হয়ে গেছে দ্রুত তালে, সিঁড়ি ভেঙে নয়, যেন লিফ্‌টে চড়ে চাকরীর চার তলায় উঠেছেন প্রত্যেক ফ্লোরে অল্পক্ষণের জন্যে থেমে থেমে, তাই স্ত্রীকে যেমনটি গড়তে চেয়েছিলেন, ঠিক তেমন করেই গড়ে তুলেছেন মেয়ে রুমাকে।

রুমা সারা দুপুর কখনো উল বোনে ইংরেজী বই দেখে, কখনো পিয়ানো বাজায়, কখনো বা একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা সিনেমার পত্রিকা পড়ে।

এখানে পিয়ানো নেই, তাই উল নিয়েই বসেছিল।

একটা দমকা বাতাস ঢুকতেই আলনা থেকে রেশমের প্যাণ্টটা পড়ে গেল।

এই এক বিপদ এখানে। দেয়ালে কয়েকটা ব্রাকেট লাগানো আলনা। ভারী কাপড়-চোপড় এমনিতেই ঠিক করে রাখা যায় না। তার ওপর বাতাস এলে তো রক্ষে নেই।

রেশম বিছানায় বসে 'মেকানো' নিয়ে নিজের মনেই খেলা করছিল।

নিজের মনে খেলতে খেলতেই বললে, ট্রাউজারটা তুলে রাখনা দিদি।

এক মনে উল বুনছিল রুমা, ইংরেজী বই দেখে কটা সোজার পর ক' ঘর উল্টো মিলিয়ে দেখছিল।

রেশমের কথা শুনেই ক্রুদ্ধ চোখ তুলে তাকালো। তারপর বললে, আবার ট্রাউজার ?

রেশম ততক্ষণে ভুল বুঝতে পেরেছে, সংশোধন করে বললে, ট্রাউজার্স, ট্রাউজার্স।

রুমার চোখের কোণের রাগটুকু ঠোঁটের কোণের হাসিতে মিলিয়ে গেল মুহূর্তে। কাঁটা আর উল রঙচঙে থলেটার মধ্যে ভরে রেখে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়িয়ে রুমা বললে, কই রে, ছেলেটা তো এলো না ক্যারম খেলতে ?

—যাবো দিদি? ডেকে আনবো ? উঠে দাঁড়ালো রেশম। খেলার শখ যত না, তার বেশী ছেলেটার সঙ্গে ভাব জমানোর ইচ্ছে।

এখানে এসে সে বেচারাই সবচেয়ে মুস্কিলে পড়েছে। সমবয়সী ঐ একটিই, তার সঙ্গেও ভাবটা এখনও বিশেষ জমে নি। ক্যারম খেলার নামে যদি বন্ধুত্বটা হয়ে যায়!

রুমা হেসে বললে, যা না, দেখে আয়।

রেশম এক লাফে তক্তপোশ থেকে নামলো, আরেক লাফে বেরিয়ে এলো বাইরের বারান্দায়। তারপর ধীরে ধীরে গিয়ে

উঁকি দিলো আট নম্বর ঘরে। ও মা, ছেলেটা দিব্যি লেপ ঢাকা দিয়ে ঘুম মারছে।

ডাকবে কিনা ঠিক করতে না পেরে বারান্দার রেলিঙের পাশে এসে দাঁড়ালো রেশম। কানে এলো গুনগুন স্বরে কে যেন গান গাইছে।

গুনগুন করে গান গাইছিল কৌতুকী। কুয়োর ধারে বসেছে ডজন তিন চার থালা-বাসন আর ছাইয়ের রাশ সামনে নিয়ে।

বাসন মাজতে মাজতে গুনগুন করছে।

শুধু কাজ আর কাজ। সেই ভোর বেলায় উঠেছে, উনোনে আঁচ দিয়েছে, চায়ের কাপ জলখাবারের প্লেট ধুয়েছে, তারপর একে একে সব কটি ঘর ঝাঁট দিয়ে, ঘরে ঘরে কুঁজোর জল ভরে দিয়েছে, স্নানের জল তুলে দিয়েছে বালতি বালতি, কাপড় কেচে দিয়েছে সকলের। এখন বসেছে বাসন মাজতে।

আশ্চর্য মানুষ এই কৌতুকী। এত কাজ, তবু এতটুকু বিরক্তি নেই, অভিযোগ নেই। বোর্ডারদের কাউকে কোন কাজ করতে দেখলেই কেড়ে নেবে।

কাজ ছাড়া যেন দু'দণ্ডও থাকতে পারে না।

রেশমের মতই ওদিক থেকে আরো একজন লক্ষ্য করছিল কৌতুকীকে। শিখিনী। সেই পাঞ্জাবী মেয়েটি।

স্বচ্ছ ওড়নাটা গায়ে জড়িয়ে রোদ পোয়াচ্ছিল সে, কৌতুকীর গান শুনে ফিক্ করে হাসলো, তারপর সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে এসে দাঁড়ালো কৌতুকীর কাছে।

বললে, গানা হচ্ছে কৌতুকী?

কৌতুকী দাঁত বের করে হাসলো। জবাব দিলো না।

শিখিনীও হাসলো। বললে, আমার দেশ যায়গি ?

কৌতুকী ঘাড় নাড়লো।—উঁহুঁ।

—কাহে নেই ? কত মাহিনা মিলছে এখানে ?

—পাঁচো টঙ্কা।

পাঁচ টাকা মাত্র ? বিস্মিত না হয়ে পারে না শিখিনী। সকলেই বিস্মিত হয়। মাত্র পাঁচ টাকা মাইনে, তবু এ হোটেল ছেড়ে যেতে চায় না কৌতুকী।

তবে কি বখশিসের লোভে ? কেউ কেউ জিগ্যেস করে।

কৌতুকী হাসে আর ঘাড় নেড়ে বলে, উঁহুঁ।

এ এক রহস্যময় চরিত্র। সারা হোটেলের আলোচনার একমাত্র বিষয়। যারই সঙ্গে কথা হোক কৌতুকীর, যে-কথাই হোক, বোর্ডারদের জানতে বাকী থাকে না।

সবাই বিস্মিত হয় তার কাজ দেখে, বিস্মিত হয় কথা শুনে।

সত্যি, হাসি মুখে সারাটা দিন এমনভাবে কেউ কাজ করতে পারে ? এত কাজ, না দেখলে যেন বিশ্বাসও হয় না।

কৌতুকীর সঙ্গে গল্পগুজব করে ওপরে উঠে আসতেই শিখিনী দেখলে বারান্দার ও-কোণে রুমা দাঁড়িয়ে আছে। রুমা আর রেশম।

শিখিনী হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো।—কৌতুকী গানা গাইছিলো, শুনেছেন ?

—না তো! কৌতুকে হেসে উঠলো রুমা।—গান গাইছিল ?

—হাঁ। পাঁচ রুপেয়া মাহিনা পায় এখানে। পনেরো রুপেয়া দেবো বললাম, তও ভি যাবে না আমার সাথ।

—সে কি ? বিস্মিত হলো রুমা।

শিখিনী হেসে বললে, হোটেলের কাম না করলে ওর হাত

পায়েরমে বাত হয়ে যাবে। সেই ভরসে যাবে না, বাড়িতে আমার যদি এত কাম না থাকে!

খিলখিল করে হেসে উঠলো রুমা।

বেলা গড়িয়ে পড়েছে তখন। রোদের তাপ কমে এসেছে, বাতাস দিচ্ছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। একে একে বোর্ডাররা তুপুরের ঘুম থেকে উঠছে।

এগারো নম্বরের ভদ্রমহিলাও উঠে এলেন বাদলকে নিয়ে।

বাদলের চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে আঁচলে তার মুখ মুছিয়ে দিয়ে তিনিও এসে দাঁড়ালেন রুমা আর শিখিনীর কাছে।

শিখিনীর কথাটা কানে গিয়েছিল গৌরী দেবীর, জের টেনে প্রশ্ন করলেন, কৌতুকীর কথা বলছেন?

—হ্যাঁ।

—সত্যি, আশ্চর্য হবারই কথা। প্রথম যেদিন এলাম, দেখে রুচি হয় নি, কিন্তু যত দেখছি ততই যেন ভালবেসে ফেলছি।

শিখিনী বললে, জানেন, এখানে আছে সে কত দিন? বাইশ বরষ, একদিন ভি ছুটি নাই।

সত্যিই তাই, সবাই ছুটি পায়, সবাই ছুটি নেয়। কিন্তু কৌতুকী যেন অক্লান্ত, সমুদ্রের ঢেউএর মত। ক্লান্তি নেই, একঘেয়েমি নেই, অবসাদ নেই, অবকাশ নেই।

বিকেলে রৌদ্রের তাপ কমতে একে একে সকলেই জেগে ওঠে। নিঃস্তব্ধ পান্থনিবাস মুখর হয়ে ওঠে আবার। পাণ্ডাদের ছড়িদাররা এসে খবর নেয় কেউ মন্দির-দর্শনে যাবে কিনা। একটা কম বয়সী বিধবা মেয়ে চকচকে পিতলের ঘটি হাতে

দুধ দিতে আসে ছোট্ট ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে। বাঁকের দু'পাশে ডেকচির সারি ঝুলিয়ে মিঠাই বিক্রী করতে আসে কেউ কেউ। হোটেলের চাকর-ঠাকুর-ঝিদের কলহ-কোলাহলও শোনা যায়। শিখিনী রিক্সা ডেকে ক্যাপিটেলের দিকে পাড়ি দেয়।

রাঁধুনী বামুন দুটোর মুখ দেখা যায় না সচরাচর, শুধু গলার স্বর শোনা যায়। রান্নাঘর থেকেই চিৎকার করে কখনো কখনো তারা ফরমাস করে। চৈতন্য আর সুলোচন—দুটো চাকর, একটা ঠিকে ঝি—লক্ষ্মীবৌ।

লক্ষ্মীবৌ সকাল বিকেল নিজের কাজটুকু করে দিয়েই চলে যায়, বাড়তি কোন কাজের কথা বললেও শুনতে পায় নি এমন ভাণ করে। কিন্তু চৈতন্য আর সুলোচন এক নম্বরের ফাঁকিবাজ—ডাকলেও সাড়া দেবে না। কোথায় আছে জানবারও উপায় নেই। হিমাদ্রিবাবু ধমক দিলে বলে বসে, ন' নম্বরের বাবু বললেন....

সত্যিই সে ন' নম্বরে ছিল কিনা, বা তার নির্দ্দেশে কোন কাজ করছিল কি না তা তো হিমাদ্রিবাবু গিয়ে জিগ্যেস করতে পারেন না!

তাই চৈতন্য আর সুলোচনের নাম ধরে একবার ডাক দিয়েই সকলে বিরক্ত হয়ে ডাকে কৌতুকীকে। আর সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয় কৌতুকী।—যাউছি, যাউছি।

কাজে বিরক্তি নেই কৌতুকীর, কাজ পেলেই যেন বেঁচে যায়। পৃথিবীর সমস্ত কাজকর্মই বোধহয় চলছে কৌতুকীদের জন্যে। আপিস-আদালত, কল-কারখানা, এমন কি চাষবাসও চলছে হাজার হাজার চৈতন্য আর সুলোচনের মধ্যে একটি করে কৌতুকী আছে বলেই। যারা কাজ ভালবাসে, কাজ না পেলে হাঁপিয়ে ওঠে। অন্যে ফাঁকি দিচ্ছে, নিজে ফাঁকি পড়ছে জেনেও যারা অন্যের কাজকেও নিজের কাজ মনে করে।

ঠাকুরের ডাকে বৈকালিক জলযোগের থালা গেলাস চায়ের পেয়ালা ধুয়ে এনে জোগাড়যন্ত্র করে দেয় কৌতুকী, ঠাকুর খাবার সাজিয়ে দেয়, চা ঢেলে দেয়, আর ঠিক সেই মুহূর্তে এসে হাজির হয় চৈতন্য আর সুলোচন। সারা দিনে ঐ একটি কাজ তাদের, খাবারটি বাবুদের টেবিলে পৌঁছে দেয়া। কিন্তু এমন একটা ভাব দেখায়, যেন সব কাজটুকুই তারা করেছে। আপিসের বড়বাবু যেমন ভাব দেখায় বড় সাহেবের ঘরে গিয়ে। চা ভালো হলে কৃতিত্ব নেয় চৈতন্য আর সুলোচন, খারাপ হলে বলে, ঠাকুর বানিয়েছে আজ। কাজে ফাঁকি দিয়েও বাবুদের কাছে এত প্রিয় হবার চেষ্টা তাদের কেন তা প্রথম প্রথম কেউই বুঝতে পারে না, বুঝতে পারে বিদায়লগ্নে।

কেউ কেউ অবশ্য দুদিন আগে থেকেই বুঝতে পারেন, আদর আপ্যায়নটা হঠাৎ একটু বেশী হয়ে যাওয়ায় মনে মনে হাসেন, ভাবেন, যাবার সময় কৌতুকী ছাড়া আর কাউকে বকশিস দেবেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ঠাকুর দুটোও এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে কৌতুকীর ভাগ্যে চার আনা পয়সাও বেশী জোটে না। সব সময় আবার বকশিসটা তার হাতে গিয়ে পৌঁছয় কিনা সন্দেহ।

কিন্তু সে-সব চিন্তা করার সময় নেই এখন। তাড়াতাড়ি জলযোগ সেরে বেরিয়ে পড়ার জন্যে সকলেই উদ্‌গ্রীব।

সেজেগুজে সকলেই একে একে বেরিয়ে পড়ে। মিস্টার সেন, রুমা, রুমার মা, রেশম।

রমণীবাবু কুৎকুতে চোখে তাকান রুমার দিকে, তাকান ছেলের দিকে, তারপর তাকে তাড়া দিয়ে গৌতমের কাছে এসে ফিসফিস করে বলেন, ধন্য বাপ-মা মশাই! ননথিঙ্কেব্‌ল্‌।

—কেন, বাবা-মা কি দোষ করলো? গৌতম সুপ্রিয়র ঘড়িটা হাতে বাঁধতে বাঁধতে হাসলো।

রমণীবাবু বললেন, মেয়ের পোশাক পরিচ্ছদটা দেখুন একবার, উলঙ্গবাহার শাড়ী পরে বাপ মার সঙ্গে বেড়াতে চললেন বিদ্যেধরী।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে ওদিক থেকে বেরুলেন ব্রজমাধব বাবু, মিসেস ভট্চায, সঙ্গে ছেলে বাদল।

মিসেস ভট্চায একটু মিশুকে হবার চেষ্টা করেন সব সময়। তাই কথাটা শুনতে না পেলেও নাক ঢোকাবার ইচ্ছে দমলো না তাঁর। বললেন, কার কথা কইতেছেন, শুনি।

অপ্রস্তুত বোধ করলেন রমণীবাবু।

আরো অপ্রস্তুত করে দিলো সুপ্রিয়। বললে, রুমার সাজ-পোশাক দেখে চটে গেছেন রমণীবাবু।

হো হো করে হেসে উঠলেন মিসেস ভট্চায। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, হ তা তো বুঝলাম, কিন্তু সুপ্রিয়বাবু আপনি না যাব যাব করতে আছিলেন এদ্দিন, এখন তো দেহি নড়তে চান না।

সুপ্রিয় তবু বুঝতে না পারার ভাণ করে বলে, দেখি আর কয়েকদিন, দুধকুণ্ডের জল খেয়ে।

—জল কইবেন না, মধু. মধু—সুন্দরী মাইয়ালোকের চক্ষের মধু। বুঝি না কি, আমাদের চক্ষে ধুলা দিতে পাইরবেন না।

বলে নিজেই হাসতে শুরু করেন মিসেস ভট্চায, আর সঙ্গে সঙ্গে রমণীবাবু, গৌতম, ব্রজমাধববাবু সকলেই সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়েন।

সুপ্রিয় চেহারায় ব্যবহারে অতিরিক্ত স্মার্ট হলেও এই একটি ব্যাপারে কেমন লাজুক লাজুক। বিশেষ করে মনের মধ্যে রুমার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছেটা প্রচণ্ড বলেই সেটা চাপা দেবার চেষ্টা তার সবচেয়ে বেশী।

তাই একসঙ্গে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেও কেদারগৌরীর দিকে পা বাড়াতে কেমন সঙ্কোচ বোধ করলো সে। কারণ একটু

আগে সে জানালা থেকে লক্ষ্য করে দেখেছে রুমারা কেদারগৌরীর দিকেই যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সুপ্রিয় যখন জানালা থেকে উঁকি দিয়ে তাকিয়েছে, রুমাও সেই মুহূর্তে রাস্তা থেকে ফিরে তাকিয়েছিল সুপ্রিয়র দিকে। চোখোচোখি হয়েছে, আর সেই দৃষ্টিবিনিময়ে যেন অপ্রকাশিত আমন্ত্রণ দেখতে পেয়েছে সুপ্রিয়।

কিন্তু মিসেস ভট্চায কিছু মনে করতে পারেন ভেবেই সুপ্রিয় বললে, আমরা ক্যাপিটেলের দিকে যাবো।

অর্থাৎ নতুন শহর গড়ে উঠছে যে দিকটায়, সেদিকে।

মিসেস ভট্চায ঠোঁট টিপে কৌতুকের হাসি হাসলেন। তার পর পথ ধরলেন। রমণীবাবুও গেলেন তাঁদেরই সঙ্গে।

সুপ্রিয় ক্যাপিটেলের দিকে যেতে যেতে গৌতমের পিঠে হঠাৎ একটা থাপ্পড় মেরে বললে, বুড়োটার মুখে ঐসব, কিন্তু রস কম নেই প্রাণে। ওদিকে গেল রুমা গেছে বলেই।

গৌতম হেসে বললে, ওর ওপরও জেলাসি? ও আপনার কম্পিটিটর নয়।

—কম্পিটিটর কে তা বেশ বুঝি।

—কে?

—আপনি।

গৌতম জিভ কাটলো।—ছিঃ ছিঃ, ও কথা ভাববেন না। যখনই বুঝেছি আপনার একটু কেমন-কেমন, অমনি অ্যাবাউটটার্ণ করেছি।......

সুপ্রিয় হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো।—দূর মশাই, ক্যাপিটেলে গিয়ে কি ছাইপাঁশ করবো।

—সে কি, আপনিই তো বললেন ক্যাপিটেলে যাবো।

—আপনিও যেমন। রুমারা গিয়ে বসবে মুক্তেশ্বরের বাগানটায়, আর আমরা ক্যাপিটেলের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই!

দু'জনেই হেসে উঠলো।

দু'জনেই বাঁক নিলো। না, রাস্তা ধরে নয়। পাঁচিল দেওয়া প'ড়ো বাড়ীটার পাশ দিয়ে, ঘাসে ঢাকা মাঠ পার হয়ে।

মাঠের মাঝখানে একটা গভীর খাদ, যাকে পাথরের খনি বলে এদিকের লোক। বাড়ী তৈরীর জন্যে পাথর কেটে কেটে নিয়ে গেছে, পড়ে আছে নোংরা জলে ভরা খাদটা। তার পাশেই একটা ভাঙা পুরনো মন্দির, যে ধরনের মন্দির প্রতি দুশো গজ অন্তর এখানে দেখতে পাওয়া যায়।

সুপ্রিয় আর গৌতম তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে মন্দিরের গায়ের মূর্তিগুলো।

তারপর হাঁটতে শুরু করলো পুরী রোডের পীচ-ঢালা রাস্তার দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে গৌতম বললে, কোনারক যাবেন না?

—যাবো, যাবো, দুদিন সবুর করুন না, দেখি, রুমাদের দলে নেওয়া যায় কিনা।

রোজলার কোম্পানীর রিপ্রেজেন্টেটিভ শিবনাথবাবুর সঙ্গে শিখিনী এসে বসেছে মুক্তেশ্বরের বাগানে, কোণের দিকের একটা বেঞ্চিতে।

হাত-পা নেড়ে অনর্গল কথা বলছে সে, আর মুগ্ধ হয়ে শুনছেন শিবনাথবাবু।

আজ এখানে কাল সেখানে, সারা ভারত টহল দিয়ে বেড়ান তিনি। জীবনের অর্দ্ধেকটাই কেটে গেছে হোটেলে, বাকী অর্দ্ধেকটা কোলকাতার নোংরা মেসে।

চমৎকার মজবুত স্বাস্থ্য শিবনাথবাবুর, চেহারা দেখে চট করে

বোঝা যায় না যে চল্লিশ পার হয়েছেন। দেখতেও সুশ্রী। বাংলা দেশে এমন পাত্রের জন্যে মেয়ের অভাব হতো না, কিন্তু বিয়ে করেননি শিবনাথবাবু। না, বিয়ে করবেন না এমন কোন প্রতিজ্ঞা ছিল না। কিন্তু করবো করবো করে কখন যে চল্লিশ পার হয়ে গেছে নিজেই টের পান নি।

অবশ্য তার জন্যে তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ আছে বলে মনে হয় না। মেয়েদের সঙ্গেও আলাপ জমাতে তিনি ওস্তাদ। আলাপ জমানোই তাঁর কাজ। কোন্ লোকটা কখন কাজে দেবে, কে বলতে পারে।

প্রথম আলাপের পর শিখিনী চলে যেতেই তাঁর মনে হয়েছিল, মেয়েটার সঙ্গে একটু জমিয়ে নিতে হবে।

দুপুরে রিক্সায় যেতে যেতে মিস্ত্রীকে বলেছিলেন, বিকেলে ফিরে এসে পাঞ্জাবী মেয়েটার সঙ্গে একটু আলাপ-টালাপ করে রাখতে হবে মিস্ত্রী।

মিস্ত্রী সাদাসিধে মানুষ, অতশত বোঝে নি, শুধু বলেছিল, বিদেশ বিভুঁইয়ে এসে ওসব কি ভালো স্যার!

কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠেছিলেন শিবনাথবাবু। বলেছিলেন, তুমি একটু বোকা মিস্ত্রী। সে-আলাপ নয়, সে-সবের বয়েস আর আছে নাকি। বলছিলাম কি, দেখে মনে হয় বেশ বড় ঘরের মেয়ে, চেহারা সাজ-পোশাক দেখো নি। আলাপ করে রাখলে হয়তো কোথাও অর্ডারটর্ডার বাগানো যাবে।

শুনে হেসে উঠেছে মিস্ত্রী।—তাই বলুন। তা স্যার আলাপ যদি জমাতেই হয় তো ঐ ছ'নম্বরের মিস্টার সেনের সঙ্গে। হিমাদ্রিবাবু বলছিলেন, কোথাকার যেন বড় অফিসার…

—উহুঁ। ঘাড় নাড়েন শিবনাথবাবু। বলেন, মুস্কিল আছে।

—মুস্কিল?

—হ্যাঁ, মিস্ত্রী, হ্যাঁ। একে বাঙালী, তায় সঙ্গে যুবতী মেয়ে আছে, ভাববে মেয়েটার জন্যেই আলাপ করছি বাপের সঙ্গে।

বলে সশব্দে হেসে ওঠেন শিবনাথবাবু। আর সচকিত হয়ে দেখেন রিক্সা থেমে গেছে আপিসের সামনে।

তারপর সারাটা দুপুর পাখা মেরামত করেছে মিস্ত্রী, আর শিবনাথবাবু আলাপ জমিয়েছেন এ-সেকশনে ও-সেকশনে। রোদটা একটু কমে আসতেই মিস্ত্রীকে তাড়া দিয়েছেন। কে জানে, দেরী হলে পাঞ্জাবী মেয়েটা হয়তো বেড়াতে বেরিয়ে যাবে।

মিস্ত্রী উত্তর দিয়েছে, একটা টাকা দিন স্যার, দিয়ে আপনি চলে যান, আমি একটু গলাটা ভিজিয়ে যাবো।

বিনাবাক্যব্যয়ে একটা নিকেলের টাকা বের করে দিয়েছেন শিবনাথবাবু, তারপর হোটেলের পথ ধরেছেন।

রোদের তাপ কমলেও হোটেলটা বেশ খানিকটা দূরে। তাই এদিক-ওদিক তাকিয়ে রিক্সা খুঁজলেন। পেলেন না। বাধ্য হয়ে হাঁটতেই শুরু করলেন।

অনেকখানি আসার পর হঠাৎ পিছন থেকে নারীকণ্ঠের ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালেন শিবনাথবাবু।

—বাবুজী! বাবুজী!

রিক্সা থেকেই ডাকছে শিখিনী।

রিক্সাটা কাছে আসতেই সে ডাকলে, চলে আইয়ে।

দু'জনে ঠাসাঠাসি করে বসে পড়লো রিক্সায়। রিক্সা চলতে শুরু করলো।

আজেবাজে নানা কথা, অনর্গল কথা বলে গেল শিখিনী।

হোটেলে ফিরে গা-হাত ধুয়ে জলখাবার খেয়ে সে নিজে থেকেই বললে, চলুন বাবুজী, মন্দির যাবো, ঘুম্নে।

খুশী হলেন শিবনাথবাবু। একটু সাজগোজও করে নিলেন

তাড়াতাড়ি। আয়নায় মুখ দেখলেন। চেহারাটা তাঁর ভালোই, তা না হলে পাঞ্জাবী মেয়েটা এমন গায়ে-পড়া ভাব করে। নির্ঘাৎ চোখে লেগেছে তার।

মনে মনে হাসলেন শিবনাথবাবু। তা একটু প্রেম-প্রেম ভাব করলে দোষ কি। আলাপের ফাঁকে আসলে জেনে নিতে হবে বাপ-দাদারা কে কি করে। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বড়সড় কেউ আছে কিনা ! বলা তো যায় না, হয়তো মিনিষ্টার-টিনিষ্টারও থাকতে পারে।

অভ্যাস নেই তাঁর, তবু বেশ চেষ্টা করেই মেয়েটির রূপের প্রশংসা করলেন। বললেন, আপনার মত খুপসুরৎ মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি।

খিলখিল করে হেসে উঠলো শিখিনী। আরেকটু হলেই হয়তো রাস্তায় লুটিয়ে পড়তো, শিবনাথবাবুর শক্ত হাতে ভর দিয়ে কোনো রকমে সামলে নিলো।

তারপর হাসি চেপে বললে, আমি সুন্দার ?

শিবনাথবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, আলবৎ।

এবার যেন বিশ্বাস হলো শিখিনীর। বললে, আপনার মত মজবুত আদমিও রেয়ার।

মুক্তেশ্বরের বাগানের ভেতর ঢুকে পড়েছেন তখন শিবনাথবাবু। এক কোণের বেঞ্চিটা দেখিয়ে এগিয়ে গেল শিখিনী। ছেলেমানুষের মন স্কিপিং করার ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে ছুটে গেল সে।

ফট ফট করে রুমাল দিয়ে বেঞ্চের একটা দিক ঝেড়ে দিয়ে বললে, বৈঠিয়ে।

পাশের জায়গাটুকু পরিষ্কার করে নিজে বসলো।

তারপর অনর্গল কথা আর হাসি, হাসি আর কথা। তারই ফাঁকে ফাঁকে শিবনাথবাবু জেনে নেন, কি নাম তার, কোথায় বাড়ী, বাপ কি করে…

হঠাৎ শিখিনী চুপ করে গেল। চুপ করে থাকতে থাকতে বললে, বাবুজী, মোহান্তিবাবুর সাথ আপনার তো বহুৎ দোস্তি। আজ আপিসে দেখেছি।

বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালেন শিবনাথবাবু।

শিখিনী লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে বললে, একটা কাম বাবুজী আপনাকে করে দিতে হবে।

—কি কাজ? সহাস্যে জিগ্যেস করলেন শিবনাথবাবু।

শিখিনী ধীরে ধীরে বললে, টিচারের চাকরীটা বাবুজী মোহান্তিবাবু বলে দিলেই মিলে যাবে। আপনি বাবুজী মেহেরবানী করে……

বিকেল থেকেই মন খারাপ বাদলের। দুপুরে শুয়ে শুয়ে শুনেছে সে, পরের দিন সকালেই নাকি চলে যাবে তারা।

শুনে থেকে বেচারার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। টম থাকবে, মাসীমা থাকবে, বেলুদি থাকবে, এমনকি রুমাদি, রেশমদাও থাকবে, আর তাকেই চলে যেতে হবে। বাবার ছুটি ফুরিয়ে গেছে।

বিকেলে মা যখন কপাট বন্ধ করে কাপড় ছাড়ছিল তখন বাবা হিমাদ্রিবাবুকে ডেকে বলেছে রাত্তিরে হিসেবপত্র মিটিয়ে নিতে।

শুনতে পেয়ে বেলু ছুটে এসেছে, মা দরজা খুলতেই বলেছে, গৌরীদি, চলে যাবেন কাল?

—হ্যাঁ ভাই, ছুটি ফুরিয়ে গেছে।

বেলুরও খুব খারাপ লেগেছে শুনে।

আর বাদল বিষণ্ণ মুখে ছ'নম্বর ঘর থেকে শুরু করে তেরো নম্বর

পর্যন্ত সব ঘরের সামনে থামতে থামতে কি যেন গুণেছে আঙুলের কড়ায়।

তারপর মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে গেছে একসময়।

গৌরীকুণ্ডর দিকে যান নি সুশান্তবাবু। সুশান্ত রেজ, টাটার ইঞ্জিনিয়ার, একটু ছিমছাম প্রকৃতির মানুষ, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসেন। তাই বিন্দুসরোবর পার হয়ে সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের দিকের নোংরা বাজারটায় কোনদিন যাননি। শেষ দিনটায় কিন্তু মন্দিরে পূজো দিয়ে যেতে চাইলেন গৌরী দেবী।

পাণ্ডার ছোকরা ছড়িদারটাকে বলাই ছিল, সে সন্ধ্যের সময় এসে হাজির হলো, আর তার সঙ্গে রওনা হয়ে গেলেন ওঁরা।

মন্দিরে পূজো দিয়ে, মন্দিরের গায়ের মূর্তিগুলো দেখে দু'জনে হাসাহাসি করতে করতে বেরিয়ে এলেন, আর তখনই বেঁকে বসলো বাদল।

লজেন্স কিনে দিতে হবে।

সুশান্তবাবু পকেট থেকে ব্যাগ বের করে দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, চারো পয়সারো লজেন্স দিও।

—না। না। চিৎকার করে উঠলো বাদল।

গৌরী দেবী ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে জিগ্যেস করলেন, তবে কি নিবি?

বাদল ভয় ভয় চোখে তাকিয়ে বললে, চার পয়সার নয়, কুড়িটা।

—অত কি হবে? ধমক দিলেন সুশান্তবাবু।

কিন্তু উত্তর নেই, চার পয়সার লজেন্স সে কিছুতেই নেবে না।

ধমক দিয়ে, রাগারাগি করে, আদর দিয়ে কোন ক্রমেই যখন ভোলানো গেল না তখন গুণে গুণে কুড়িটা লজেন্সই কিনে দিলেন সুশান্তবাবু।

ভঙ্গিতে হাত দুখানা মাঝপথ পর্যন্ত তুলে বললেন, চললাম ভাই। ভালো করে আলাপটাও হলো না।

রুমাও হাসলো, কাছে এগিয়ে এলো।

মিসেস ভটচায গৌরী দেবীর হাত দুখানা মুঠোর মধ্যে নিয়ে শেষবারের মত অনর্গল অনেক কথা বলে নিলেন।

টমের চোখ ছলছল করে উঠলো বাদল চলে যাচ্ছে দেখে।

বাদল হাসলো। বললে, আমাদের গাড়ি যখন যাবে এদিক দিয়ে, 'রেলগাড়ি চললো' বলো কিন্তু।

টম গাঢ় গলায় বললে, তুমি তো শুনতে পাবে না।

—হ্যাঁ পাবো। তুমি রুমাল নাড়বে বরং। আমি ঠিক এদিকে তাকিয়ে থাকবো।

টম বললে, হ্যাঁ, সেই বেশ হবে। তাকিয়ে থেকো কিন্তু।

টম আর বাদলের কথা শুনছিলেন গৌরীদেবী, হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠলেন, আর থতমত খেয়ে গেলো টম।

এবার বিদায়ের পালা। সুশান্তবাবু আর গৌরীদেবী নীচে নেমে গেলেন ক্ষয়ে যাওয়া ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে।

জিনিসপত্তর সব রিক্সায় তোলা হয়ে গেছে। এসে দেখলেন, সারা হোটেলের ঠাকুর-চাকর এমন কি লক্ষ্মীবৌও এসে দাঁড়িয়েছে—বকশিসের লোভে।

—কৌতুকী কই? কৌতুকী?

ডাক শুনে বেরিয়ে এল কৌতুকী, এক মুখ কুমড়োর বীচির মত বড় বড় হলদে হলদে দাঁত বের করে হাসলো সে।

কৌতুকীকে কিছু বেশী দেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু দেখায় খারাপ। লোকগুলোর সামনে একজনকে বেশী দিতে যাওয়া কেমন যেন লাগে।

ব্যাগ থেকে তিনটি টাকা বের করে স্ত্রীর হাতে দিলেন সুশান্ত

বাবু। গৌরীদেবী টাকা তিনটি ঠাকুরের হাতে দিয়ে বললেন, তোমরা সবাই ভাগ করে নিও।

রিক্সা চলতে শুরু করেছে তখন।

বাদল হঠাৎ বলে উঠলো, বাঃ রে, বকশিসের বেলায় সমান ভাগ, কাজের বেলায় সব কৌতুকী!

সুশান্তবাবু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, আমাদের আপিসেও তাই।

ঠিক এমন একটা ঘটনা ঘটবে সকলেই যেন জানতো। কিন্তু কেউই আগে থেকে সাবধান করে দেয়নি।

সুশান্তবাবুরা চলে যাবার পর এক বাণ্ডিল হ্যাণ্ডবিল আর বাঁধানো খাতাটা নিয়ে সাইকেলের ক্রিং ক্রিং বাজিয়ে হিমাদ্রিবাবুও চলে গেলেন স্টেশনের দিকে। ছুটো সীট খালি হয়ে গেল, নতুন খদ্দের যদি পাওয়া যায়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মাঠের ধার দিয়ে হুইসল বাজিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ঝিকমিক ঝিকমিক শব্দ তুলে ট্রেণটা যেতে দেখা গেল। কিন্তু সমস্ত হোটেল কেমন যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। সাড়া শব্দ নেই, চিৎকার নেই। প্রতিদিনের মত 'রেলগাড়ি চললো' 'রেলগাড়ি চললো' সেই বিদঘুটে কান-ঝালাপালা-করা হট্টগোল নেই। অন্যদিনের তুলনায় কেমন যেন অন্যরকম মনে হয়।

ব্যতিক্রমটা সকলেই বুঝি লক্ষ্য করেছিল। বিশেষ করে সুপ্রিয় আর গৌতম।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ছু'জনেই। এসে দেখলে, বারান্দার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে টম। চুপচাপ তাকিয়ে আছে চলন্ত

সুপ্রিয় আবার কি বলতে যাচ্ছিল, দেখলে উঁচু হিল জুতোর খট খট শব্দ তুলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে শিখিনী।

শিখিনীও একটু বিস্মিত হলো। সারা হোটেলের লোকগুলো এখানে জটলা পাকিয়ে কেন?

বিস্মিত চোখেই তাকালো সে, আর সুপ্রিয় বললে, গৌতম-বাবুকে দেখেছেন?

—গৌতমবাবু? আপকা রুম-মেট? হাঁ, কটকের বাসে চলে গেলেন তো আভি।

—বাসে? চলে গেলেন?

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত একেই বলে। চিৎকার হট্টগোল করে ঠাকুর চাকরদের ডাকলো সুপ্রিয়, তালা ভাঙতে বললো।

তালা ভাঙার পর দেখা গেল, যা সন্দেহ হয়েছিল তাই। সুপ্রিয়র দেওয়া শুধু সেই রীস্ট-ওয়াচই নয়, দামী ক্যামেরাটা এবং নগদ সত্তরটা টাকাও নিয়ে সরে পড়েছে গৌতম। ফেলে গেছে তার নিজের নতুন কেনা ফাইবারের স্যুটকেশ আর পুরোনো তোষক বালিশ।

একে একে সকলেই বললে, এমন যে হবে আমরা আগেই জানতাম। সকলেই দোষ দিলো সুপ্রিয়কে। তারপর একে একে সকলেই সরে গেল। রইলো শুধু রুমা আর রেশম।

সহানুভূতির, সমবেদনার ছুটি বড় বড় চোখ মেলে রুমা এবার তাকালো সুপ্রিয়র বিভ্রান্ত মুখখানার দিকে। বেচারা। কাঁধে এখনো তোয়ালে, পরনে ভিজে কাপড়। কেমন যেন বোকা বনে গেছে।

স্যুটকেশ-ট্রাঙ্ক উলটাল করে এতক্ষণ তল্লাস চালাচ্ছিল সুপ্রিয়, আর কিছু চুরি গেছে কিনা। না, আর বোধহয় কিছু যায় নি।

এইবার রুমার দিকে ফিরে তাকালো সুপ্রিয়, চোখোচোখি হতেই কেমন অপ্রতিভ হাসি হাসলে।

রুমা শান্ত শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, লোকটা আপনার বন্ধু নয়?

—না, না। আমার মতই বেড়াতে এসেছে, ভেবেছিলাম। এখানেই আলাপ।

রুমা স্যুটকেশ থেকে একখানা ধুতি বের করে দিলো সুপ্রিয়র হাতে, বললে, ভিজে কাপড়ে থাকবেন না, ছেড়ে ফেলুন। আয় রেশম। বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো রুমা।

বেরিয়ে এসে রেশমকে বললে, দেখতো, সাইকেলের বেল মনে হলো, হিমাদ্রিবাবু ফিরলেন বোধ হয়।

রেশম বারান্দা থেকে নীচে উঁকি দিয়ে বললে, হ্যাঁ রে দিদি।

রুমাও রেলিঙে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়লো।—ও হিমাদ্রিবাবু, হিমাদ্রিবাবু! শুনে যান একবার।

হিমাদ্রিবাবু সাইকেল থেকে নেমেই খবর পেয়েছিলেন, ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠে এলেন।

আর হিমাদ্রিবাবুর নাম শুনে সুপ্রিয়ও বেরিয়ে এলো ধোপ-দুরস্ত ধুতিটা লুঙির মত করে পরে চুলে চিরুণী টানতে টানতে। নতুন ঘড়ি, দামী ক্যামেরা এবং নগদ সত্তর টাকা চুরি যাবার বিমর্ষ ভাবটা ইতিমধ্যে অন্তর্হিত হয়েছে সুপ্রিয়র মুখ থেকে। চুরি গেছে বটে অনেক কিছু, কিন্তু লাভও হয়েছে তার। যে রুমাকে শুধুই চোখে চোখে অন্তরঙ্গ করে তোলার চেষ্টা করছিল, এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে তার সঙ্গে আলাপ হয়ে যাওয়াটা তো কম লাভ নয়।

তাই দুঃখ দূর হয়ে ক্রোধ দেখা দিলো তার চোখে। বিরক্ত হয়ে হিমাদ্রিবাবুকে বললে, কি মশাই, যত সব চোর ছ্যাঁচোড় ঢুকিয়ে দেন ঘরে?

হিমাদ্রিবাবু কাজের লোক। কথাটায় কান দিলেন না। বললেন, পুলিসে খবর দিয়েছেন ?

—না। ঠিকানা আপনার রেজিস্টারে লেখেনি ?

হাসলেন হিমাদ্রিবাবু।—যে চুরি করে পালাবে, সে কি তার সত্যিকার নাম ঠিকানা দেয় মশাই। বলুন, কি কি গেছে, থানায় খবর দিয়ে আসি। আপনাকেও বলি মশাই, একটু সাবধান হবেন না ? অচেনা লোকের সঙ্গে এত দহরম মহরমই বা কেন, এত বিশ্বাস করতেই বা গেলেন কেন ?

সুপ্রিয় এবার চটে গেল।—এ কথা আগে বলেন নি কেন ? তা হলে তো সাবধান হতাম।

হাসলেন হিমাদ্রিবাবু।—সুপ্রিয়বাবু, হোটেল আমার ব্যবসা। এর আগে একবার এমনি সাবধান করতে গিয়ে কি হলো জানেন ? দু'ভদ্রলোকই চটে গিয়ে ঐ রয়াল হোটেলে চলে গেলেন। বোর্ডারকে অবিশ্বাস করি আমি, তারা থাকবে কেন !

হিমাদ্রিবাবু আর কথা বাড়ালেন না। চলে গেলেন পুলিসকে খবর দিতে।

আর রুমা বললে, ভেবে আর কি করবেন, একটা বেজে গেছে, খেয়ে নিন আপনি।

নিজের ঘরেই টেবিলে-চেয়ারে খেতে বসলো সুপ্রিয়। ঠাকুর ভাত দিয়ে গেল। আর রুমা দাঁড়িয়ে রইলো চৌকাঠের কাছে।

সুপ্রিয় খেতে খেতে বললে, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন। বসুন না এখানে। বলে তক্তপোশটা দেখিয়ে দিলো।

রুমা প্রথমটা একটু কিন্তু কিন্তু করলো। তারপর তক্তপোশের এক পাশ থেকে বিছানাটা গুটিয়ে দিয়ে সেখানেই বসলো।

বললে, সত্যি, আপনার কিন্তু অত বিশ্বাস করা উচিত হয়নি।

সুপ্রিয় হাসলে।—যাক্‌গে, এখন টেলিগ্রাম করে কিছু টাকা আনিয়ে নিতে হবে। চেহারা দেখে তো বুঝিনি…

রুমা মৃদু হেসে বললে, চেহারা দেখে কি কাউকে ধরা যায় নাকি। সত্যি, আপনার জন্যে আমার এত কষ্ট হচ্ছে!

রেশম এতক্ষণ বারান্দায় ঘুরঘুর করছিল। আর ফিরে ফিরে উঁকি দিচ্ছিলো ঘরের মধ্যে। দিদির এই বেহায়াপনা ওর মোটেই ভাল লাগছিলো না। বিশেষ করে সুপ্রিয়কে ওর একেবারেই পছন্দ নয়।

রুমা সুপ্রিয়র ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই ফিস ফিস করে রেশম বললে, যেমন চালবাজি দেখায় দিনরাত, ঠিক হয়েছে।

রুমা চটে গেল।—ছিঃ, ভদ্রলোকের কত লোকসান হয়ে গেল বলতো! খুব ভালোমানুষ, তা না হলে এত বিশ্বাস করে চোরটাকে। নিজের হাতের ঘড়ি খুলে পরতে দিয়েছিলেন। এত কষ্ট হচ্ছে আমার…

খবরটা তখন রীতিমত রটে গেছে। চুরি হয়েছে, হোটেলে চুরি। যে শোনে সেই ছুটে আসে, আর যে আসে সেই উপদেশ দেয়।

মিসেস ভট্‌চায আর ব্রজমাধববাবুও খাওয়াদাওয়া সেরে উঁকি দিলেন সুপ্রিয়র ঘরে।—আপনার নাকি যথাসর্বস্ব চুরি কইরা লইয়া গেছে। সত্য নাকি সুপ্রিয়বাবু?

সুপ্রিয় কি আর উত্তর দেবে এ-প্রশ্নের, কত জনকে উত্তর দেবে। হেসে বললে, হ্যাঁ, সব ফাঁক করে দিয়ে চলে গেছে। ব্যাটার নামের বাহার কত, গৌতম, সাক্ষাৎ গৌতম বুদ্ধ। পাই ব্যাটাকে একবার…

মিসেস ভট্‌চায উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, অর তো অখনই প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। আপনারেও কই সুপ্রিয়বাবু, বন্ধুর লগে অতটা বাড়াবাড়ি উচিত হয় নাই আপনার।

রমণীবাবুও এসে ঢুকলেন হট্টগোল শুনে।—আমি অনেক আগেই ভেবেছিলাম সুপ্রিয়বাবু, এমন একটা কিছু হবে। হোটেলে-চেনা লোকরা সবচেয়ে আনবিলিভেব্‌ল্‌। বিলিভ করেছেন কি ঠকেছেন।

রমণীবাবুর ইংরেজী শুনে মুখে রুমাল চাপা দিলেন মিসেস ভট্‌চায। আর সুপ্রিয় ভাবলে, যা গেছে তা তো গেছেই, এই সুযোগে আলাপটা তো হয়ে গেল রুমার সঙ্গে। লোকগুলো এখন বিদায় হয় না কেন। তা হলে রুমা হয়তো আবার আসতো।

হঠাৎ এই চুরিটা হয়ে যে সুপ্রিয় আর রুমার সুবিধে হয়েছে, তু'জনে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তা লক্ষ্য করেছে সবাই। বিশেষ করে শিবনাথবাবু।

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে শিবনাথবাবু তাঁর মেকানিককে সে-কথা বললেন।—বুঝলে মিস্ত্রী, ও ছোকরা চুরি করে পালিয়েছে বলে গালাগালি দিচ্ছে সবাই। কিন্তু খুব অন্তরঙ্গ হয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করে তার পকেট কাটায় সবাই তো বাবা ওস্তাদ। এই আমি, এত আলাপ করি লোকের সঙ্গে, উদ্দেশ্য তো সেই পকেট কাটা, কি বলো? কিংবা ধরো ঐ সুপ্রিয়বাবু, এত যে মিশছে মিস্টার সেনের সঙ্গে, তাঁর স্ত্রীকে মাসীমা বলছে, আসলে পকেট কাটবে ও। দেখে নিও। ঐ রূপবতী যুবতী মেয়েটিকে....

রূপবতী যুবতী মেয়েটির দিকেই যে সুপ্রিয়র দৃষ্টি তা বুঝতে পারেন না মিস্টার সেন। এমন কি শ্রীলেখা দেবীও বুঝতে পারেন না।

চুরিটা হওয়ার পর থেকে সুপ্রিয়কে কেমন যেন করুণার চোখে,

স্নেহের চোখে দেখতে শুরু করেছেন তিনি। আহা, বেচারী বিদেশ বিভূঁইয়ে বেড়াতে এসে এমন বিপদে পড়েছে!

বিকেলের রোদ নরম হতেই ভ্রমণে বের হচ্ছিলেন শ্রীলেখা দেবী। সামনে সুপ্রিয়কে দেখে ডাকলেন।—ও ছেলে, হদিস পেলে কিছু?

—না মাসীমা। সত্যি এমন বিপদে পড়েছি, একটা পয়সা নেই হাতে। টেলিগ্রাম করেছি বাড়ীতে, কখন যে টাকা এসে পৌঁছবে।

শ্রীলেখা দেবীর মন ভিজে গেল।—সে কি! কিছু নেই তোমার হাতে? তা হলে, দু'পাঁচ টাকা দরকার হয়তো·····

মিস্টার সেনও সায় দিলেন।—আমরাও এমন কিছু বেশী নিয়ে আসিনি, তবু আপনার যদি প্রয়োজন হয় সামান্য কিছু নিয়ে রাখতে পারেন। ও রুমা—

সুপ্রিয় বাধা দেবার আগেই একমুখ হেসে উঠলেন শ্রীলেখা দেবী। স্বামীকে বললেন, ওকে আর আপনি বলো না তুমি, আমাদের পশমের চেয়েও ছোট।

সুপ্রিয়ও হাসলো।—হ্যাঁ, আপনি আমাকে 'তুমিই' বলবেন।

মিস্টার সেন হেসে বললেন, বেশ তাই হবে, তাই হবে।

অর্থাৎ এড়িয়ে গেলেন। সোজাসুজি 'তুমি' বলতে বাধলো।

শ্রীলেখা দেবী সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। নামতে নামতে বললেন, রুমা রেশম রইলো, দরকার হয়তো চেয়ে নিও, 'কিন্তু' করো না।

বলে নীচে নেমে গেলেন দু'জনেই। একে একে অন্য সকলেও বেরিয়ে গেলেন বৈকালিক ভ্রমণে।

ঘরের জানালা থেকে সুপ্রিয় উঁকি দিয়ে দেখলো শিবনাথবাবু আর পাঞ্জাবী মেয়েটি খুব মশগুল হয়ে গল্প করতে করতে চলেছে

গৌরীকুণ্ডের দিকে। রমণীবাবুও সেজেগুজে দাঁড়িয়েছিলেন, সময় হিসেব করে ঘরে তালা দিয়েছিলেন যাতে মিস্টার সেনের সঙ্গে গল্প করতে করতে একই পথে যাওয়া যায়, কিন্তু মুখের ভাব তাঁর বদলে গেল রুমাকে বের হতে না দেখে। অথচ তখন আর উপায় নেই। বাধ্য হয়েই রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হলো তাঁকে।

রমণীবাবু বেরিয়ে যেতেই বারান্দার রেলিং ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো সুপ্রিয়। সেই যে দুপুরে এসেছিল রুমা, তারপর আর দেখা পায়নি, কথা বলেনি।

ক্রমে ক্রমে মেঘের ফাঁক থেকে এক টুকরো ভাঙা চাঁদ উঁকি দিলো। নির্জন অন্ধকার বারান্দায় পড়লো ফিকে চন্দ্রালোক। মাধবীলতার ছায়া দুললো হাল্কা বাতাসে। নীচের তলার কুয়োতলা থেকে থামের গা জড়িয়ে উঠেছে মাধবীলতার ঝাড়, দোতলার বারান্দার থামের গায়ে গায়ে দুলছে তার কচি কচি ডগা। আর থোপা থোপা ফুল ফুটেছে। লাল আর সাদা ফুল। সাদা ফুলগুলো একটু একটু করে লাল হয়ে উঠছে। এই একটু আগেও এত লাল ছিল না। নাকি রান্নাঘরের আলোটা এসে পড়েছে বলেই এত সুন্দর দেখাচ্ছে ?

সারা বারান্দাটা কেমন রোমাঞ্চ-মধুর, আলো-অন্ধকারে রহস্যময়। রহস্যময় আর নির্জন। সকলেই বেড়াতে বেরিয়ে গেছে। ফিরেছে শুধু শিবনাথবাবুর মেকানিক, যাকে শিবনাথবাবু নিজে বলেন মিস্ত্রী। লোকটা সারাদিন খাটে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার করে, খায় পেটভরে আর বিকেলে ফিরে এসেই ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। নেহাৎ শিবনাথবাবুর পাল্লায় না পড়লে বেড়াতে বের হয় না, ক্লান্তিতে দুর্বল না বোধ করলে সস্তা মদের দোকানে গিয়ে গলা ভেজায় না।

ওদিকে হিমাদ্রিবাবুর বাসায় অবশ্য লোকজন আছে। রেডিও

চলছিল, ক্ষণেকের জন্যে থামতেই বেলুর গলা কানে এলো রুমার। চিৎকার করে পড়া মুখস্থ করছে বেলু। পড়ছে ভারতের শাসন-পদ্ধতি ঃ 'ভারতের জেলাশাসককে সরকারের চক্ষু কর্ণ মুখ ও হস্ত বলা হয়। তিনি সর্বদাই সফরে বাহির হন এবং নানা শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসেন। কোথায় কতখানি বৃষ্টিপাত হইল, অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ হইবে কিনা, চাষীরা চাষ ছাড়িয়া ভিক্ষায় বাহির হইতেছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সরকারকে অবহিত করেন·· ···'

বারবার এই কয়েকটা লাইনই পড়ছে বেলু। ছ'নম্বরের তক্তপোশের এক কোণে বসে দেয়ালে পিঠ দিয়ে একমনে উল বুনতে বুনতে হঠাৎ চোখ কান সজাগ করে শুনলো রুমা। নিজের মনেই হাসলো।

রেশম ওদিকে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে ডিটেকটিভ বই পড়ছে। ঠাকুর চাকরের উদ্দেশ্যে ধমক দিচ্ছেন হিমাদ্রিবাবু।

হঠাৎ হাওয়ায় পর্দাটা দুলে উঠতেই রুমার চোখ গেল বারান্দার দিকে। বুকটা ছমছম করে উঠলো। কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে বারান্দায়? আবছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাই বুঝতে পারলো না। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। আরো বারকয়েক পর্দাটা দুলে উঠতেই দেখতে পেলো।

সুপ্রিয়বাবু না? হ্যাঁ, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে।

তা হলে উনিও কি বেড়াতে যান নি?

আবার উল বোনায় মন দিলো রুমা, আর তার নিজেরই অজান্তে ঠোঁটের কোণে একটু কৌতুকের হাসি দুলে গেল।

না, একমনে আর উল বুনতে পারছেনা রুমা। বারবার সুপ্রিয়র দিকে তাকাতে ইচ্ছে হচ্ছে। তাকালোও বারকয়েক। কিন্তু সুপ্রিয়

তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। বোধহয় সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরের দিকে।

জ্যোৎস্না রাতে বেশ দেখায় কিন্তু মন্দিরটা। দিনের বেলায় দশ মাইল দূর থেকেও দেখা যায় এত উঁচু। গড়নটাও বেশ নিটোল। রাত্রে, শুক্লপক্ষের চাঁদ থাকলে মাটি আর আকাশের গায়ে মন্দিরটার ছায়া ছায়া রূপ বড় সুন্দর দেখায়। মনে হয়, আর কোথাও কিছু নেই, শুধু একা একা আকাশে হেলান দিয়ে পৃথিবীকে পাহারা দিচ্ছে যেন।

এক মুহূর্তে কি যেন ভাবলো রুমা। যাবে, ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াবে? দেখবে এই সুন্দর ছায়াছবি? না, কক্ষনো না, সুপ্রিয় দাঁড়িয়ে আছে বলেই কি বারান্দায় এসে দাঁড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে তার? কক্ষনো না। মাধবীলতার ফুলগুলো ফুটে আছে থোকা থোকা হ'য়ে, সেগুলো তুলতে ইচ্ছে হচ্ছে তার। মন্দিরটা চাঁদের আলোয় কেমন লাগে তা দেখতে। সুপ্রিয় না থাকলেও বেরিয়ে আসতো রুমা। সুপ্রিয় না থাকলে বরং বেরিয়ে আসা সহজ হতো।

সুপ্রিয় থাকলেই বা। মানুষ তো। জন্তু-জানোয়ারও নয়, চোর ডাকাতও নয়। আর আমি কি যথেষ্ট বড় হইনি? ভেবেচিন্তে চলতে শিখেছি, নিজেকে নিজেই শাসন করতেও শিখেছি—ভাবলো রুমা।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উলের বল বোনার কাঁটা থলীর মধ্যে ভরে একপাশে সরিয়ে রাখলো রুমা। একবার তাকালো রেশমের দিকে। তারপর আড়মোড়া ভেঙে ধীরে ধীরে বারান্দায় বেরিয়ে এলো।

পায়ের শব্দে চকিতে একবার তাকালো সুপ্রিয়। সমস্ত শরীরে যেন তার সেতার শিহরণের ঝঙ্কার বেজে উঠলো। কিন্তু কথা বলতে পারলো না।

একটু দূরত্ব রেখে রুমাও এসে দাঁড়ালো বারান্দায়। সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরটার দিকে তাকালো একবার, মাধবীলতার দিকে। উপযাচিকা প্রণয়ীর মত মাধবীশাখার ডগাগুলো যেন দুঃসাহসের উঁকি দিচ্ছে বারান্দার জানালায়।

সেগুলির ওপর স্নেহের মত নরম হাত বুলিয়ে গেল রুমা। তারপর থোকা থোকা ফুল ছিঁড়তে শুরু করলো।

না, ঐ বড় থোকাটার কিছুতেই নাগাল পাচ্ছে না রুমা। বারবার চেষ্টা করেও পারলো না। রেলিং থেকে অতখানি ঝুঁকে পড়তে ভয় হচ্ছে।

সুপ্রিয় দেখছিল তার কাণ্ডকারখানা। দেখছিল আর নিঃশব্দে হাসছিল। এবার সে এগিয়ে এলো। হাত বাড়িয়ে থোকাটা ছিঁড়ে আনলো। হাত বাড়িয়ে থোকাটা দিলো রুমাকে।

—কি সুন্দর! ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে বললো রুমা। খোঁপায় পরলো।

সুপ্রিয় বললে, বেড়াতে যান নি?

—না। আপনি যান নি কেন?

—ভালো লাগলো না।

খিল খিল করে হাসলো রুমা।—এখনো চুরির কথা ভাবছেন বুঝি?

হাসির সঙ্গে সঙ্গে মাথা দোলালো রুমা, আর ফুলের গুচ্ছ খুলে পড়ে গেল খোঁপা থেকে।

কুড়িয়ে নিলো সুপ্রিয়, নিজেই খোঁপায় গুঁজে দিতে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছ'নম্বর ঘরের দরজায় চোখ যেতেই হাত থেমে গেল তার।

রেশম এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। চোখে তার বিরক্তির কিংবা অপছন্দের দৃষ্টি।

রেশম ডাকলে, দিদি !

—কিরে ? সহজ ভাবেই ফিরে তাকালো রুমা।

—জিওগ্রাফিটা একটু বুঝিয়ে দিবি আয়।

ঠোঁট টিপে কৌতুকের হাসি হেসে রুমা বললে, যাচ্ছি। তুই তো এতক্ষণ গল্প পড়ছিলি।

—এখন জিওগ্রাফি পড়বো। তেমনি রুষ্ট স্বরেই বললো রেশম।

রুমা অন্যসময় হলে বলতো, জিওগ্রাফি নয়, জ্যোগ্রাফি। এখন মৃদু হেসে বললে, চল যাচ্ছি।

চলে গেল রুমা। বিষুবরেখা আর কর্কটরেখা বোঝাতে। সুপ্রিয়র আশা আকাঙ্খার গায়ে কর্কটদংশনের জ্বালা রেখে।

বুড়ো রমণীরঞ্জন দত্ত তিনখানা ট্যারাবাঁকা দাঁতের ফাঁক থেকে মুচকি হেসে কাপড়ের খুঁটে পুরু লেন্সের চশমার কাচ ঘষে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন বারো নম্বর ঘরের সামনে।

—ও শিবনাথবাবু, আটটা না বাজতেই যে শুয়ে পড়লেন। আপনাদের কি বলুন, জোয়ান বয়েস, আমাদের মত স্লীপলেসনেসে ভুগতে হয় না।

শিবনাথবাবু উঠে বসলেন তক্তপোশের ওপর।। হেসে বললেন, আসুন, আসুন, কি খবর ?

—আরে মশাই, খবর আছে বলেই তো এলাম। জবর খবর। আর ওঁদেরও বলি মশাই, অমন একটা ধিঙ্গি মেয়েকে রেখে নিজেরা গেলেন লভ-মেকিং করতে। আমি তখনই বুঝেছি....

শিবনাথবাবু হেসে উঠে বললেন, কার কথা বলছেন ?

রমণীবাবুর কুৎকুতে চোখ জোড়া এদিক ওদিক তাকিয়ে নেয় একবার। তারপর মুখটা কাছে এনে ফিসফিস করে বলেন, ঐ সেন-দম্পতির কথা বলছি মশাই। বেরুবার সময় দেখি কি বাপ-মার সঙ্গে বেড়াতে গেল না মেয়েটি, 'মাথা ধরেছে'....

'মাথা ধরেছে' কথাটা ব্যঙ্গের স্বরে বিকৃত করে উচ্চারণ করলেন।

হো হো করে হেসে উঠলেন শিবনাথবাবু।—তা কি হয়েছে কি তাতে?

—কি হয়েছে? তার চেয়ে বলুন না, কি হয় নি। আরে মশাই, মেয়েটি বেরুলো না দেখেই তো কেমন সন্দেহ হলো। বাইরে এসে রাস্তা থেকে উঁকি দিয়ে দেখি কি সুপ্রিয়বাবুও বেরোন নি, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পমেটম করছেন।

দিল্-খোলা মানুষ শিবনাথ, হাসেন প্রাণ খুলে। এ-কথায় তাই সশব্দে হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি। আর তা শুনতে পেয়ে বারান্দা থেকে শিবনাথবাবুর মেকানিক ওরফে মিস্ত্রী কৌতূহলী হয়ে ঘরে এসে ঢুকলো।

তাকে দেখেই রমণীবাবু হঠাৎ চুপ করে গেলেন। কুঁকড়ে গেলেন যেন। বললেন, না, তাই বলছিলাম।

রমণীবাবু আমতা আমতা করছেন দেখে শিবনাথবাবু হেসে ফেললেন আবার।—এ আমার মেকানিক, নিজের লোক, বলুন না কি বলছিলেন।

—বলবো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন।

রমণীবাবু আবার শুরু করলেন।—আমি তো মশাই সন্দেহ করেছিলাম প্রথম থেকেই। চুরি গেল সুপ্রিয়বাবুর অত সব জিনিসপত্র, টাকা, সে-সব ভুলে দুপুরে কেমন জমিয়েছিল ছুটিতে

দেখেন নি তো। তা আমিও বাবা কম যাই না, ছেলেটিকে বিন্দু-সরোবরের বেঞ্চিতে বসিয়ে রেখে চলে এলাম আবার, এসে রান্নাঘরের পাশের ঐ বাগানটায় ঘোরাঘুরি করতে শুরু করলাম। সে কি ফুল তোলা নিয়ে হুড়োহুড়ি ছুটিতে, সুপ্রিয়বাবু মেয়েটির খোঁপায় ফুল গুঁজে দিতে গেল, আর উনি লজ্জায় মুখ বেঁকিয়ে সরে গেলেন। তা আপনি কি বলেন, বাপটাকে বলে দেবো? আমাদেরও তো একটা ডিউটি আছে। নেবারলি ডিউটি···

শিবনাথবাবু হেসে বললেন, ছি ছি, তা কেন বলতে যাবেন! আরে মশাই, এই আমাকে দেখে ভাবছেন, একজন সেল্‌স্‌ম্যান—রোজলার কোম্পানীর—নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই, দি বিগেষ্ট কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া—আর রোজলারের পাখা মানে ইউ মে রেকমেণ্ড রোজলার টু ইওর ফাদার—সেই কোম্পানীর সেল্‌স্‌ম্যান আমি। সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছি, বুঝলেন?

—তাই নাকি? রমণীবাবু আগ্রহ প্রকাশ করেন।—বৃন্দাবন গিয়েছেন? দ্বারকা?

—সব, সব। শিবনাথবাবু অস্বস্তি বোধ করলেন না এতটুকু। যদিও অন্য সময় হলে বলতেন, ওসব তিথ্যটিথ্য নিয়ে কারবার নয় মশাই আমাদের।

রমণীবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। দুঃখের সুরে বললেন, আমার ভাগ্যে আর ও দুটো হলো না, এত ইচ্ছে ঘুরে আসার।

শিবনাথবাবু বললেন, তা যে পয়েণ্টে বলছিলাম। মশাই, সারা ভারতবর্ষ ঘুরে দেখলাম, কি জানেন? শুধু আমি নই, সবাই সেল্‌স্‌ম্যান। সব, সব। ঐ সুপ্রিয়বাবুও সেল্‌স্‌ম্যান, আর মিষ্টার সেনের মেয়ে ঐ রুমা দেবী—উনিও সেল্‌স্···মানে সেল্‌স্‌ওম্যান।

দুটো হাতের বিচিত্র ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ করলেন

শিবনাথবাবু। বললেন, তারা যদি নিজে নিজে কেনাবেচা করে, আমাদের কি ?

মেকানিক এতক্ষণ চুপচাপ লুঙি পরে শুয়েছিল তক্তপোশের ওপর। এবার কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তুললো।—সব সেল্‌স্‌ম্যান নয় স্যার। কিছু কিছু মেকানিকও আছে। একটু ভাঙাচোরা হলে, কল বিগড়ে গেলে রিপেয়ার করে দেয়।

হো হো করে অট্টহাসে ফেটে পড়লেন শিবনাথবাবু।—ঠিক বলেছো মিস্ত্রী····ইয়ে মেকানিক·······

দু'জনে যখন একলা থাকেন তখনই 'মিস্ত্রী' বলেন শিবনাথবাবু, রমণীবাবু যে সামনে বসে আছেন সেটা খেয়াল ছিল না তাঁর।

সামলে নিয়ে বললেন, ঠিক বলেছো, দরকার হয় রিপেয়ার করে দেবো, তা না আপনি রমণীবাবু, চাইছেন কল বিগড়ে দিতে। কি করতেন আগে ? স্কুল মাষ্টারী ?

রমণীবাবুর মুখে হাসি দেখা দিলো।—কি করে বুঝলেন ?

—তা আর বুঝবো না। মনুষ্যচরিত্র না বুঝতে শিখলে কি রোজলার কোম্পানীর সিনিয়র রিপ্রেজেন্টেটিভ হতে পারতাম ? রোজলার—নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই, দি বিগেস্ট ফ্যান ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি। গান্ধী আর রোজলার—ছটো নাম জানে সারা ভারতবর্ষের লোক।

রমণীবাবু বললেন, বুঝেছি, এই চওড়া কপাল দেখে অনেকেই বলে··· ··

—ফুৎ। একটা অদ্ভুত শব্দ করলেন শিবনাথবাবু। বললেন, ওসব ঠিকুজী-কুষ্ঠী, হাত দেখা, বগল দেখার বিদ্যেতে আমার বিশ্বাস নেই। স্রেফ এই গার্জেনি করার স্বভাব দেখলেই বুঝি।

রমণীবাবুর গায়ে লাগলো কথাটা। একটু অপমানিত বোধ

করলেন, রাগলেন তার চেয়ে বেশী। তাই উঠে পড়ে বললেন, যাই খাবার দিয়ে গেছে হয়তো।

উঠতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন। নাকটা কুঁচকে কিসের যেন ঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করলেন দু'বার। তারপর বললেন, মদ্যপানের গন্ধ পাচ্ছি যেন।

শিবনাথবাবু হেসে বললেন, হ্যাঁ, আমার মেকানিক একটু আধটু পান করেন।

—মদ্য ? ওয়াইন ?

মেকানিক একটা চোখ কুঁচকে বললে, নেশা কার নেই স্যার ? আমরা কাজও করি, নেশাও করি। আপনাদের তো স্যার স্রেফ নেশাটুকুই আছে।

কথাটা বোধহয় বুঝলেন না শিবনাথবাবু। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে সটান চলে এলেন তিনি ন'নম্বর ঘরে—সুপ্রিয়বাবুর কাছে।

সুপ্রিয় ডিটেকটিভ বইটা নামিয়ে রেখে উঠে বসলো।

রমণীবাবু একটা চোখ টিপে হেসে বললেন, গেঁথে তুলুন, গেঁথে তুলুন।

সুপ্রিয় কি যেন বলতে যাচ্ছিল, ঠাকুরটা এসে দাঁড়ালো দরজার পাশে।—ভাত দিবো বাবু ? রাতো নয়টা বাজি গলা।

সুপ্রিয় ধমক দিয়ে উঠলো।—শুধু খেতেই এসেছি নাকি এখানে ? কাজ সারতে পারলেই হলো। আর ঘড়িটা চুরি গেল কিনা, ব্যাটা বলে কিনা ন'টা বাজলো।

—বটা কউছি কাঁই ? রাগ দেখিয়ে ফিরে দাঁড়ালো ঠাকুর।

ভোরবেলায় হিমাদ্রিবাবুর চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল রমণীবাবুর। চোখেমুখে জল দিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন। দেখলেন,

রান্নাঘরের পিছনে, যেখানে বেগুনের চারা, লাউ, কুমড়ো লাগিয়েছেন হিমাদ্রিবাবু, প্রতিদিন খুরপি হাতে নিজেই যেগুলোর তদারক করেন, সেইখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছেন হিমাদ্রিবাবু, আর চৈতন্য, সুলোচন, কৌতুকী সবাই মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

সুপ্রিয়ও চিৎকার শুনে বেরিয়ে এলো। জিগ্যেস করলে, কি হলো কি হিমাদ্রিবাবু ?

হিমাদ্রিবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, আমার সব্বনাশ করে দিয়ে গেছে মশাই, সব্বনাশ করে দিয়ে গেছে।

—কেন, কি হয়েছে ?

—কি হয়েছে! ম্যাডান নার্সারী থেকে ইয়া পাঁচ-সেরী বেগুনের বীজ আনিয়ে লাগিয়েছিলাম মশাই, কি সুন্দর হলহলে চারা হয়েছিল, সব মাড়িয়ে দিয়ে গেছে ঠাকুর-চাকরগুলো।

ঠাকুর-চাকরের দল সঙ্গে সঙ্গে হাউমাউ করে উঠলো।—না বাবু, মুই না করুছি।

সুপ্রিয়ও নেমে এলো। এসে পায়ের ছাপগুলো দেখে বললে, উঁহু, ওরা নয়।

—আপনি বললেই হবে ? ওরা ছাড়া আর কার দায় পড়েছে আমার পাকা ধানে মই দিতে আসবে ?

সুপ্রিয় তখনও পায়ের ছাপগুলো ভালো করে দেখছে। দেখতে দেখতে বললে, দেখছেন না, জুতো পরে মাড়িয়েছে। জুতোর ছাপ। বোর্ডারদের সবারই এক পাটি করে জুতো নিয়ে আসুন, কে বলে দিচ্ছি। ডিটেকটিভ বই মশাই আমার একটাও বাকী নেই।

—বোর্ডার ? হতাশ দেখালো হিমাদ্রিবাবুকে। বললেন, যাক্, যা হয়েছে, কেউ তো আর ইচ্ছে করে করেনি। বলে হাতের মাটি ধুয়ে ঘরে চলে গেলেন।

বোর্ডার লক্ষ্মী। বোর্ডারদের কি চটাতে পারেন।

রমণীবাবু প্রথম থেকেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। নেমে আসতেও চেয়েছিলেন, কিন্তু নিজের জুতো জোড়াটার দিকে তাকিয়ে সাহস পেলেন না। কেউ কোথাও দেখছে কি না এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঘটির জল ঢেলে ঢেলে ধুয়ে নিলেন জুতোর তলাটা। কাদা লেগে আছে এখনো।

না ধুলেও চলতো। কারণ, হিমাদ্রিবাবুর অভিধানে বোর্ডার কোন অন্যায় করতে পারে না।

হিমাদ্রিবাবু ততক্ষণে মুড়ি-গুড়ের জলযোগ সেরে ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরে ছাপানো হ্যাণ্ডবিল আর বাঁধানো খাতাখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন সাইকেলের ঘন্টি বাজাতে বাজাতে। গৌরী দেবী আর সুশান্ত রেজ চলে যাবার পর থেকে এগারো নম্বরটা খালি পড়ে আছে। তার ওপর চোরটা পালিয়েছে, সেখানেও একটা সীট। নতুন অতিথি না এলেই নয়। যেমন করে হোক্ ধরতে হবে আজ। রীগ্যাল হোটেলের মালিক রিক্সাওয়ালাগুলোকে বখশিসের লোভ দেখিয়ে সেবার এমন হাত করেছিল যে, ট্রেন থেকে লোক নামতে না নামতে গিয়ে ধরতো তারা, বলতো, এখানে নাকি একটাই ভালো হোটেল আছে—রীগ্যাল হোটেল। ভুলেও তারা 'পান্থপাদপ হোটেল অ্যাণ্ড স্যানাটোরিয়ামে'র নাম করতো না।

মনে মনে ভাবেন হিমাদ্রিবাবু। তেমনি বকশিসের ব্যবস্থা করলে মন্দ হয় না।

স্টেশনে পৌঁছে সাইকেলটায় তালা ঝুলিয়ে তারের বেড়ায় ঠেসিয়ে রেখে প্লাটফর্মে ঢুকলেন হিমাদ্রিবাবু।

কোলকাতার গাড়ি আসতে এখনো দেরী আছে কয়েক মিনিট।

তবু স্টেশন-মাষ্টারের ঘরে ঢুকলেন একবার, ট্রেন ল্যেট আছে কিনা জেনে নেওয়াই ভাল। বেশীক্ষণ ল্যেট থাকে তো এই সময়ে বাজারটা সেরে রাখতে পারবেন।

স্টেশন ঘরে ঢুকতেই মাষ্টারবাবু বলে উঠলেন, এই যে হিমাদ্রিবাবু, আসুন আসুন। আপনি যে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠলেন, দেখাই পাই না আজকাল।

হিমাদ্রিবাবু হাসলেন।—স্টেশনে তো দুবেলাই আসছি মাষ্টারমশাই। আপনার দরজায় কপাল ঠুকে যাচ্ছি না এমন দিন তো দেখি না।

ছোটবাবু অর্থাৎ এ. এস. এম. মল্লিকের ছোকরা বয়েস, সব সময়েই একটু ইয়ার্কির ঢঙে কথা বলে।

সে বললে, কপাল ঠুকতেই আসেন, পদধূলি তো দেন না। এ ঘরে ঢোকেন না কেন, মুর্গীর মাংস খেতে চাইবো বলে?

মাষ্টারবাবু হেসে ওঠেন হো হো করে।—তা মল্লিক ঠিকই বলেছে। মুর্গীর মাংস কিন্তু অনেক দিন খাওয়ান নি।

এই ভয়েই স্টেশন-ঘরে ঢোকেন না হিমাদ্রিবাবু। সে দিনকাল কি আর আছে? একটা মুর্গীর দাম এখন আড়াই টাকা। এত বড় একটা হোটেল থেকে সংসার চালাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন, কথায় কথায় আগেকার মত মাংস খাওয়ানোর বাতিক ঢুকলে তো ফতুর হয়ে যাবেন। এঁদের কি। এঁরা ভাবেন, লাখ লাখ টাকা লাভ করছেন হিমাদ্রিবাবু।

তা হলে তো স্যানিটারী বাথরুমের ব্যবস্থাও করে ফেলতে পারতেন।

তবু মুখে হাসি টেনে হিমাদ্রিবাবুকে বলতে হলো, খাওয়াবো, খাওয়াবো। ভালো মুর্গীটুর্গী পাচ্ছি না কিনা আজকাল।

স্টেশনের লোকজনদের একটু হাতে রেখেই চলতে হয় তাঁকে।

কে জানে কখন কি কাজে লাগে। তা ছাড়া, তরী-তরকারী, মাছটাছ এখানকার বাজারে না মিললে প্রায়ই তো কটক থেকে আনাতে হয়। তখন মালের ওজন বেড়ে গেলেও কিছু বলেন না মাষ্টারবাবু, এমন কি ডবলু টিতে যাতায়াত করতেও দেন কখনো কখনো।

হিমাদ্রিবাবু তাই একটু তোষামুদি হাসি হেসেই জবাব দিলেন, খাওয়াবো, খাওয়াবো। কিন্তু ট্রেন ল্যেট আছে নাকি আজ?

—না, রাইট টাইম। টেলিগ্রাফের যন্ত্রে টরে টক্কা টরে টক্কা করতে করতে এ, এস. এম মল্লিক উত্তর দিলে।—ঐ এলো বলে··· এই বদ্রিনাথ···

চিৎকার করে খালাসীকে ডাক দিলে মল্লিক।—ঘন্টি বাজিয়ে দিয়ে আয়।

আরো দু'চারটে গল্পগুজব হলো মাষ্টারবাবুর সঙ্গে। হোটেল কেমন চলছে, স্টেশনের কাজ কত বেড়ে গেছে, 'এই নোংরা শহরটা বালীগঞ্জ হয়ে উঠলো', 'ক্যাপিটেলের মেয়েগুলোর কি চেহারা, যেমন রূপ, তেমনি ফ্যাশান, এ-সব আমাদের যৌবনকালে কোথায় ছিল মশাই', এমনি সব রঙ আর রসের কথা।

দেখতে দেখতে ইঞ্জিনের হুইস্‌ল্‌ শোনা গেল, হিমাদ্রিবাবু বেরিয়ে এলেন, পিছনে পিছনে মাষ্টারবাবু, কালো কোটে পিতলের বোতাম আঁটতে আঁটতে।

মুহূর্তের মধ্যে জমজমাট হয়ে উঠলো সারা প্লাটফর্ম। দেহাতী লোকের ভিড়, পচা মাছের ঝুড়ি, গুড়ের বোড়া, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য মানুষ। কেউ নামবার জন্যে ব্যস্ত, কেউ কামরায় উঠে একটু জায়গা পাবার জন্যে।

হিমাদ্রিবাবু তারই ফাঁকে ছুটে বেড়ান। নতুন আগন্তুকদের মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে যান। ক্যাপিটেলের লোকরা

সবাই মুখচেনা, সুতরাং তাদের ধারে কাছেও যান না। ভুল হয় ক্যাপিটালের চাকুরে বাবুদের আত্মীয়স্বজনদের বেলায়। তাদের চেঞ্জার ভেবে এগিয়ে যান, হাতের হ্যাণ্ডবিল এগিয়ে দিতে দিতে মুখস্থ কবিতার মত বলে যান, 'একটাই ভালো হোটেল স্যার এখানে, দি পান্থপাদপ হোটেল অ্যাণ্ড স্যানাটোরিয়াম। দেখুন না, কে কি বলেছেন, হাইকোর্টের জজ .....'

কথার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধানো খাতার পাতা খুলে সার্টিফিকেট-গুলো মেলে ধরেন।

যাঁরা ক্যাপিটালে আত্মীয়ের বাড়ীতে উঠবেন, তাঁরা প্রথম দফাতেই হাত দিয়ে খাতাটা সরিয়ে দিয়ে বলেন, না, হোটেলে উঠবো না।

হিমাদ্রিবাবু আবার নতুন খদ্দের খোঁজেন।

সেদিনও এমনি দু'চারবার ভুল করে তারপর এগিয়ে গেলেন থার্ড ক্লাশ থেকে যে ভদ্রলোক নামলেন তার দিকে। মুখটা কেমন যেন চেনা চেনা লাগলো। আগে এসেছিলেন হয়তো তাঁর হোটেলে। দিব্যি লম্বা চওড়া চেহারা, গেরুয়া রঙের আজানুলম্বিত পাঞ্জাবী, খদ্দরের ধুতি, কাঁধে একটা ঝোলা।

থার্ড ক্লাশের দিকে সাধারণতঃ যান না হিমাদ্রিবাবু, কারণ তাঁর ভাষায় ওরা সব 'রয়াল হোটেল' অর্থাৎ ধর্মশালার খদ্দের।

কুলি-দুটো জিনিসপত্র নামালো। তিনটি বড় বড় ট্রাঙ্ক। একটা বেডিং, একটা স্যুটকেশ।

ট্রাঙ্ক নামাতে গিয়ে কুলি দুটো বললে, বহুৎ ভারী হ্যায় বাবুজী! ক্যেয়া হ্যায় ইসমে, বর্তন?

হাসলেন ভদ্রলোক। উত্তর দিলেন না।

হিমাদ্রিবাবু এইবার এগিয়ে গেলেন।—হোটেলে উঠবেন তো?

—রীগ্যাল হোটেলের লোক আপনি?

হিমাদ্রিবাবু চুপসে গেলেন এক মুহূর্তে। তবে কি রীগ্যাল হোটেল আবার চালু হলো নাকি ?

মিছে কথা তো বলতে পারেন না, হিমাদ্রিবাবু বললেন, আজ্ঞে না, আমাদের দি পান্থপাদপ হোটেল অ্যাণ্ড·· ···

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তবে চলুন। রীগ্যালে মশাই আর যাচ্ছি না, এর আগের বার এসে সে-যে কি হাল হয়েছিল···

হিমাদ্রিবাবু হেসে বললেন, সে হোটেল কবে উঠে গেছে। এখন পান্থপাদপ বাদ দিলে আছে রয়াল হোটেল—ধর্মশালা।

মালপত্র নিয়ে যাবার ব্যবস্থা, রিক্সা ঠিক করা, সব কিছুর হিমাদ্রিবাবুই ভার নিলেন। ভার নেন।

তিনটে কুলির মাথায় জিনিসপত্র চাপিয়ে প্লাটফর্মের বাইরে আসতে আসতে হিমাদ্রিবাবু খাতাটা এগিয়ে দিলেন।—আমাদের হোটেল স্যার ভালই, দেখুন না, গোবরডাঙার ম্যালেরিয়া ইন্‌স্‌পেক্টর কি লিখেছেন, আর এই দেখুন হাইকোর্টের জজ ·····

ভদ্রলোককে একটা রিক্সায় চড়ালেন হিমাদ্রিবাবু, আরেকটায় মালপত্র। তারপর সাইকেলের তালা খুলে ভদ্রলোকের পিছনে পিছনে হোটেলের পথ ধরলেন।

মাঝপথে একবার শুধু কয়লার দোকানটা ঘুরে গেলেন তিনি। কিন্তু গিয়ে পৌঁছলেন যখন হোটেলে, রিক্সা দুটোও তখনই এসে দাঁড়িয়েছে।

হাঁকডাক শুরু করলেন হিমাদ্রিবাবু।—কৌতুকী, ও কৌতুকী।

নারীকণ্ঠের উত্তর এলো।—যাউছি বাবু।

তারপরই কৌতুকী এসে দাঁড়ালো। সেই কালো কুৎসিত বিশ্রী চেহারার মানুষটা। হলদে দাঁতের সারি বের করে হাসলো সে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে, তারপর অবলীলায় একটা ট্রাঙ্ক তুলে নিলো কাঁধের ওপর।

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। কি আশ্চর্য! স্টেশনের কুলিগুলো যা তুলতে হিমসিম খেয়ে গেল, এই অবলা জীবটি তা এমন অবহেলায় তুলে ফেললো?

হিমাদ্রিবাবুর পিছনে পিছনেই ন' নম্বর ঘরে এসে ঢুকলেন ভদ্রলোক। সুপ্রিয় শুয়ে শুয়ে ডিটেকটিভ বই পড়ছিল, ভদ্র-লোককে দেখে একটু বিরক্ত হয়েই উঠে বসলো। ভাবলে, বেশ ছিলাম একা একা। আবার এক চোর-ছ্যাঁচোড় ঢুকিয়ে দিয়ে গেল বুঝি।

এমনিতেই ভদ্রলোককে একটু সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিল সুপ্রিয়, কৌতুকী পর পর তিনটি ভারী ভারী ট্রাঙ্ক এনে ঘর বোঝাই করতেই সুপ্রিয়র গোয়েন্দা-মনটা উৎসুক হয়ে উঠলো, ট্রাঙ্কে কি আছে জানবার জন্যে। এসেছিস তো বাপু একটা লোক। এত জিনিসপত্র কিসের জন্যে।

হিমাদ্রিবাবু ততক্ষণে তাঁর পুলিস-খাতা নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন।

নতুন কোন আগন্তুক এলেই এই-খাতায় তার নাম ধাম, উদ্দেশ্য, বাড়ীর ঠিকানা, পরিচয় সব লিখে দেওয়ার নিয়ম। আর এই খাতাটা নিয়মিত থানা-আপিসে দেখিয়ে আনার কথা।

হিমাদ্রিবাবু খাতাটা এগিয়ে দিলেন ভদ্রলোকের দিকে। আগে এ-কাজটা চা-জলখাবার দেওয়ার পরই সারতেন, কিন্তু সদ্য সদ্য একটা চুরি হয়ে গেছে বলেই খাতাটা আনতে দেরী করেন নি।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর চাকরদের হাঁকডাক করে চা-খাবার দিতে বলেছেন ন' নম্বরে, কৌতুকীকে বলেছেন জল দিতে।

কৌতুকীকে বলার প্রয়োজন ছিল না, কারণ, ততক্ষণে সে কুঁজোয় করে এক কুঁজো জল রেখে দিয়ে গেছে।

ভদ্রলোক নাম ঠিকানা লিখতে শুরু করলেন, আর হিমাদ্রিবাবু

ঝুঁকে পড়লেন ভদ্রলোকের পরিচয়টা জানবার জন্যে। তাঁর কাছে সব খদ্দেরই সমান, সকলেই সমান টাকা দেয়। তবু বিখ্যাত লোক কিংবা বড় চাকুরে-টাকুরে হলে খুশী হন তিনি বেশী। গর্বিত বোধ করেন।

খাতাটা সই করিয়ে নিয়েই দু'চারটে কথা বলে বেরিয়ে এলেন হিমাদ্রিবাবু। গিয়ে ঢুকলেন একেবারে বারো নম্বরে।

—ও শিবনাথবাবু, হোটেলে আজ কে এসেছেন জানেন? প্রফেসর কমলকুমার ঘোষ, ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, ন' নম্বরে উঠেছেন। বললেন, আগে যে রীগ্যাল হোটেলটা ছিল, একেবারে যাচ্ছেতাই।

শিবনাথবাবু একটু আগ্রহ দেখালেন। মনে মনে ভাবলেন, আলাপ করতে হয়। প্রফেসর মানুষ। কলেজ-টলেজে পাখা তো কম লাগে না, যদি ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

হিমাদ্রিবাবু বারো নম্বর থেকে দশ, দশ থেকে আট এবং তার-পর ছ' নম্বরে এসে মিস্টার সেনকে খবরটা দিলেন।

রুমাও এগিয়ে এলো খবর শুনে। তার প্রথম আগ্রহটা ছিল বিরক্তি মেশানো। সুপ্রিয়র ঘরে আবার অন্য লোক ঢুকলো শুনে। পরে যখন শুনলো প্রফেসর কমলকুমার ঘোষ, তখন এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো, প্রফেসর ঘোষ মানে, ঐ আর্কেলজির প্রফেসর? মন্দির-টন্দিরের ওপর যাঁর সব অথরিটেটিভ বই আছে? তিনি?

মিষ্টার সেনও আগ্রহ দেখালেন।—প্রফেসর ঘোষ, কমলকুমার ঘোষ?

এত সব পরিচয় অবশ্য হিমাদ্রিবাবু জানতেন না। তবু ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ।

বলেই বেরিয়ে এসেই আবার হাঁকডাক শুরু করলেন, লক্ষ্মীবৌ,

কৌতুকী, এমন কি ঠাকুর-চাকরদের উদ্দেশ্যেও। প্রফেসর শুনেই হিমাদ্রিবাবু গর্ববোধ করেছিলেন, অন্যান্য বোর্ডারদের সে-খবর জানিয়ে নিজের হোটেল সম্পর্কে তাঁদের ধারণাটা যাতে একটু ভালো হয় তার চেষ্টা করেছিলেন, জানতেন না নবাগত ভদ্রলোক শুধু প্রফেসরই নন, বিখ্যাত ব্যক্তি, সুপণ্ডিত। মিস্টার সেন আর তাঁর মেয়ে রুমার কাছ থেকে এ-খবর জানতে পেরেই যেন হিমাদ্রি-বাবু বুঝতে পারলেন ভদ্রলোককে আরো বেশী করে সমাদর দেখানো উচিত।

হাঁকডাক করে ঝি-চাকরগুলোকে এনে জড়ো করলেন তিনি ন' নম্বরে। কাউকে বললেন তক্তপোশটা পরিষ্কার করে দিতে, কাউকে বললেন বিছানা পেতে দিতে, আর ঠাকুরকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজেই জিগ্যেস করলেন, আপনার জন্যে কি কি রান্না হবে স্যার? যেমন ঝাল গরম মশলা দিয়ে হয়, না সেদ্ধ শুধু? মাংস খাবেন, না মাছ?

সুপ্রিয় আড়চোখে একবার হিমাদ্রিবাবুকে, একবার প্রফেসর ঘোষকে দেখে নিলো। অর্থাৎ, কি ব্যাপার, এত খাতির কেন? ব্যাপারটা ঠিক ঠাওর করতে না পেরে একটা সিগারেট ধরালো সুপ্রিয়। কি যেন ভাবলো এক মুহূর্ত। নাঃ, এমনিই হয়তো, প্রথম দিনে এমন তো হামেশাই করেন হিমাদ্রিবাবু।

সুপ্রিয় যে ভদ্রলোককে যথেষ্ট সম্মান দেখাচ্ছে না, তা লক্ষ্য করেছিলেন হিমাদ্রিবাবু। তাই বললেন, এঁর সঙ্গে আলাপ-টালাপ হয়েছে তো সুপ্রিয়বাবু?

সুপ্রিয় তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, এক ঘরে থাকতে হবে যখন, আলাপ নিশ্চয়ই হবে।

—হবে কি মশাই, এখনো আলাপ করেন নি? ইনি কে জানেন? এ হোটেলের সৌভাগ্য যে এমন লোকের পায়ের ধুলো

পড়লো এখানে। প্রফেসর কমলকুমার ঘোষের নাম শোনেন নি? কত সব দামী দামী বই লিখেছেন।

সুপ্রিয় উঠে বসলো।—আপনি লেখক?

ভদ্রলোক হাসলেন।—না, অধ্যাপক।

সুপ্রিয় হেসে বললে, আহা তা তো বুঝলাম, কিন্তু গল্প-উপন্যাসও লেখেন আপনি?

প্রফেসর ঘোষ হাসলেন। বললেন, না, দু'চারখানা বই অবশ্য লিখেছি এই সব পাথর-টাথর নিয়ে, তা সে পাথরের মতই কঠিন।

—পাথর নিয়ে? তাই বলুন, তখন থেকে ভাবছি, ট্রাঙ্কগুলো এত ভারী কেন। সব পাথর বোঝাই করা আছে বুঝি?

প্রফেসর ঘোষ সকৌতুকে হেসে বললেন, না, ওতে সব বই আছে।

—বই? এত বই? ডিটেকটিভ বই আছে আপনার কাছে?

প্রফেসর ঘোষ এ-প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না।

অধ্যাপক শুনে রমণীবাবু বিশেষ আমল দেননি। সারা জীবন ইস্কুল মাস্টারী করে অমন অনেক অধ্যাপক তিনি বানিয়েছেন। সংস্কৃতের মাস্টার ছিলেন তিনি। ছাত্ররা ডিগ্রী নিয়ে যখন কোন কলেজে চাকরী পেয়ে রমণীবাবুকে প্রণাম করতে আসতো খবরটা জানাবার জন্যে, তখন হাসতেন রমণীবাবু। বলতেন, অর্ধপক্ক থাকলে তো চলবে না হে, এইবার পড়াশুনো করে পূর্ণপক্ক হবার চেষ্টা করো।

হিমাদ্রিবাবুকেও সেই কথাই বললেন।—অর্ধপক্ক উনি?

কিন্তু মুখে যতই তাচ্ছিল্য দেখান না কেন, মনে মনে ঈর্ষা জাগলো, যখন দেখলেন, রুমা গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রফেসর ঘোষের সামনে।

প্রফেসর ঘোষ তখন ছোট আয়নাটা দেয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে দাড়িতে সাবান লাগাচ্ছেন। রুমা এসে দাঁড়ালো কপাট ধরে, চৌকাঠের ওপর।

দুটি হাত বুকের ওপর জড়ো করে মিষ্টি করে বললে, নমস্কার।

প্রথমটা চমকে উঠেছিলেন প্রফেসর ঘোষ। এমন একটি সুন্দরী সুবেশা তরুণী হঠাৎ কোত্থেকে এসে হাজির হলো, আর হঠাৎ সে তাঁকে নমস্কারই বা করছে কেন, বুঝতে পারলেন না। তাঁর পরিচয়টা যে হিমাদ্রিবাবু রাষ্ট্র করে দিয়েছেন, আর তাঁর পরিচয়টা যে এ পাণ্ডববর্জিত দেশে কারো শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে, তা তিনি কল্পনাও করেন নি।

ততক্ষণে রুমা মৃদু হেসে এগিয়ে এসেছে।

অপরূপ শ্রদ্ধাপ্লুত এক ভঙ্গিতে প্রফেসর ঘোষের দিকে তাকিয়ে রুমা বললে, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

—বেশ, বেশ, বসো এইখানে। বলে তক্তপোশটা দেখিয়ে দিলেন তিনি। তারপর দাড়ি কামাতে কামাতেই বললেন, আলাপ পরে হবে, পরিচয়টা আগে হোক।

রুমা হাসলো, সপ্রতিভ হলো। বললে, বাঃ রে, 'আলাপ-পরিচয়' বলে। আগে আলাপ, তবে তো পরিচয়।

প্রফেসর ঘোষ হেসে বললেন, আলাপ তো হয়েই গেল, বলো এবার···এখানেই থাকো তো তোমরা?

—না, না। দুটো হাত নেড়ে উঠলো রুমা। বললে, আমরা চেঞ্জে এসেছি। আপনার নাম শুনে আলাপ করতে এলাম। আমার কিন্তু ধারণা ছিল আপনি বুড়োসুড়ো মানুষ।

—তাই নাকি ?

রুমা হাসলো।—কি ভাগ্য দেখুন, এতকাল শুধু নামই শুনেছি, বেড়াতে এসে আলাপ হয়ে গেল। কোণারক, শিশুপালগড়—সব যাবো যাবো ভাবছিলাম, বাবা বললেন, ভালই হয়েছে, প্রফেসর ঘোষকে বলিস আমাদের সঙ্গে যেতে হবে, সব বুঝিয়ে দেবেন। আপনার বই পড়ে বোঝবার মত বিদ্যে তো নেই আমার।

যাক্, এতক্ষণে স্বস্তি পেলেন প্রফেসর ঘোষ। মেয়েটি তা হলে তাঁকে গল্প উপন্যাসের লেখক ভাবে নি, প্রকৃত পরিচয়টা জেনেছে।

রুমা হেসে বললে, আমি কিন্তু নাম শুনেই হিমাদ্রিবাবুকে বলেছি, ইনি নিশ্চয়ই আর্কেওলজির প্রফেসর কমলকুমার ঘোষ।

খুশীতে হাসলেন প্রফেসর ঘোষ।—কোন্ ক্লাশে পড় তুমি ?

—বি-এ দিয়েছি এবার।

—তাই নাকি ? বাঃ, দেখে তো মনে হয় ইস্কুলে পড়ো।

রুমা নাক কোঁচকালো।—ওমা, খুব ছোট দেখায় বুঝি আমাকে। বলেই খিলখিল করে হেসে উঠলো সে অপাঙ্গে সুপ্রিয়র দিকে তাকিয়ে। বললে, আমার কিন্তু অনেক বয়েস।

সুপ্রিয় রসিকতাটা উপভোগ করলো না। তার চোখে একটা চাপা ভর্ৎসনা দেখতে পেলো রুমা। বুঝতে পারলো, প্রফেসর ঘোষের সঙ্গে তার এত অন্তরঙ্গতা সে যেন বেশ পছন্দ করছে না। আর তা বুঝতে পেরেই আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো রুমা।

পরক্ষণেই বললে, আপনি চা-টা খেয়ে নিন, তারপর বাবাকে নিয়ে আসবো। আপনার সাবজেক্টে বাবারও খুব উৎসাহ।

বলেই পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এলো রুমা, একবার পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখলে সুপ্রিয়কে, তারপর ফিরে এলো ছ'নম্বরে।

রুমা ফিরে আসতেই শ্রীলেখা দেবী ধমক দিলেন।—কোথায় গিয়েছিলে ?

—কোথায় আবার, বা রে। আমি তো প্রফেসর ঘোষের সঙ্গে ··

শ্রীলেখা দেবী হেসে ফেললেন। এ মেয়েকে কি বলবেন তিনি। নতুন যে বোর্ডারটি এলো, তিনি যে প্রফেসর ঘোষ, তা শ্রীলেখা দেবীও শুনেছেন। কিন্তু যিনিই হোন, অপরিচিত এই লোকটির কাছে রুমা ছুটে গেছে, রেশমের কাছ থেকে এ-খবর শুনেই চটে গিয়েছিলেন। লোকটিকে ওঁর সুবিধের মনে হয় নি। একে বয়স তেমন বেশি নয়, তার ওপর চেহারাটাও বেশ ভালো।

ভেবেছিলেন, মা কলঘরে গেছে দেখেই বুঝি রুমা আলাপ করতে ছুটেছে। আলাপ করুক তাতে যে খুব একটা আপত্তি আছে তা নয়। তবে মেয়ের এই বয়সটাকে বিশ্বাস করেন না। তাই ভেবেছিলেন, রুমা নিশ্চয়ই বলবে, আমি তো বাঙাল-বউয়ের সঙ্গে গল্প করছিলাম, কিংবা এমনি কিছু।

তার বদলে রুমা কিনা পষ্টাপষ্টি বললে, বা রে, আমি তো প্রফেসর ঘোষের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলাম।

না, মেয়ে তাঁর এত সরল যে, এর মধ্যে কিছু আপত্তির থাকতে পারে ভাবতেই পারে না। তবু তাকেই কিনা চোখে চোখে রাখতে চান।

শ্রীলেখা দেবী তাই রুমার জবাব শুনে হেসে ফেললেন। বললেন, প্রফেসর তো বুঝলাম, কিন্তু এখানে চেঞ্জে এসেছি, বাপ আর মেয়েতে মিলে যেন শেষকালে ইস্কুল কলেজ খুলে বসো না।

হাল্কাভাবে বললেন বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশী মিশতে দেবেন না রুমাকে। মোট কথা, প্রফেসরই হোন আর যাই হোন উনি, শ্রীলেখা দেবীর ভালো লাগে নি ওঁকে। মিশতে দেবেন না কেন, ঐ তো সুপ্রিয় ছেলেটি রয়েছে, ওকে তো বেশ ভালই লেগেছে। কেমন একটু লাজুক লাজুক, মিষ্টি মুখখানা।

ভালো ছেলে। ওর সঙ্গে রুমা গল্প করুক, মেলামেশা করুক, ভয় নেই। ও তো একেবারে ছেলেমানুষ। কিন্তু এই প্রফেসর ঘোষ—

—চল রে রুমা, তোদের প্রফেসর ঘোষের সঙ্গে আলাপ করে আসি। লম্বা-হাত সোয়েটারটা মাথায় গলাতে গলাতে বললেন মিস্টার সেন। খবরের কাগজ পড়ছিলেন, এতসব আলোচনা কানেই যায় নি।

রুমা হাসলো।—চলো, তোমাকে ডাকতেই তো এলাম, ওঁকে বলে এসেছি।

বলে মায়ের দিকে ফিরে ঠোঁট উল্টে একটা ভঙ্গি করেই বেরিয়ে গেল সে। মিস্টার সেন দেখতে পেলেন, হাসলেন। আর শ্রীলেখা দেবী পিছন ফিরে ছিলেন, তাই দেখতে পেলেন না। দেখতে পেলে রুমার ওপর রাগতেন না, রাগতেন স্বামীর ওপর। বলতেন, তোমার আদরেই ছেলেমেয়েগুলো মানুষ হলো না।

আধখানা বোনা সোয়েটারটা রেশমের কাঁধের ওপর রেখে মাপ নিয়ে দেখছিলেন শ্রীলেখা দেবী, আশি ঘরে ঠিক হবে কিনা।

মিসেস ভট্চায এসে ঢুকলেন সেই মুহূর্তে।—দেখেন মিসেস স্যান, একটা কথা কইতে আসছি।

—আসুন। বলে চেয়ারটা এগিয়ে দিলেন শ্রীলেখা দেবী।

মিসেস ভট্চায বসলেন গ্যাঁট হয়ে। তারপর হেসে বললেন, আসব আসব ভাবছি তখন থেকে, তা কর্তা ছিলেন, কি জানি কি কথা হয়, তাই আসি নাই।

শ্রীলেখা দেবী হেসে তাকালেন রেশমের দিকে, বললেন, যা তো রেশম, দেখ ওঁরা কি করছেন।

অর্থাৎ রেশমকে সরিয়ে দিলেন। আগল নেই ভদ্রমহিলার মুখে, কি জানি কি রসিকতা করে বসেন আরো।

মিসেস ভট্চায বললেন, কথাটা হইল আপনাগো এই নতুন

বোর্ডাররে লইয়া। এ হোটেলে তো আর থাইকবার ইচ্ছা হয় না। মাছ মাংস যদি খাইবারে না দেয় কি চেঞ্জ হইব কন ?

শ্রীলেখা দেবী উত্তর দিলেন, কেন মাংস তো দেয় ?

—হঃ, আপনিও এই কথা কইছেন ? দুইটা হাড়ের টুকরা ফেইলা দিলেই মাংস খাওয়া হইব ? আর মাছ তো···

শ্রীলেখা দেবী হেসে বললেন, এখানে মাছ পাওয়া যায় না তো কি করবে বলুন।

মিসেস ভট্চাযের গলায় উষ্মা দেখা দিলো।—ত হোটেল খুইলবার কি কাম ছিল ?

শ্রীলেখা দেবী ফিক করে হেসে ফেলেই গম্ভীর হলেন। তাঁর হাসি দেখে না ভদ্রমহিলা আরো রেগে যান।

কোন জবাব না পেয়ে, মিসেস ভট্চায একটু উসখুস করলেন। তারপর নিজেই বললেন, জবাই কইরা টাকা নেন হিমাদ্রিবাবু। কিছু কই না। কিন্তু খাইতে দিব না, দুধকুণ্ডর জলের সাথে ঐ কূয়ার জল পাইল করব, আর নিজের হোটেলের প্রশংসা করব দিন রাত তা সহ্য হয় না।

শ্রীলেখা দেবী হেসে বললেন, নিজের হোটেলের প্রশংসা করবে না ? সে তো সকলেই করে।

—কথাটা ঠিকই কইছেন। উঠে দাঁড়ালেন মিসেস ভটচায। বললেন, হিমাদ্রিবাবুরে তো দোষ দিই না। কিন্তু ঐ কে এক প্রফেসর আসছেন আজ, উনি নাকি কইছেন, এই হোটেলটা রীগাল হোটেলের থিকা ভালো। এই কথা কইলে হিমাদ্রিবাবু তো বাইগন পুইড়্যা খাওয়াইবেন।

কি আর বলেন শ্রীলেখা দেবী। হোটেলের ঘরগুলো নোংরা, খাওয়া দাওয়া যে ভালো নয়, চার্জ বেশী—এসব তাঁরাও নিজেদের মধ্যে বলা-কওয়া করেছেন। ভাতের থালায় প্রতিদিন পেঁপে

—গায়ত্রী দেবী? চোখ কপালে তুললেন রমণীরঞ্জন দত্ত। —গায়ত্রী দেবীটা কে আবার?

বেলু খিল খিল করে হেসে উঠলো।—গায়ত্রী দেবীর নাম শোনেন নি? ফিল্ম-স্টার গায়ত্রী দেবী।

সকলেই যেন চমকে উঠলো। কারণ, কেউই আশা করেনি গায়ত্রী দেবী সেই বিখ্যাত অভিনেত্রী। গায়ত্রী দেবীর নাম আবার শোনে নি, সকলের মুখে মুখে তার নাম, দেয়ালে দেয়ালে ছবি, চোখে চোখে স্বপ্ন। সেই গায়ত্রী দেবী কিনা এই বিশ্রী হোটেলটায় আসছে?

শিবনাথবাবুর যেন বিশ্বাস হলো না। বললেন, সেই গায়ত্রী দেবী? জানো ঠিক।

—হ্যাঁ, বাবা তো এইমাত্র চিঠি পেলেন।

মিসেস ভটচাযের চোখ দুটোও চকচক করে উঠলো।

শুধু রমণীবাবু নাক সিঁটকে বললেন, এর পর আর এ-হোটেলে থাকা যাবে না। ছি ছি, শেষে ফিলিম-স্টার এনে ঢুকিয়ে দেবে!

মিসেস ভটচাযের ষড়যন্ত্রটা ক্রমশ বেশ ঘোঁট পাকিয়ে উঠলো। কারণ এ ষড়যন্ত্রে প্রায় সকলেই আপনা থেকেই নাম লেখাতে এগিয়ে এলো। সত্যিই তো, হিমাদ্রিবাবু গলা কাটা চার্জ নেবেন, অথচ হোটেলে এতটুকু সুবন্দোবস্ত রাখবেন না এ কেমন কথা।

সুপ্রিয় এমনিতেই চটে ছিল হিমাদ্রিবাবুর ওপর। গৌতম না কি নাম, ভগবান জানেন, সেই যে ছোকরাটি তাকে নিঃস্ব করে দিয়ে পালিয়েছে ঘড়ি-ক্যামেরা-টাকা নিয়ে, তারপর থেকে কথায় কথায় খোঁটা দিতো ও হিমাদ্রিবাবুকে। বলতো, আপনাকে মশাই

বিশ্বাস নেই, কোত্থেকে কোন চোর-ছ্যাঁচোড় এনে ঘরে ঢুকিয়ে দেন, চুরি গেলে তখন ভিজে বেড়ালটি সেজে থাকেন।

টেলিগ্রাফ মণি-অর্ডারে বাপের কাছ থেকে আবার কিছু টাকা এসে পৌঁছনোর পর মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছিল তার, কিন্তু তা বরফ হতে পেলো না মিসেস ভটচাযের উস্কানিতে।

ঠিক কথা। এত এত টাকা নেবেন হিমাদ্রিবাবু, অথচ হোটেলে না আছে স্যানিটরী ব্যবস্থা, না আছে ভালো খাওয়া-দাওয়া। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, খাঁটি জলটুকুও দেন না হিমাদ্রিবাবু। ঘিয়ে ভেজাল চলে, দুধে জল মেশায়, কিন্তু জলে পাইল দেবে কেন?

ব্যাপারটা গুরুতর। এখানে লোকে চেঞ্জে আসে এই জলের লোভেই। দুধকুণ্ডের জল খেলে পেটের রোগ সেরে যায় এ-কথা শুনেই সকলে আসে, ভিড় করে হিমাদ্রিবাবুর হোটেলে। আর হিমাদ্রিবাবু প্রতিদিন যে হ্যাণ্ডবিলগুলো নিয়ে স্টেশনে ছোটেন যাত্রী ধরবার জন্যে, সেই হ্যাণ্ডবিলে স্পষ্ট করে লেখা আছে দুধকুণ্ডের জল দু'বেলা সরবরাহ করার ব্যবস্থার কথা।

প্রথম প্রথম সকলেই বিশ্বাস করতো, কৌতুকী যে-জল কুঁজোয় ভরে এনে দেয় তা দুধকুণ্ডের বিশুদ্ধ জল মনে করে প্রাণভরে পান করতো সবাই। কিন্তু মিসেস ভটচায নাকি আবিষ্কার করেছেন, দুধকুণ্ড থেকে মাত্র এক কলসী জল আসে, তারপর কুয়োর জলের সঙ্গে তা মিশিয়ে সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়।

শিবনাথবাবুর ঘরে জোর মীটিং বসেছিল আবার। সুপ্রিয় তক্তপোশের উপর চটাং করে একটা চড় বসিয়ে বললে, ঠিক্ ধরেছেন মিসেস ভটচায, তাই বলি এতদিন রয়েছি, ইমপ্রুভমেণ্ট হয় না কেন!

দুদিন আগেই যে সুপ্রিয় স্টেশনে মাল ওজনের যন্ত্রে দু'পাউণ্ড ওজন বাড়ার প্রমাণ পেয়ে এসেছে এবং স্নান করতে গিয়ে সে যে

নিজেও অ্যালুমিনিয়মের পাত্রে কুণ্ডের জল নিয়ে এসেছে প্রতিদিন, সে-কথা যেন বেমালুম ভুলেই গেল।

বললে, না, শিবনাথবাবু, এমন অন্যায়ভাবে টাকা নিতে দেবো না ব্যাটাকে। কাল আমরা এগারোটার সময় দাঁড়িয়ে থাকবো, কৌতুকীকে ঐ এক কলসী জল নিয়ে আসতে দেখলেই হিমাদ্রিবাবুকে ডেকে এনে জবাবদিহি চাইবো।

রমণীবাবু বললেন, তার চেয়ে বললে হয় না যে চুপীস করে মাছ না খাওয়ালে....

হঠাৎ হো হো করে অট্টহাসে হেসে উঠলেন শিবনাথবাবু।

তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, ও-সব কিচ্ছু না, ও-সব কিচ্ছু না। ইমপ্রুভমেণ্ট যদি করতে হয়, গোড়া থেকে শুরু করতে হবে মশাই। হোটেল তো আমি কম দেখলাম না, হোল ইণ্ডিয়া টুর দিয়ে বেড়াই, হোটেল দেখতে আমার বাকী নেই। কিন্তু ইলেকট্রিসিটি আছে অথচ ঘরে ঘরে ফ্যান নেই, এ মশাই আর কোথাও দেখিনি।

রমণীবাবু সায় দিলেন, ঠিক কথা। তবে হ্যাঁ, এখন ওটা লার্জেস্ট প্রবলেম নয়। কারণ, এই শীতে তো ফ্যান চালাতাম না।

আবার সশব্দে হাসলেন শিবনাথবাবু।—কি বলছেন রমণীবাবু। এই জন্যেই দেখুন আমাদের গভর্ণমেন্টের সব প্ল্যান ভেস্তে যাচ্ছে। ইউ মাষ্ট বিগিন ফ্রম দি বিগিনিং। হোটেল তো শুধু চেঞ্জারদের জন্যে নয়, গরমের দিনেও তো—এই আমিই তো আসি গরমের দিনে। তাছাড়া, দরকার হোক্ না হোক্, এই টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরীতে ফ্যান থাকবে না হোটেলে, ভাবাই যায় না।

রমণীবাবু একটু বিরক্ত হ'য়েই বেরিয়ে এলেন 'কাজ আছে' বলে। একটু পরে সুপ্রিয় আর ব্রজমাধব ভট্টাচার্যও। এসে তিন-জনে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বারান্দায় টোপ ফেলা রোদটুকুতে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে বলাবলি করলো।—যে যার নিজের তালে

আছে। ওঁর বিগেষ্ট ফ্যান ম্যানুফ্যাকচারারের রোজলার পাখা ডজন কয়েক গছিয়ে দিতে পেলে বাঁচেন আর কি।

কিন্তু শিবনাথবাবু একটু স্বার্থ টেনে কথা বলেছেন বলেই তো বিপ্লবটাকে মিইয়ে যেতে দেয়া যায় না।

শীতুরে হাওয়া আর আমেজী রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরামর্শ চললো বেশ কিছুক্ষণ। তারপর কথাবার্তায় অসুবিধে হচ্ছে দেখে তিনজনেই বেরিয়ে এলেন হোটেল থেকে। হোটেলের সামনে গাঁদা আর সীজন ফ্লাওয়ারের ছোট্ট এক টুকরো বাগান। সেই বাগানে পায়চারী করতে করতে বেশ মন খুলে কথাবার্তা বলা যাবে।

রোদে-ভেজা বাগানটায় এসে সুপ্রিয় বুঝলো রমণীবাবু কেন এ প্রস্তাব করেছেন। আসলে ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে শিখিনীকে একটু আগে নেমে আসতে সুপ্রিয়ও দেখেছিল। কিন্তু সে যে এই বাগানে এসেছে রোদ পোয়াতে তা সুপ্রিয়র মনে হয় নি। না, রমণীবাবু নির্ঘাৎ হাত গুণতে পারে।

সুপ্রিয়র অবশ্য এতে কোন উৎসাহ নেই। শিখিনী না হয়ে রুমা যদি আসতো সে সুখী হতে পারতো। কিন্তু রুমা সেই যে কিছুক্ষণ আগে জানালাটা বন্ধ করে গেছে, খোলবার আর নাম নেই।

বারকয়েক দৃষ্টিটা বন্ধ জানালার ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে আশা ছেড়ে দিলো সুপ্রিয়।

শিখিনী ততক্ষণে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

কাছের গাছটা থেকে পটাপট গোটাকতক গাঁদা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে একটা তোড়া বানাতে শুরু করেছে সে তখন।

সুপ্রিয় মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল রুমার ওপর, কিন্তু রাগটা গিয়ে পড়লো হিমাদ্রিবাবুর ওপর। বললে, টেস্ট বটে একখানা আমাদের হোটেলওয়ালার। দুটো রজনীগন্ধা লাগিয়েছে, আর বাগান ভর্তি গাঁদা ফুল—যাচ্ছেতাই।

শিখিনী চমকে ফিরে তাকালো।—কাহে বাবুজী। এ তো আচ্ছা ফুল আছে, ছাগ ভি খাবে, শোভা ভি হবে।

ঠিক্। সুপ্রিয় বুঝলো ব্যাপারটা। হিমাদ্রিবাবুর ঘরের ওপাশে একপাল ছাগল আছে, হিমাদ্রিবাবু পুষেছেন। ছাগলকে খাওয়াবার জন্যেই বোধহয় গাঁদা লাগিয়েছেন এত।

কিন্তু লোকটাকে জব্দ করা যায় কি করে। একটা কিছু তো করা দরকার। চুপচাপ সব সহ্য করে যাওয়া যায় না। সুপ্রিয় তাই বললে, একটা দিন মশাই মুর্গীর মাংস খাওয়ালো না!

শিখিনী হেসে বললে, দো দিনের তো ঝামেলা বাবুজী, ছোড় দিজিয়ে।

ব্রজমাধববাবু মুখ খুললেন।—এই দুটো দিনই বা ভালভাবে থাকার ব্যবস্থা করবো না কেন মিস সিং?

রমণীবাবুও সায় দিলেন।—জীবনটাও তো দু'দিনের।

সুতরাং—

কি যেন বলতে যাচ্ছিল সুপ্রিয়, কিন্তু হঠাৎ চোখ পড়লো হোটেলের ফটকের দিকে। না, ফটকের দু'পাশের পাথরে থাম দুটোর দিকে নয়। ও দুটোর দিকে সেই প্রথম দিনই চোখ পড়েছিল, ভাল লেগেছিল—এই পাথর গাঁথা স্যানাটোরিয়ম আর এখানকার পাথর দিয়ে বানানো বাড়িগুলোর মত। নতুনত্বের বৈচিত্র্যে সেদিন জায়গাটাকেই মনোহারী মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন এ-দৃশ্য যেন চোখের ওপর ঝামা ঘষে দেয়। একঘেয়ে লাগে।

সুপ্রিয়র চোখ পড়লো পাথরের থাম দুটোর পাশে—পাথুরে শরীর কৌতুকীর দিকে। মাথায় পরপর তিনটে মাটির কলসী নিয়েছে, অথচ হাত দুটো দুলছে নীচে।

রাস্তা ধরে তর্‌তর্ করে এগিয়ে যাচ্ছিল কৌতুকী, মাথায়

কলসীতে হাত না ছুঁইয়েই। আর সুপ্রিয়ও মুগ্ধ হয়ে দেখছিল তার কারসাজি।

পরক্ষণেই সচেতন হলো সে। ডাকলো, এই কৌতুকী!

ফিরে তাকালো কৌতুকী, হলদে দাঁত বের করে হাসলো, তর্‌তর্‌ করে এগিয়ে এলো। প্রশ্ন করলে, আমারে কউছন্তি?

—হ্যাঁ। দুধকুণ্ডর জল আনতে যাচ্ছিস?

—হুঁ।

সুপ্রিয় জেরা করার ভঙ্গিতে বললে, দিনে ক' কলসী জল আনিস?

কৌতুকী হাসলো, হঠাৎ ভয় পেলো, তারপর বললে, হোটেল-বাবু কইবারে পারিব। মুই গণিবারে পারিব নাই।

—হুঁ। বেশ, যা। সুপ্রিয় ক্রুদ্ধস্বরে বললে।

কৌতুকী হেসে উঠে তরতর করে চলে গেল।

সুপ্রিয় হঠাৎ একটা রজনীগন্ধার ডাঁটি টেনে ছিঁড়ে নিয়ে বললে, গণিবারে না পারিব। মাইনে নেবার সময় তো গুণতে পারিস। বুঝলেন রমণীবাবু, ঐ তিন কলসীই আনে সারা দিনে, দু'কলসী যায় হিমাদ্রিবাবুর বাড়িতে, আর এক কলসী জল কুয়োর জলের সঙ্গে পাইল করে—মিসেস ভটচায ঠিকই বলেছেন।

কিন্তু গোয়েন্দা-গল্প পড়তে একটাও বাকী নেই সুপ্রিয়র। জুতোর ছাপ দেখে যে আবিষ্কার করতে পারে কে হিমাদ্রিবাবুর বাগানে ঢুকে বেগুণের চারাগুলো নষ্ট করে গেছে, সে অত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। আজ একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না সে। দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ না কৌতুকী ফিরে আসে, তারপর দেখবে……

রমণীবাবু বললেন, সে মশাই দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে, চলুন ফেরা যাক্‌। ও কি আর আপনার চোখের সামনে মেশাবে?

—রমণীবাবু, আমার চোখকে ফাঁকি দেবে ওই কৌতুকী? আমি মশাই জুতোর ছাপ দেখে বলে দিয়েছি কে ঢুকেছিল হিমাদ্রিবাবুর—

—অ্যাঁ? চমকে উঠলেন রমণীবাবু। চোখ দুটো তাঁর বিস্ফারিত হলো পুরু লেন্সের আড়ালে। পরক্ষণেই অপ্রতিভ হাসি হেসে বললেন, চলি, আজ একটু রোদে বসে তেল মাখতে হবে।

হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন রমণীবাবু। আর সুপ্রিয় এতক্ষণে লক্ষ্য করলো, শিখিনী কখন ফুল তুলতে তুলতে চলে গেছে।

নিজের মনেই হাসলো সুপ্রিয়, তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যেতেই ছ'নম্বরের জানালার দিকে তাকালো। জানালাটা কখন খুলে গেছে। কিন্তু জানালায় দাঁড়িয়ে—রুমা নয়, রুমার মা শ্রীলেখা দেবী।

তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই অস্বস্তিতে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো সে, আর দৃষ্টি সরিয়ে নিতে গিয়ে চোখ পড়লো নিজের ঘরটির জানালায়। কি আশ্চর্য, রুমা তো তার ঘরে। আর সে কিনা এখানে দাঁড়িয়ে গোয়েন্দাগিরি করছে। নিজের বোকামিতে নিজেকেই ধিক্কার দিতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু এবার জানালার ভিতর দিয়ে অস্পষ্ট অভ্যন্তরটুকু চোখে পড়তেই মনটা বিষিয়ে উঠলো।

নির্লজ্জ কোথাকার। প্রফেসর ঘোষটার সঙ্গে এত হেসেহেসে কথা বলবার কি দরকার শুনি? না, মেয়ে জাতটাকে এতটুকু বিশ্বাস করা যায় না। পুরুষ জাতটাকেও না।

ওই যে প্রফেসর ঘোষ না কি যেন, প্রফেসর মানুষ, মাষ্টারী করিস কলেজে। ছাত্ররা সম্মান করে। অথচ সুযোগ পেয়েছে কি রুমার সঙ্গে দিব্যি গল্পগুজব জুড়ে দিয়েছে, যেন কতকালের চেনা। আর মেয়েটার মা-বাপও তেমনি, যার-তার সঙ্গে আলাপ করার,

গল্প করার স্বাধীনতা দিচ্ছে যে রুমাকে, একটু ন্যায়-অন্যায় ভাবে না? অত বড় মেয়েকে একটু চোখে চোখে রাখবে না?

সেদিন সন্ধ্যের কথা অন্য।

এক থোকা মাধবীলতা ফুল ছিঁড়ে দেওয়া, কি দুটো কথা বলা—

সুপ্রিয়র মনে তা বলে কোন উদ্দেশ্য ছিল নাকি। আর মাসীমা তাকে বিশ্বাস করেন বলে প্রফেসর ঘোষকেও—

প্রফেসর কমলকুমার ঘোষ কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। লম্বা-চওড়া দশাসই চেহারা, চলনে-বলনে রীতিমত স্মার্ট, পোশাক-পরিচ্ছদে জাতীয়তাবাদী। আজানুলম্বিত খদ্দরের পাঞ্জাবী পরেন—পাঞ্জাবীর রঙটা গেরুয়া বরণ। কাঁধ থেকে সবসময়েই একটা নক্সাকাটা কাপড়ের থলে ঝুলছে, আর তার মধ্যে একরাশ কাগজপত্তর।

তিনি রীগ্যাল হোটেলের নিন্দে করেছেন আর হিমাদ্রিবাবু সেটাকে পান্থপাদপ হোটেল অ্যাণ্ড স্যানাটোরিয়ামের প্রশংসা বলে চালিয়েছেন এ-খবরও যেমন তাঁর অজানা, তেমনি আবার মিসেস ভটচাযের উষ্মা কিংবা রুম-মেট সুপ্রিয়র ঈর্ষার খবরও তিনি রাখেন না।

ভোর না হতেই কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি। বেরিয়ে পড়লেন।

উঁচুনীচু মাঠ পার হয়ে পুরী রোডে এসে পড়লেন, তারপর পুরী রোড থেকে নামলেন মাঠে। রাজারানীর মন্দিরটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন।

হুঁ, মন্দিরটার চারপাশে বাঁশের ভারা বাঁধা হয়েছে। মেরামতের কাজ চলছে।

মনটা খুশী হয়ে উঠলো তাঁর। গতবার এসে যা অবস্থা দেখেছিলেন মন্দিরটার, মনে হয়েছিল যে-কোনদিন বুঝি ভেঙে পড়বে। চটে গিয়ে একটা কড়া চিঠি লিখেছিলেন গভর্ণমেণ্টকে।

তাই দূর থেকে মন্দিরের চারপাশে বাঁশের ভারা বাঁধা হয়েছে দেখে বেশ খুশী হলেন, ভাবলেন তাঁর চিঠিতে কাজ হয়েছে।

কিন্তু কাছে এসেই হতাশ হলেন। দেখলেন জনকয়েক কুলি-মজুর কাজ করছে। ভাঙা পাথরের টুকরোগুলো সরিয়ে, কোথাও কোথাও দেয়ালের অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তিগুলো সরিয়ে চাঁছাছোলা পাথর বসানো হচ্ছে, কোথাও বা মূর্তির গায়ে গেরুয়া রঙ বুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

প্রফেসর ঘোষ ভুরু কুঁচকে তাকালেন খাঁকি কোট পরিহিত ওভারসিয়র গোছের লোকটির দিকে। তারপর এক কোণে এসে বসলেন একটা খাটো পাঁচিলের ওপর। থলী থেকে বের করলেন একরাশ কাগজপত্তর। একটা পেন্সিল।

ধীরে ধীরে একটা মূর্তির স্কেচ আঁকতে শুরু করলেন।

গতবারে এসে সব কাজ শেষ করে যেতে পারেন নি। কয়েকটা স্কেচ বাকী ছিল, আর কয়েকটা তথ্যও সংগ্রহ করতে হবে।

বারো বছর ধরে এই তিন চারটি মন্দির নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁর ধারণাকে এবার বোধহয় একটা যুক্তিনিষ্ঠ প্রমাণের ওপর দাঁড় করাতে পারবেন। নাগর আর বেশরের মধ্যে স্থাপত্য-গত পার্থক্য যতই হোক, ভাস্কর্যের দিক থেকে যে পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান ছিল—এ-কথা প্রমাণ করতে হবে। আর সেইজন্যেই স্কেচগুলির প্রয়োজন।

প্রফেসর ঘোষকে কাগজ পেন্সিল নিয়ে এক মনে ছবি আঁকতে

দেখে খাঁকি কুর্তার ওভারসিয়র এগিয়ে এলো। বললে, সেলাম সাহেব।

চোখ তুলে তাকালেন প্রফেসর ঘোষ। বললেন, কি ব্যাপার হে, হঠাৎ গভর্নমেণ্ট এত নজর দিয়েছে কেন এদিকে?

প্রশ্নটা করে মনে মনে হাসলেন প্রফেসর ঘোষ। ভাবলেন, এ বেচারী আর কি করে জানবে যে তাঁর কড়া চিঠি পেয়েই টনক নড়েছে। তা না জানুক, টনক যে নড়েছে তাতেই খুশী তিনি।

তবু বললেন, কিন্তু ও রকম বিশ্রী রং করছো কেন?

—গারমেণ্টের হুকুম সাহেব।

—হুকুম অমনি রং করার?

খাঁকি কুর্তা হাসলো।—হাঁ হুজুর। আংরেজ আমেরিকান টুরিস্ট আসছে বাবুজী, ক্যামেরা নিয়ে পটাপট ছবি তুলছে, তাই রং করার হুকুম। রং না করলে ভাল ছবি উঠবে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রফেসর ঘোষ। তাই বলো! টুরিস্টদের জন্যে? এ-সবের ওপর এত মায়া দয়ার আর কোন কারণ নেই?

রীতিমত ক্ষেপে গেলেন তিনি। নাঃ, এ গভর্নমেণ্টকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। যেটুকু আপনা থেকে রক্ষা পেয়েছে সেটুকুও নষ্ট করে ছাড়বে।

এইসব মন্দিরগুলোই তো দেশের গৌরব—প্রাচীন ঐতিহ্য। এগুলোকেও টাকা রোজগারের কল বানিয়েছে? অর্থাৎ যেদিন টুরিস্ট আসবে না, সেদিন আর নজরও দেবে না এদিকে।

কথাগুলো কাউকে না শুনিয়ে যেন শান্তি পাচ্ছেন না প্রফেসর ঘোষ। তাই খাঁকি-কুর্তা-পরা লোকটাকেই হয়তো বলতেন, তার আগেই চোখ গিয়ে পড়লো দূরের পীচঢালা রাস্তাটার দিকে।

হ্যাঁ, হোটেলের সেই ভদ্রলোকই। রমণীরঞ্জন দত্ত। লাঠি হাতে খট্ খট্ করে হেঁটে আসছেন এদিকেই। বৃদ্ধ হয়েছেন, চোখে

ভালো দেখতে পান না, কিন্তু এখনও বেশ শক্তসমর্থ ভাবে হাঁটতে পারেন তো!

প্রফেসর ঘোষকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই লাঠি উঁচিয়ে চিৎকার করলেন রমণীবাবু।—ও কমলবাবু, কমলবাবু!

—আসুন, আসুন। দু'হাত তুলে প্রফেসর ঘোষও জবাব দিলেন। দু'দশ পা এগিয়েও গেলেন রমণীবাবুকে লক্ষ্য করে।

তড়বড় তড়বড় করে চোরকাঁটা ডিঙিয়ে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এলেন রমণীবাবু। তারপর খাটো পাঁচিলটার ওপর লাঠিটা নামিয়ে রেখে ধুতির কোঁচা থেকে চোরকাঁটা ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন, কতক্ষণ এসেছেন?

—তা অনেকক্ষণ। এদিকে আপনিও আসেন নাকি?

রমণীবাবু হাসলেন।—আসতে আর পাই কই মশাই। ছেলেটা যে সর্বক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তা আজ তাকে ঘরে রেখেই চলে এলাম।

প্রফেসর ঘোষ বললেন, কেন, সঙ্গে আনলেন না কেন?

আতঙ্কে চোখ বিস্ফারিত করলেন রমণীবাবু।—এখানে? বলেন কি, এই মন্দিরটন্দিরের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয়া যায় ঐ বাচ্চা ছেলেকে?

প্রফেসর ঘোষ গম্ভীর হয়ে গেলেন। সারামুখ তাঁর লাল হয়ে উঠলো রাগে, বিরক্তিতে। কোন কথা না বলে আবার নিজের পুরনো আসনটিতে গিয়ে বসলেন, কাগজ পেন্সিল বের করে স্কেচ করতে শুরু করলেন।

রমণীবাবু কিন্তু বুঝতে পারলেন না যে প্রফেসর ঘোষ তাঁর কথায় রেগে গেছেন। তিনি তখন এক মনে মন্দিরটাকে প্রদক্ষিণ করতে করতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন মূর্তিগুলো। যেন কত বড় সমঝদার, শিল্পের একমাত্র গুণগ্রাহী। এক একটা যৌবনোদ্দীপ্ত

মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে একবার বাঁদিক থেকে দেখেন, একবার ডান দিক থেকে, কখনো ছ'পা পিছিয়ে গিয়ে দেখেন, কখনো এগিয়ে এসে।

প্রতিটি মূর্তি, না দেবমূর্তি নয়, নগ্ন মূর্তিগুলোই দূরবীক্ষণ এবং অণুবীক্ষণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে মন্দিরটাকে চক্র দিচ্ছিলেন। একটা পাক সেরে এসে প্রফেসর ঘোষের সামনে দাঁড়ালেন কোমরে হাত দিয়ে, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন স্কেচটার দিকে।

প্রফেসর ঘোষ পেন্সিলের আঁচড় টানতে টানতে বারকয়েক দেখে নিয়েছেন রমণীবাবুর কার্যকলাপ। মনে মনে যত না ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তার চেয়ে বেশী হেসেছেন রমণীবাবুর শিল্প পর্যবেক্ষণের হাবভাব দেখে।

দেখছিস তো বাপু উলঙ্গ মূর্তি, তার আবার অত কায়দা কেন। সোজাসুজি দেখলেই হয়।

রমণীবাবু অতশত খবর রাখেন না। তাই স্কেচটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন, বাঃ, বেশ আঁকেন তো আপনি। দেখি আর কি কি এঁকেছেন।

প্রফেসর ঘোষ চোখ তুললেন না, নীচের একখানা স্কেচ টেনে বের করে রমণীবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তারপর আবার স্কেচ আঁকায় মন দিলেন।

রমণীবাবু ছবিটা প্রথম উল্টো করে ধরেছিলেন, সোজা করে নিতেই মুখের হাসিটা দপ্ করে নিভে গেল। এ কি, এ যে রমণীবাবুরই ছবি; চশমা-পরা কুৎকুতে দুটো চোখ দিয়ে একটা নগ্নমূর্তি দেখছেন রমণীবাবু—তারই স্কেচ। তলায় বড় বড় অক্ষরে লেখা—'সমঝদার'।

সমঝদার। ঠাট্টাটা বুঝতে পারলেও নীচের নামকরণটা দেখে রমণীবাবু ভাবলেন, কি জানি, নিছক ঠাট্টা নাও হতে পারে।

তাই বললেন, কি জিনিসই ছিল আমাদের দেশে, দেখলে দুঃখ হয়, কি বলেন ?

প্রফেসর ঘোষ উপহাসের গলায় বললেন, কেন ?!

—দুঃখ হয় না ? কি বলছেন মশাই। এমন সব পেণ্টার কোথায় হারিয়ে গেল....

প্রফেসর ঘোষ সায় দিলেন।—তা যা বলেছেন। বেঁচে থাকলে পছন্দসই একটা মূর্তি করিয়ে নিয়ে বাড়িতে রাখতে পারতেন।

—ছিঃ ছিঃ, কি যে বলেন, ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এই জিনিস আবার বাড়িতে রাখা যায়। তবে হ্যাঁ, মূর্তিগুলো খারাপ হলে কি হবে, উঁচুদরের আর্ট।

প্রফেসর ঘোষ বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। নাঃ, লোকটা কাজ এগোতে দেবে না আজ আর।

উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলুন ফেরা যাক্।

—চলুন।

চোরকাঁটার মাঠ পার হয়ে দু'জনে পুরী রোড ধরলেন। এবং পুরী রোড থেকে বাঁক নিলেন মুক্তেশ্বরের মন্দিরের দিকে।

মুক্তেশ্বরের মন্দিরের দিকে যাবার উৎসাহ রমণীবাবুরই বেশী। আকর্ষণটা অবশ্য মন্দিরের নয়, গৌরীকুণ্ডের।

রোদ উঠতেই স্নানার্থীদের ভিড় লেগে যায় গৌরীকুণ্ডের ঘাটে। কেদারগৌরীর মন্দিরের পিছনেই গৌরীকুণ্ড, পাশে দুধকুণ্ড—যার জলের টানে চেঞ্জারদের ভিড় এখানে।

নির্জন নিঃশব্দ এই অঞ্চলটুকু। কেদারগৌরী, মুক্তেশ্বর আর সিদ্ধেশ্বর—তিনটি মন্দির পাশাপাশি। বড় বড় গাছের ছায়ায় ভেজা ঠাণ্ডা থমথমে ভাব। ফাঁকে ফাঁকে নরম রোদ উঁকি দেয়।

সেই নির্জন নিঃশব্দতাও হঠাৎ হঠাৎ চমকে ওঠে। আগন্তুকরা কেউ আসে পুজো দিতে, কেউ গৌরীকুণ্ডের জলে স্নান করতে।

কেউ বা দুধকুণ্ডের জল নিতে। দু' চারজন সাহেব-মেম টুরিস্টও এসে হাজির হয় এক একসময়। পাণ্ডার দল ছুটে যায়। কারুকার্য দেখিয়ে দেবার জন্যে। কারণ, মন্দিরের গায়ের কিংবা ভিতরের মূর্তিগুলোই দেখতে আসে বেশীর ভাগ লোক।

রমণীবাবু এসে দাঁড়ালেন গৌরীকুণ্ডের ঘাটে।

কাছাকাছি, পাশাপাশি দুটো ঘাট। একটা মেয়েদের, একটা ছেলেদের।

এর মধ্যেই অনেকে স্নান করতে শুরু করেছে, সাঁতার কাটছে একটি মারাঠী তরুণী। সুঠাম শরীর, সুন্দর গঠন।

একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন রমণীবাবু, বেশ খুশী খুশী ভাব ফুটে উঠলো তাঁর মুখেচোখে। তন্ময়তা ভাঙতেই কি যেন বলতে গেলেন প্রফেসর ঘোষকে, তিনি পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন মনে করে।

কিন্তু কই, প্রফেসর ঘোষ গেলেন কোথায়?

এদিক ওদিক তাকিয়ে রমণীবাবুর নজরে পড়লো, প্রফেসর ঘোষ কেদারগৌরীর মন্দিরের এক কোণে হাঁটু গেড়ে বসে একটা ছোট্ট মূর্তি ঘষে ঘষে কি যেন দেখছেন।

রমণীবাবু কাছে এগিয়ে এলেন। দেখলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, আপনাদের এই সব আর্টফার্টের মানে বুঝি না মশাই। অমন জীবন্ত অর্ধনগ্ন মূর্তি রয়েছে গৌরীকুণ্ডে, সাঁতার কাটছে—তা না দেখে এই পাথরের মধ্যে যে কি রস পান!

প্রফেসর ঘোষ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, রাগে সর্বশরীর যেন জ্বলে গেল তাঁর, কঠিন রুক্ষ চোখের দৃষ্টিতে রমণীবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠলেন, ছিঃ ছিঃ, এ কি অশ্লীল মন আপনার। বুড়ো হয়েছেন, এই বয়সে লজ্জা করে না আপনার ঘাটে দাঁড়িয়ে মেয়েদের দিকে তাকাতে?

রমণীবাবু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন প্রফেসর ঘোষের হাবভাব দেখে। তবু নিজের মনেই বললেন, ভালো রে ভালো, আসলটা হবে অবসিনারি, আর নকলটা হাই ক্লাশ স্কালপটিওর ?

অর্থাৎ বলতে চাইলেন যে রক্তমাংসের হলেই অশ্লীল, আর পাথরের হলেই উচ্চস্তরের ভাস্কর্য।

এর আগে ভাস্করকে পেণ্টার বলায় খটকা লেগেছিল, এবার রমণীবাবুর বিচিত্র ইংরেজী শুনে প্রফেসর ঘোষ তাই এত ক্রোধের মধ্যেও অট্টহাসে হেসে উঠলেন হো হো করে।

কিন্তু হোটেলে ফেরার পথে প্রফেসর ঘোষের মনের মধ্যে প্রশ্নটা বারবার জেগে উঠলো। তাই তো! আসলটা অশ্লীল, অথচ নকলটা আর্ট ?

হোটেলে ঢোকবার আগেই চিৎকারটা কানে গিয়েছিল প্রফেসর ঘোষের। গাঁদা ফুলের বাগানটা পার হয়ে সবে উই-ধরা দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়েছেন অমনি থতমত খেয়ে গেলেন।

ভেতরের উঠোনে রীতিমত একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। কৌতুকী কাঁদতে কাঁদতে কি যেন বলবার চেষ্টা করছে, আর হিমাদ্রিবাবু লম্ফঝম্প করে চিৎকার করছেন : বেইমান, মিথ্যেবাদী, বেরিয়ে যা তুই, বেরিয়ে যা এক্ষুণি।

প্রফেসর ঘোষ কৌতুকীর দিকে তাকালেন একবার, একবার হিমাদ্রিবাবুর ক্রুদ্ধ চোখের দিকে। দেখলেন কৌতুকীর দু'গাল বেয়ে জল ঝরছে, আর কাঁদো কাঁদো গলায় কি বলছে সে। কিন্তু তার কথার এক বর্ণও কানে যাচ্ছে না হিমাদ্রিবাবুর।

প্রফেসার ঘোষ দু পা এগিয়ে এলেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে কি হিমাদ্রিবাবু ?

হিমাদ্রিবাবু সচকিত হলেন, এগিয়ে এলেন যাত্রার আসরের অর্জুনের মত, তীর-ধনুকের অভাবে হাত দু'খানাকেই বীরত্বব্যঞ্জক আস্ফালনে নাচাতে নাচাতে, এসে বললেন, হাড়-বদমাস মশাই, হাড়-বদমাস। আমারই খাবে আর আমারই নিন্দে করবে ?

হিমাদ্রিবাবুর আস্ফালন দেখে প্রফেসর ঘোষ হেসে ফেললেন। —আপনার খাবে কেন ? ও তো খেটে খায়, হকের পাওনা। তা কি হয়েছে বলুন না।

হিমাদ্রিবাবু দ্বিতীয় প্রশ্নটা যেন শুনতেই পেলেন না, প্রফেসর ঘোষের কথার প্রথমাংশের জবাবেই যেন বললেন, খেটে খেলে তো বলবার ছিল না। কেবল ফাঁকি। কেবল ফাঁকি। তাও সহ্য হতো, কিন্তু বোর্ডারদের কাছে আমার নিন্দে করে বেড়াবে আর আমি ওকে মাইনে দিয়ে খেতে দিয়ে রাখবো ?

সুপ্রিয় বোধহয় এতক্ষণ দোতলার বারান্দা থেকে শুনছিল সব, সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বললে, শুনুন হিমাদ্রিবাবু শুনুন। ও কিছু বলে নি। আমাদের কি চোখ নেই নাকি ? দেখতে পাই না ?

সুপ্রিয়কে নামতে দেখে শিবনাথবাবু, ব্রজমাধববাবু, মিসেস ভটচায এবং রেশম নেমে এলো। ভিড় জমে গেল উঠোনটায়।

এবং শুরু হলো কথা কাটাকাটি।

প্রফেসর ঘোষ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বুঝলেন ব্যাপারটা। কুরুক্ষেত্র শুরু হয়েছে দুধকুণ্ডের জল নিয়ে। সুপ্রিয় এবং মিসেস ভটচাযের অনুযোগ: দুধকুণ্ডের জল বলে সকলকে দু'বেলা দু কুঁজো করে কুয়োর জল দেওয়া হয়। আর হিমাদ্রিবাবুর চিৎকার সে জন্যেই। তাঁর ধারণা এ-কথা কৌতুকীই বলেছে তাঁদের।

প্রফেসর ঘোষ সব কথা শুনে বললেন, শুনুন হিমাদ্রিবাবু, ও বেচারীর ওপর রাগ করছেন কেন। আপনার বক্তব্যটা কি তাই বলুন।

সুপ্রিয় বললে, বুঝছেন না স্যার, ওঁর ধারণা কৌতুকী বুঝি কথাটা ফাঁস করে দিয়েছে। আমরা যেন কিছুই বুঝতে পারি না, চোখ নেই। এই যে আপনি এলেন দুটো ভারী ভারী ট্রাঙ্ক নিয়ে, তা ট্রাঙ্কে যে বই বোঝাই করা আছে তা কি বুঝতে পারিনি আমি? বলে দিতে হয়েছে? দেখুন হিমাদ্রিবাবু, ডিটেকটিভ বই যাদের পড়া আছে তাদের কোন কথা বলে দিতে হয় না।

বোর্ডাররা সব নেমে এসেছে দেখেই দমে গিয়েছিলেন হিমাদ্রিবাবু, সুপ্রিয় এবং প্রফেসর ঘোষের কথা শুনে মুহূর্তের মধ্যে যেন বদলে গেলেন তিনি। তাঁর অভিধানে, বোর্ডার কোন দোষ করতে পারে না। তাই নরম সুরে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে দুধকুণ্ডের জলই নিয়মিত দেওয়া হয়।

প্রফেসর ঘোষ শেষ পর্যন্ত একটা রায় দিলেন। বললেন, এ-সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি করে কি হবে, সকলের তো দুধকুণ্ডের জল দরকার নেই। যারা চেঞ্জার, তাঁরা বরং স্নান করতে যাওয়ার সময় একটা কোন পাত্রটাত্র নিয়ে গিয়ে নিজেরাই নিয়ে আসবেন।

রায়টা হিমাদ্রিবাবুর খুবই মনঃপূত হলো, কিন্তু বোর্ডাররা কেউই খুশী হলো না এ-কথায়। এক কলসী জল কি বয়ে আনা যায় নাকি। আর আনবেই বা কেন, হিমাদ্রিবাবুর হ্যাণ্ডবিলে তো লেখাই আছে দুধকুণ্ডের জল বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

রমণীবাবুও কখন এক ফাঁকে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। স্নানরতা মারাঠী মেয়েটির দিকে তাকানোর জন্য কিছুক্ষণ আগেই তাঁকে খোঁটা খেতে হয়েছে বলে প্রফেসর ঘোষের ওপর চটেই ছিলেন তিনি।

তাই সুপ্রিয়র পিছন পিছন সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসতে আসতে ফিসফিস করে বললেন, মুনসেফ কোর্টের হাকিমের রায় শুনলেন!

সুপ্রিয় হেসে সায় দিলো।—ঠিকই বলেন আপনি। অধ্যাপক নয়। অর্ধপক্ক।

শিবনাথবাবু কিন্তু একটি কথাও বলেন নি এতক্ষণ, চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন প্রফেসর ঘোষের পাশটিতে। প্রফেসর ঘোষ তাঁর কাঁধে ঝোলানো থলেটা বা-কাঁধ থেকে ডান-কাঁধে বদলে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ওপরে উঠতে শুরু করতেই শিবনাথবাবু তাঁর পিছনে পিছনে উঠে এলেন। তারপর সুপ্রিয়রা না শুনতে পায় এমন ফিসফিসে গলায় বললেন, ঠিকই বলেছেন প্রফেসর ঘোষ, এ জাজমেণ্ট!

প্রফেসর ঘোষ খুশীর হাসি হাসলেন।—এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এত ঝামেলা করার কোন মানে হয়?

শিবনাথবাবু সায় দিলেন।—সত্যিই তো, এসেছি দুদিনের জন্যে ...তা আপনার পরিচয়টা তো পেয়ে গেছি, কোলকাতায় থাকেন কোথায় জানতে পারি?

ঠিকানা দিলেন প্রফেসর ঘোষ। কিন্তু শিবনাথবাবু শুনেই ক্ষান্ত নন, পকেট থেকে ক্ষুদে নোটবই বের করে লিখে নিলেন।

প্রফেসর ঘোষ বোধহয় ভদ্রতার খাতিরেই প্রশ্ন করলেন, আপনিও কোলকাতায় থাকেন তো!

—হেডকোয়ার্টার কোলকাতায়, কিন্তু থাকা আর হয় কই। আজ দিল্লী, কাল বম্বে · রোজলারের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই, রোজলার ফ্যান? দি বিগেস্ট ফ্যান ম্যানুফ্যাকচারার্স অব ইণ্ডিয়া —আমি তার সিনিয়র রিপ্রেজেণ্টেটিভ।

প্রফেসর ঘোষ নিরুৎসাহভাবে বললেন, ও।

কিন্তু শিবনাথবাবু নিরুৎসাহ হলেন না। হয়তো বলতে যাচ্ছিলেন, 'আপনাদের তো কলেজে অনেক ফ্যানট্যান লাগে'

গোছের কিছু একটা, কিন্তু তার আগেই সুপ্রিয়কে পাশ কাটিয়ে যেতে দেখে চুপ করে গেলেন।

সুপ্রিয় অবশ্য কান দিতো না ওঁর কথায়। ছ'নম্বরের সামনে গিয়ে সে তখন নরম গলায় ডাকতে শুরু করেছে, মাসীমা, মাসীমা।

ডাকটা রুমাই প্রথম শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু সে বাবার জুতো পালিশ করতে করতে এক মুহূর্ত থেমেই আবার ব্রাশ চালাতে লাগলো জোরে জোরে, যেন ডাকটা শুনতেই পায় নি।

দ্বিতীয়বার ডাক শুনেই শ্রীলেখা দেবী বেরিয়ে এলেন।

সুপ্রিয় একমুখ হেসে বললে, মাসীমা, ছুঁচসুতো আছে আপনার কাছে ?

—আছে। কেন ?

সুপ্রিয় হাসলো।—হিমাদ্রিবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে বোতামটা ছিঁড়ে গেল, তাই···

—ওমা তাই নাকি ? ওসব ঝগড়াঝাঁটি করতে কেন যাও বাবা। বলেই রুমাকে ডাক দিলেন, ও রুমা, রুমি, ছুঁচসুতোটা দেখতো কোথায় আছে।

এবার আর জুতো পালিশ নিয়ে বসে থাকতে পারলো না রুমা। উঠে দাঁড়ালো, ভেতর থেকেই বললে, কি হবে মা ছুঁচসুতোয় ?

—সুপ্রিয়র জামার বোতামটা ছিঁড়ে গেছে, দেনা মা খুঁজে, লাগিয়ে দিই।

রুমা কি যেন ভাবলে এক পলক, নিজের মনেই মুচকি হাসলে, তারপর দেরাজ টেনে সুটকেশ খুলে উলের থলেটা টেনে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলে। না কোথাও তো নেই।—কই, পাচ্ছি না তো। কোথায় রেখেছিলে কোথায় ?

—পেলি না। রাখবো আর কোথায় দেরাজেই তো ছিল।

দাঁড়া দেখছি। বলে শ্রীলেখা দেবী নিজেই এলেন, খুঁজলেন, কিন্তু পেলেন না।

দেরী দেখে সুপ্রিয় বললে, থাক মাসীমা, তাড়া নেই আমার, পরে দিলেও চলবে।

শ্রীলেখা দেবী রেগে গেলেন।—কোথায় যে রাখিস সব, কাজের সময় পাওয়া যাবে না।

জিনিসটা খুঁজে না পাওয়ার জন্যে রাগ নয়, আসলে এই সময়ে খুঁজে না পাওয়ার জন্যেই রাগ। সুপ্রিয়কে তিনি ছেলের মত স্নেহ করেন, তার একটা কিছু উপকার করতে পেলে যেন খুশী হন, এমন কি ছেলেটিকে সেই চুরির পর যদি পাঁচটা টাকা ধার দিতে পারতেন তা হলেও কথা ছিল, অথচ সুপ্রিয় কখনো কিছু চায় নি। আজ হঠাৎ যদি বা এলো ছুঁচসুতো চাইতে, জিনিসটা পাওয়া যাচ্ছে না। রাগ হয় কিনা মেয়ের ওপর।

অগত্যা বলতে হলো, খুঁজে দেখছি বাবা, কোথায় যে উলটাল করে রাখে মেয়ে!

সুপ্রিয় বললে, না, যখন হোক্ পেলেই চলবে, এত তাড়া নেই আমার। বলে চলে এলো।

আর সুপ্রিয় তার ঘরে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছুঁচসুতোটা খুঁজে পেলো রুমা। একটা বইয়ের ভেতর ছিল।

শ্রীলেখা দেবী বললেন, যা দিয়ে আয় সুপ্রিয়কে।

রুমা ছুঁচসুতো নিয়ে বেরিয়ে আসছিল ঘর থেকে, শ্রীলেখা দেবী বললেন, বোতামটা লাগিয়ে দিয়ে আসিস।

—বয়ে গেছে। কে না কে, আমি তার বোতাম লাগাতে যাবো···

—তবে ডেকে দে, আমি লাগিয়ে দেবো। বিদেশ বিভুঁয়ে এসেছে বেচারী একা, ছুঁচে সুতো পরাতে জানে কিনা সন্দেহ···

রুমা হেসে ফেলে বললে, বেশ বাবা বেশ, লাগিয়েই দেবো। বলে চলে গেল।

গিয়ে দেখলে সুপ্রিয় চেয়ারে বসে ঘাড় কাৎ করে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে রিং তৈরী করছে। আর প্রফেসর ঘোষ তক্তাপোশের ওপর একরাশ বইখাতা ছড়িয়ে নিবিষ্টমনে কি সব লেখাজোখা করছেন।

রুমা ছুঁচসুতো হাতে নিয়ে ঢুকলো, আড়চোখে একবার প্রফেসর ঘোষের দিকে তাকিয়ে দেখলো। না, প্রফেসর ঘোষের দৃষ্টি নেই এদিকে। রুমা এবার সুপ্রিয়র দিকে তাকালে, চোখোচোখি হলো, হাসলো। তারপর সিগারেটের ধোঁয়ার ঘ্রাণ নেবার ভঙ্গি করে চাপা গলায় বললে, এঃ কি বিচ্ছিরি গন্ধ!

সুপ্রিয় হেসে সিগারেটটা ছাইদানিতে টিপে টিপে নিবিয়ে দিলো। তারপর হাত বাড়িয়ে বললে, দাও।

—না।

—বাঃ রে, তা হলে আনলে কেন!

রুমা হেসে বললে, কই দেখি বোতামটা।

সুপ্রিয় বোতামটা দিলো।

—কোথায়?

সুপ্রিয় উঠে দাঁড়ালো। বুকের যে জায়গাটা থেকে বোতামটা খসে পড়েছে, দেখালো।

রুমা ছুঁচসুতো নিয়ে বোতামটা লাগিয়ে দিতে দিতে মুখ তুলে তাকালো সুপ্রিয়র দিকে।

সুপ্রিয় বলে উঠলো, এই সাবধান, বুকে ফুঁড়ে দিও না যেন।

ছুঁচটা নিয়ে সুপ্রিয়র চোখে খুঁচিয়ে দেয়ার ভাণ করে হাসলো রুমা। আর সঙ্গে সঙ্গে কপট ভয়ে চমকে উঠে রুমার হাতখানা ধরে ফেললো সুপ্রিয়।

এক মুহূর্ত! হাত ছাড়লো না সুপ্রিয়, হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলো না রুমা।

পর মুহূর্ত। হাত ছেড়ে দিলো সুপ্রিয়, হাত ছাড়া পেয়ে বোতামটায় আরো দুটো সেলাই দিয়ে বোতামের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সুতোটা দাঁতে কেটে দিলো রুমা।

তারপর আড়চোখে প্রফেসর ঘোষের দিকে তাকালো। প্রফেসর ঘোষও তখন মুখ তুলে তাকিয়েছেন।

বললেন, কি খবর, বেড়াতে যাওনি আজ ?

রুমা কাছে এগিয়ে গেল, গিয়ে বসলো প্রফেসর ঘোষের তক্তাপোশের একধারে, একটু দূরত্ব রেখে। তারপর সহাস্যে বললে, ঘুম ভাঙতেই আটটা বেজে গেল! আপনি কিন্তু খুব ভোরে ওঠেন, তাই না ?

—জানলে কি করে ? তুমি তো আটটায় উঠেছো।

রুমা বললে, বাঃ রে, চোখমুখে জল দিয়ে এসে দেখলাম আপনার ঘরে তালা ঝুলছে।

প্রফেসর ঘোষ হাসলেন।—হ্যাঁ, রাজারাণীর মন্দিরে গিয়েছিলাম, কয়েকটা স্কেচ বাকী ছিল···

—ও মা। কপট অভিমানে ঠোঁট ওল্টালো রুমা।—আমাকে নিয়ে গেলেন না কেন ?

প্রফেসর ঘোষ হাসলেন, কোন উত্তর দিলেন না। আর সুপ্রিয় ডিকেটটিভ বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে একবার পিছন ফিরে তাকালো। তাকালো দুটো ঝাঁঝালো চোখে।

সেই ঝাঁঝালো দৃষ্টির সঙ্গে চোখোচোখি হলো রুমার। আর কৌতুকে ফিক করে হেসে ফেলেই ঠোঁট টিপলো রুমা, তারপর সুপ্রিয়কে আরো রাগাবার জন্যেই বোধহয় প্রফেসর ঘোষের কাছ ঘেঁষে বসলো। তারপর কনুইয়ে ভর দিয়ে, প্রায় আধশোয়া

ভঙ্গিতে মোটা-সোটা একখানা বই টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করলে।

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতেই বললে, এই মোটা মোটা বই, সব পড়েছেন আপনি ? কি করে এত পড়েন বলুন না ?

—লিখতে পারি মোটা মোটা বই আর পড়তে পারবো না ? হাসলেন প্রফেসর ঘোষ।

রুমা আবার কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পর্দার ফাঁক থেকে হঠাৎ মাকে উঁকি মারতে দেখেই ধড়মড় করে উঠে বসলো সে।

রুমার ফিরে আসতে দেরী হচ্ছে দেখেই প্রথমটা বিরক্ত, তারপর চিন্তিত হতে শুরু করেছিলেন শ্রীলেখা দেবী। শেষে সন্দেহ জেগে উঠতেই বেরিয়ে এলেন, এসে দাঁড়ালেন ন' নম্বর ঘরের সামনে। পর্দাটা হাওয়ায় দুলে উঠতেই উঁকি দিলেন, আর উঁকি দিয়ে যা দেখলেন তাতে সারা শরীর তাঁর জ্বলে উঠলো।

যা ভেবেছিলেন তাই! কোথায় সুপ্রিয়র সার্টের বোতামটা লাগিয়ে দিতে পাঠালেন মেয়েকে, আর সে কিনা ওই প্রফেসর ঘোষ লোকটার খাটে শুয়ে দিব্যি গল্প করছে। আর যে ভাবে গল্প করতে দেখলেন তাতে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এই এক ফোঁটা মেয়ের ভেতরে ভেতরে এত! সেদিন মেয়ের কথা শুনে সরল ভেবেছিলেন, ভেবেছিলেন রুমার মনে দোষ নেই। এত চালাক! তাঁর চোখকেও ফাঁকি দেয়।

রুমাও ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তাই ছুঁচসুতোটা হাতে নিয়ে তখনই ফিরে এলো।

শ্রীলেখা দেবী অপেক্ষা করছিলেন। রুমা চৌকাঠ ডিঙোতে না ডিঙোতে গম্ভীর গলার ডাক এলো।—রুমি!

রুমা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

শ্রীলেখা দেবী ধমকের সুরে বললেন, ওই লোকটার সঙ্গে আর

কোনদিন যদি কথা বলতে দেখি তো তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।

রুমা মাথা হেঁট করে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে সিমেন্টের মেঝেতে মাটি খোঁড়বার চেষ্টা করলো, জবাব দিলো না।

শ্রীলেখা দেবী ক্রুদ্ধ চোখজোড়া মেয়ের মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে বললেন, যাও। মনে থাকে যেন।

রুমা ভরসা পেয়ে বললে, সুপ্রিয়র সঙ্গেও না?

হেসে ফেললেন শ্রীলেখা দেবী।—ওর সঙ্গে কথা বলবি না কেন, কিন্তু ওই প্রফেসর না হাতি, ওই বদমাইসটার সঙ্গে যদি দেখি ··

রুমা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো।—হ্যাঁ মা, সত্যি, এক নম্বরের পাজি ওই প্রফেসর ঘোষ, দিনরাত কেবল মন্দিরের ওই অসভ্য ছবিগুলো নিয়ে বসে থাকে। ঠিক বলেছো, আর একদিনও কথা বলবো না।

শ্রীলেখা দেবী আবার রেগে গেলেন।—ন্যাকামি করো না।

কথাটা বলেই ছ' নম্বর আর সাত নম্বর ঘরের মাঝখানের দরজাটা দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন, যেখানে খাটের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে আপন মনে ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করছিলেন মিস্টার সেন।

এদিকে ছ' নম্বর ঘরে টেবিল-চেয়ারে বসে রেশম পরীক্ষার পড়া করছিল: আমাদের পরিবারের একজন—এ মেম্বার অফ আওয়ার ফেমিলি···

—ফেমিলি নয়, ফ্যামিলি। ধমকের সুরে বললে রুমা। মায়ের ওপর যত রাগ সবটুকু রেশমের ট্র্যানস্লেশনের খাতার ওপর ঢেলে দিয়ে।

দিদিটা সব সময় ওর ইংরেজী উচ্চারণ নিয়ে খোঁটা দেয় বলে

মনে মনে বিরক্ত কম হয় না রেশম। তাই রুমার কথায় চটে গেল ও, বলে উঠলো, যা যা অত মেমসাহেব হতে হবে না, মেমসাহেবরা মায়ের কাছে বকুনি খায় না।

হুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর শিখিনী তার তেরো নম্বর ঘরের খাটে শুয়ে পায়ে পা জড়াতে জড়াতে এক মনে একটা ইংরেজী ফ্যাশন পত্রিকার ছবি দেখছিল। তার ফুটানি-কি-থলীয়ার অর্থাৎ ভ্যানিটি ব্যাগের টাকা শেষ হয়ে আসছে। আর হু'একদিনের মধ্যেই সরে পড়তে হবে, ইণ্টারভিউয়ের ফল জানতে পারুক চাই না পারুক। আরেকবার ওই ফ্যানওয়ালাবাবুকে বলতে হবে মিস্টার মহান্তীর সঙ্গে দেখা করে কথাটা বলবার জন্যে। ইংরেজী পত্রিকার ছবি দেখতে দেখতে এমনি সাত পাঁচ ভাবছিল সে। এমন সময় ক্যারমবোর্ডটা টানতে টানতে এসে হাজির হলো বেলু।

বললে, পাঞ্জাবীদি।

—বেলু বহিন? দেড় হাত বাই এক হাত পত্রিকার আড়াল থেকে মুখটা বের করে শিখিনী তাকালো।

বেলু আহুরে সুরে বললে, উঠুন উঠুন, ক্যারম খেলবো।

উঠে বসলো শিখিনী, আর তক্তাপোশের ওপর ক্যারামবোর্ডটা বসিয়ে বিস্কুটের টিন থেকে কাগজে মোড়া খানিকটা গায়ে-মাথার ট্যালকাম পাউডার ছিটিয়ে দিলো বেলু, তার পর ঘুঁটি সাজাতে বসলো।

স্ট্রাইকার নিয়ে হুটো এলোপাথারি রিবাউণ্ড করে শিখিনী বললে, হু'জনে খেল জমবে না বেলু, রোজলারবাবুকে বুলাও।

বেলু বললে, শিবনাথবাবু? তিনি তো কখন বেরিয়ে গেছেন। সুপ্রিয়দাকে ডাকবো?

দু'জনে খেলা জমবে কি না জমবে সে বিষয়ে শিখিনীর কোন চিন্তাই ছিল না, আসলে শিবনাথবাবুকে খেলতে ডাকলে এক ফাঁকে চাকরীর কথাটা পাড়তে পারতো সে। তা যখন হচ্ছে না, তখন সুপ্রিয় এলো কি রুমা এলো, শিখিনীর কিছু যায় আসে না।

তাই বললে, বুলাও যাকে খুশী।

বেলু ছুটে গেল, গিয়ে ডেকে নিয়ে এলো সুপ্রিয়কে। ডেকে নয়, রীতিমত সুপ্রিয়কে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো।

বেলুর ডাক শুনেই বুঝেছিল সুপ্রিয়, ক্যারম খেলতে হবে। এর আগেও সে ক্যারম খেলেছে শিখিনীর সঙ্গে। কিন্তু গৌরী দেবী চলে যাওয়ার পর ক্যারমের পাট দিনকয়েক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ বেলুর চেয়ে গৌরী দেবীর উৎসাহই ছিল বেশী। বেলু আর গৌরী দেবী হতেন পার্টনার, আর শিখিনী এবং সুপ্রিয় প্রতিপক্ষ।

ক্যারমের নেশাটা সুপ্রিয়র কেন যে হঠাৎ উবে গেল বলা দুষ্কর। গৌরী দেবী চলে গেছেন তাই, না রুমা এসেছে বলে!

বেলু ধরে নিয়ে এলেও খেলতে বসার ইচ্ছে ছিল না সুপ্রিয়র। ছিল না দুটো কারণে। প্রথমতঃ, আজকেই—এই কিছুক্ষণ আগে রুমাকে বড় বেশী কাছে পেয়েছিল সে। শুধু কাছে নয়, প্রায় বুকের কাছে। সত্যি, সার্টটা খুলে দিতেও বলে নি রুমা। সুপ্রিয়র বুকের কাছটিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সার্টের বুকে বোতাম লাগাতে লাগাতে সেই যে রুমার বাঁ হাতখানা সুপ্রিয়র বুক ছুঁয়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে, তার স্বাদটুকু যেন এখনো লেগে আছে।

তাই নড়বড়ে চেয়ারটায় বসে বসে একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছিল সুপ্রিয়, আর চোখ বুজে সেই দৃশ্যটা বারবার রোমন্থন করছিল। শুধু সেই দৃশ্যটা নয়, মনে মনে আরো অনেক দৃশ্য নিশ্চয়ই গড়ে তুলছিল। মানুষ প্রেমে পড়লে যেমন করে থাকে।

মানে, নিজের মনকেই বলছিল, মনে করো হঠাৎ ভূমিকম্প হয়ে পৃথিবীর সব লোক মরে ভূত হয়ে গেল, শুধু আমি আর রুমা বেঁচে আছি, রুমার বাবা মাও মরে গেছেন—না, মাসীমা অবশ্য তাকে রীতিমত স্নেহ করেন····মনে করো তার চেয়ে সবাই হোটেল থেকে বেড়াতে বেরিয়ে গেছে সেদিনের মত, এমন কি ওই বিচ্ছু রেশমটাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছেন মাসীমা, আমি শুয়ে আছি, রুমা এসে বললে····আমি উত্তর দিলাম····রুমা তখন বললে····আমি তখন বললাম ··রুমা বললে, বেশ যাবো আমি, যেখানে নিয়ে যাবে, আমি বললাম, তুমি সঙ্গে থাকলে আমি যেখানেই যাই রুমা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সব ভাবতে ভাবতে কল্পনায় নানারকম চটকদার ভালো ভালো কথা বলছিল সুপ্রিয়, আর কল্পনার চোখে রুমার হাসি দেখছিল, রুমার সুন্দর চোখের ভুরুবিলাস দেখছিল, আর নিজের মনেই মুচকি মুচকি হাসছিল।

বেলুর ডাকে ওর স্বপ্নভঙ্গ হলো। আর তেরো নম্বরে এসে যখন দেখলে স্রেফ শিখিনী ছাড়া আর কেউ নেই, তখন বিরক্তি থেকে ভয় দেখা দিলো ওর চোখে।

শিখিনী বললে, আরে সুপ্রিয়বাবু বৈঠ যান, বৈঠ যান।

এর আগে অবশ্য শিখিনী না বললেও বসে পড়তো ও, কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্যরকম। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে বসতে হয়। কারণ সুপ্রিয়র ভয়, ও যদি খেলতে বসে শিখিনীর সঙ্গে, আর রুমা হঠাৎ এসে হাজির হয়, তা হলে হয়তো সন্দেহ করবে যে সুপ্রিয় রুমার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখছে না। হয়তো ভাববে শিখিনীর প্রতি ওর কোন দুর্বলতা আছে।

কিন্তু শিখিনী পাঞ্জাবী হলেও মহিলা। একজন মহিলার অনুরোধ না রাখাও মুশকিল।

শেষ পর্যন্ত বেলুর টানাটানি আর শিখিনীর অনুরোধে বসতেই হলো সুপ্রিয়কে।

আর যদিও এক দান খেলেই উঠবো বলে বসলো সে, তবু খেলতে খেলতে কখন যে বিকেল হয়ে গেছে লক্ষ্যই করে নি সুপ্রিয়। ঘোর কাটলো শ্রীলেখা দেবীর ডাকে।

—ও ছেলে! হাসলেন শ্রীলেখা দেবী।

আর সুপ্রিয় চমকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলে শ্রীলেখা দেবী সাজগোজ সেরে এসে দাঁড়িয়েছেন চৌকাঠে।

শ্রীলেখা দেবী হাসলেন।—তোমাকেই তো খুঁজছি। বেড়াতে বেরিয়ে যাবে না তো?

সুপ্রিয়র হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ যেন সিঙি মাছের মত ঝাপটা দিয়ে উঠলো আনন্দে।

বললে, না মাসীমা, শরীরটা তেমন ভালো নেই।

—যাক, বাঁচলাম। আসছি দাঁড়াও।

বলেই চলে গেলেন তিনি ছ' নম্বরের দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ বসে থেকে শেষে অধৈর্য হয়ে ক্যারম ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুপ্রিয়। বেরিয়ে এসেই মুখোমুখি পড়লো। শ্রীলেখা দেবীর পিছনেই রুমা।

সুপ্রিয়কে সামনে পেয়ে বললেন, উনি রইলেন, ঠাণ্ডা লেগেছে বলে বেরুবেন না, আর রেশম রইলো। তুমি একটু দেখো বাবা, রেশমটা যেন বেরিয়ে না যায়।

খানিকটা এগিয়ে রুমাকে বললেন, তুই এগো।

বলেই ফিরে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয়কে বললেন, উনি এত কম আলোয় পড়তে পারেন না, তুমি বাবা ওঁকে একটু খবরের কাগজটা পড়ে শুনিও।

সুপ্রিয় একবার রুমার অপস্রিয়মান চেহারাটার দিকে

তাকালো, একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো, তারপর ঘাড় নেড়ে বললে, আচ্ছা।

আর সঙ্গে সঙ্গে কানে এলো, রুমা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে খিলখিল করে হাসছে আর বলছে, মা, মোরগটা কি রকম হাঁটছে দেখো।

সারা শরীর চিড়বিড় ক'রে উঠলো সুপ্রিয়র। মোরগ মোরগের মত হাঁটবে, তা দেখে এমন খিলখিল করে হাসবার কি আছে।

রুমা ততক্ষণে রাস্তায় পৌঁছে হাসি থামিয়ে মাকে ধমক দিতে শুরু করেছে, তুমি কি যে পাড়াগেঁয়েদের মত বাবা বাছা করো, 'ছেলে ছেলে' বলো কেন ওঁকে ?

শ্রীলেখা দেবী তা শুনে হেসে বললেন, দেখ রুমি, আমাকে সভ্যতা শেখাস না। তোর বাবা নয় অফিসর, আমার বাবা তো অফিসর ছিল না।

বোর্ডারদের ফিসফাস যে হিমাদ্রিবাবুর কানে যায়নি একেবারে তা নয়। তাঁর সামনে যদিও তেমন ভাবে কেউ বলে নি, তবু ঠাকুর চাকরদের কাছ থেকে কিছু কিছু শুনেছেন তিনি। দু'বেলা ভাতের থালা নামিয়ে দেওয়ার পরেই নাকি সকলের মুখ ব্যাজার হয়। কেউ কেউ দু'একটা রসিকতাও করে। কিন্তু সে-সবকে এতদিন আমল দেন নি হিমাদ্রিবাবু। আমল দিলে চলেও না। পান্থপাদপ হোটেল অ্যাণ্ড স্যানাটোরিয়ামের বাড়িটা তো তাঁর নিজের নয়। ভাড়া গুণতে হয় সারা বছর। অথচ বোর্ডার যা-কিছু জোটে তা তো এই শীতের সময়টুকুতে। এদিকে দিনকয়েক হলো শীতও কমে আসছে। তা মাঘ শেষ হয়ে ফাল্গুন পড়ি পড়ি, শীত তো কমছেই। যা রুজি রোজগার এখনই করে নিতে হবে। এত কম

'চার্জে যা খেতে দিচ্ছি এই যথেষ্ট, হিমাদ্রিবাবু মনে মনেই বললেন, তোরাই ভার নিয়ে দেখ না।

মনটা ভালো ছিল না হিমাদ্রিবাবুর। বিশেষ করে দুধকুণ্ডের জল আনা নিয়ে কৌতুকীকে দু'কথা শোনানোর পর থেকে। সত্যিই তো, বেচারীর দোষ নেই। নিজের চোখেই তো দেখেছেন হিমাদ্রিবাবু, কি খাটাই না খাটে ও। তার বদলে মাইনে তো একরকম দেন না বলতে গেলে। দিতে পারেন না। তবু সারাটা জীবনই তো ও কাটিয়ে দিলো এই হোটেলে। স্বামী ছেলে মারা যাওয়ার পর কবে সেই বিধবা মেয়েটা এসে ঢুকেছিল, একটা দিনের জন্যে ছুটি নেয় নি। হোটেলই যেন ওর সর্বস্ব।

অনুশোচনা হলো হিমাদ্রিবাবুর। বেচারীকে অত কথা না শোনালেই হতো। বোর্ডাররা না চটে যায় আবার। দুদিনের জন্যে আসে সব, ঝি-চাকরের ওপর কত দরদ। নিজেরা তো বাপু বাড়ির ঝি-চাকরদের সঙ্গে এর চেয়েও খারাপ ব্যবহার করিস্, কাজ ছেড়ে চলে যাবো না-বললে একটা টাকা মাইনে বাড়াস না।

কিন্তু চোরের ওপর রাগ করে তো মাটিতে ভাত খাওয়া যায় না। অতএব বোর্ডার রাগ করলেও তাকে খুশী করতে হবে। সিনেমা অভিনেত্রী গায়ত্রী দেবী আর তাঁর মা এসে পৌঁছলে এগারো নম্বরটা খুলে দেওয়া যাবে, সুশান্তবাবু চলে যাওয়ার পর থেকে ঘরটা খালিই আছে। সুশান্ত রেজ, গৌরী দেবী আর ছেলে বাদল—বেশ একটা ফ্যামিলি পেয়েছিলেন। বেশ ক'দিন ছিল।

এদিকে তেরো নম্বরে একটা সীট খালি পড়ে আছে—অন্য সীটটায় থাকে ওই পাঞ্জাবী মেয়েটা। কদিন থাকবে কে জানে।

খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা একটু ভালো করলে সকলেই হয়তো থাকবে কিছুদিন। তাই দুপুরের ট্রেনে কটক চলে গিয়েছিলেন

হিমাদ্রিবাবু। ফুলকপি, টমাটো, মটরশুঁটি আর একটা সের-পাঁচেকের রুই মাছ কিনে বিকেলের বাসে ফিরছিলেন।

বাসটা সোজা ক্যাপিটেল অর্থাৎ নতুন শহর অবধি যায়, তারপর সেখান থেকে পুরীর দিকে।

হিমাদ্রিবাবুর হোটেলের সামনে দিয়েই যেতে হয় বাসটাকে, মালপত্র নামানো সুবিধে। আর বাসের ড্রাইভারও চেনাজানা লোক, ভাড়া লাগে না। তাই ট্রেনের বদলে বাসে ফিরছিলেন।

ভগবান যখন দেন তখন বুঝি এমনি করেই দেন।

হিমাদ্রিবাবু বাসের মাথায় ঝুড়ি দুটো তুলে দিয়ে সবে এসে বসেছেন সীটে, বাস ধুলো উড়িয়ে চলতে শুরু করেছে, অমনি পিছন থেকে এক বুড়ির গলা শুনতে পেলেন।—হ্যাঁ গা ডাইভার, ঠিক যাবে তো ভুব্‌নেশ্বর ?

কণ্ডাক্টর বললে, যাবে বুড়ি মা, যাবে। আপনি বসুন তো চুপ করে।

হিমাদ্রিবাবু ফিরে তাকিয়ে বুড়িকে এক চোখ দেখে নিয়েই আবার মনে মনে হিসেব কষতে শুরু করলেন।

হিসেবই কষছিলেন, কত খরচ হলো মোট। আর দৈনিক বরাদ্দের চেয়ে কত টাকা বাড়তি খরচ।

খানিক পরেই আবার গলা শুনলেন বুড়ির।—ও ডাইভার, ভুব্‌নেশ্বর ছেড়ে গেলে নাকি, নামিয়ে দিতে বললাম যে।

বাসসুদ্ধ লোক হেসে উঠলো বুড়ির কথায়। আর কণ্ডাক্টর বললে, সে এখন অনেক দেরী।

হিমাদ্রিবাবুও হেসেছিলেন। এবার জানালা দিয়ে আশপাশটা দেখে নিলেন। বাসটা জোর ছুটেছে পীচের রাস্তা ধরে।

আবার মিনিট কয়েক কাটলো, তারপরই বুড়ি আবার বললে, আমি ভুব্‌নেশ্বর যাবো, মনে আছে তো, ও ডাইভার।

হিমাদ্রিবাবু এবার আর থাকতে পারলেন না, মুখ ফিরিয়ে বললেন, আপনি বসুন চুপ করে। আমিও ভুবনেশ্বর যাবো, নামিয়ে দেবো আপনাকে।

বুড়ি নিশ্চিন্ত হয়ে বসলো। হাতের সুটকেশ আর বিরাট পুঁটলিটা টেনে নিলো কোলের কাছে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ।

বাসটা দৌড়তে দৌড়তে এসে হঠাৎ মাঝপথের একটা বাজারের মধ্যে দাঁড়াতেই বুড়ি স্যুটকেশ আর পুঁটলি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। —ও ডাইভার, একটু দাঁড়াও। বললাম না ভুবনেশ্বরে নামবো।

হিমাদ্রিবাবু এবার উঠে এলেন বুড়ির কাছে, বললেন, বসুন আপনি, এটা ভুবনেশ্বর নয়।

—নয়? হতাশ হয়ে ধুপ করে বসে পড়লো বুড়ি।

হিমাদ্রিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় উঠবেন আপনি?

বুড়ি ফোকলা মাড়ি বের করে হাসলো।—আমি যাই বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে। কোথায় উঠবো তা কি আমি জানি বাবা, সিদ্ধেশ্বর যেখানে ওঠাবেন।

বুড়ির কথাবার্তা আর চেহারা দেখে হিমাদ্রিবাবু ধরেই নিয়েছিলেন, এ নির্ঘাৎ তীর্থযাত্রী, তাই বললেন, ধর্মশালায় জায়গা পেলে হয়, যা ভীড় এখন।

—ধর্মশালায়? চোখ কপালে তুললো বুড়ি।—না বাবা, ধর্মশালায় থাকতে পারবো না, মুচি মুদ্দোফরাস হাজার জাত আসছে যাচ্ছে···

হিমাদ্রিবাবু বললেন, আত্মীয়-স্বজন কেউ আছেন বুঝি ভুবনেশ্বরে?

—না বাবা, সে-সব ঘুচিয়ে এয়েছি বলেই তো আজ সঙ্গে কেউ নেই। আমার কি কম ছিল গা। বিন্দে বলতো, কুমি, তোর

হিমাদ্রিবাবু বললেন, নামুন মা, ওই আমার হোটেল।

বলেই নীচে নেমে পড়ে হাঁকডাক করতে লাগলেন কৌতুকীর উদ্দেশ্যে। —কৌতুকী! কৌতুকী রে, মালগুলো নামাই লই যা তর্ করি।

কৌতুকী ডাক শুনেই বেরিয়ে এলো হাসিমুখে।

হিমাদ্রিবাবু বললেন, তণ্ডাতড়ি, তণ্ডাতড়ি।

ওড়িয়া ভাষাটা ভালই জানেন হিমাদ্রিবাবু, জানবার কথাও। সারাটা জীবনই তো কেটে গেল এখানে। বাঙালীদের নিয়ে তাঁর কারবার, কিন্তু এখানকার ওড়িয়াভাষী লোকদেরই বেশী আপন মনে করেন। তবু মনটা যেদিন বেশী প্রফুল্ল থাকে, সেদিন ইচ্ছে করেই ওড়িয়া ভাষাটাকে বিকৃত করে কথা বলেন।

তা শুনে কৌতুকী, ত্রিলোচন, চৈতন্য—এরা সব হাসে। হাসে, আবার বোর্ডারদের সঙ্গেও এমনি বিকৃত ভাষাতেই কথা বলে। বাংলা আর ওড়িয়ার মাঝামাঝি একটা ভাষায়। কারণ, ওদের মুখের আসল ভাষাটা অনেকেই বুঝতে পারে না।

এতক্ষণ বুড়ির দিকে মন দিতে পারেননি হিমাদ্রিবাবু। এবার ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, কণ্ডাক্টরের সঙ্গে রীতিমত ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে বুড়ি।

—ও ডাইভার, বলি মটরটা ভেতরে নিয়ে চল না। হোটেলের দরজার কাছে নিয়ে চলো।

কণ্ডাক্টর হাসে আর বলে, না বুড়ি মা, এখানেই নামতে হবে, ভিতরে যাবে না, এ তো ট্যাক্সি নয় যে বাড়ির দরজায় পৌঁছে দেবে।

বুড়ি সকলের মুখের দিকে তাকায় আর বলে, এ কি অত্যোচার বাপু। ভাড়া নিলে গুণে গুণে আর দরজা অবধি পৌঁছে দেবে না? এই তো এটটুকু পথ, ও হোটেলআলা—

বাসসুদ্ধ সকলেই হেসে উঠল, আর হিমাদ্রিবাবু এগিয়ে এসে বুড়ির মালপত্র তুলতে গেলেন।

বুড়ি অমনি হাঁ হাঁ করে উঠল।—ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা। বিধবা মানুষের চাল-চিঁড়ে বাঁধা আছে····

বলে নিজেই মোটগুলো সামলেসুমলে নেমে পড়লো, আর বাসটা স্টার্ট দিতেই একটা ফাজিল গোছের ছোকরা যাত্রী সুর করে গেয়ে উঠলো, 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু, ওইখানে থাকো'····

বুড়ি তা শুনতে পেলো না, শুনলেও ঠাট্টা বলে বুঝতে পারতো না।

হিমাদ্রিবাবুর পিছনে পিছনে বুড়ি উঠে এলো দোতলায়। তেরো নম্বর ঘরের সামনে।

শিখিনী সান্ধ্যভ্রমণে বের হবার জন্যে সাজগোজ করছিল। আর শিখিনীর সাজগোজ! একে বয়সটাই তার পুরো যৌবন, তার ওপর সাজসজ্জার বহরটাও বেশী। নাইলনের সাড়ী, চুমকি-বসানো লাল টকটকে চোলীর নীচে বিঘৎখানেক ফর্সা ধবধবে পেট, মায় নাভিকুণ্ড পর্যন্ত, গালে রুজ, ঠোঁটে রঙ···শিখিনী আড়-চোখে তাকিয়ে দেখলে বুড়িকে।

হিমাদ্রিবাবু পাশের তক্তপোশটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এই আপনার সীট। আর এই নিন চাবি।

বুড়ির দিকে তাকিয়ে, তার হাতের পুঁটলি আর রঙচটা সুটকেশটার দিকে তাকিয়ে শিখিনী নাক সিঁটকোলো। মনে মনে চটলো হিমাদ্রিবাবুর ওপর।

বিরক্তিতে চেয়ারটার ওপর ধুপ করে বসে পড়লো একবার, উঠে দাঁড়ালো, হতাশার একটা অস্ফুট শব্দ বের হোলো তার গলা থেকে, তারপর হিমাদ্রিবাবুকে বললে, তো তালা খোলা রেখে ঘুমনে যাবো?

হিমাদ্রিবাবু বললে, মা, যখন বাইরে বেরুবেন ভালো করে চাবি দিয়ে যাবেন। একটা চাবি আপনার কাছে রইলো, আরেকটা ওঁর কাছে।

শিখিনী বুড়িকে তার দিকে কটমট করে তাকাতে দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল, তারপর শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেল।

শিখিনী বেরিয়ে যেতেই বুড়ি বললে, কোথায় এনে ফেললে বাছা, বাইজী নাকিন ?

—না, না, পাঞ্জাবী। ও থাকবে না বেশীদিন···

বুড়ি জানালা দিয়ে থক্ করে থুতু ফেলে বললে, ঘেন্নায় মরে যাই, লাজলজ্জাও নেই বাপু। ধিঙ্গি মেয়ে···তা কার সঙ্গে এয়েছে এখানে ?

—একাই।

—একা ? দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো বুড়ির।—একা ? ও বাপু তা হলে নিঘ্যাৎ নষ্ট মেয়ে। এখানে ওকে জায়গা দিয়ে ঠিক করোনি বাছা। তোমার পান্তোভাত হোটেলের দু'নামের এক শেষ করে ছাড়বে ও মেয়ে। তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও।

হিমাদ্রিবাবু শুনেও শুনলেন না। ছুটলেন তরীতরকারীর ঝুড়ি ভাঁড়ারে ঢুকিয়ে চাবি দেবার জন্যে। ঠাকুর চাকরগুলোকে বিশ্বাস নেই এতটুকু, এখনই হয়তো সরিয়ে ফেলবে। আর মাছটাও নিজের চোখের সামনে কাটতে বলবেন। মাংসের টুকরো গুণে দেন রোজ, মাছের খান হিসেব মত করে দেবেন না ? কিন্তু হিসেব মত করে দিলেই বা কি হবে, রাঁধুনী বামুনটা কি চালাক কম। স্রেফ খুন্তিতে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একটা খানকে দুটো করে ছাড়বে।

মাছ কোটবার জন্যেই হাঁক পাড়লেন কৌতুকীর উদ্দেশে।—ও কৌতুকী, কৌতুকী, যৌতুকী, হরতুকী। ও ভৌতুকী।

মনটা যেদিন খুব খুশী খুশী থাকে সেদিন কৌতুকীর নামের

সঙ্গে মিল রেখে যতগুলি শব্দ মনে পড়ে একনাগাড়ে ডেকে যান হিমাদ্রিবাবু। পদ্য লেখার মত। হাজার হোক্, রসকষ কি তাঁর মনে ছিল না কোনদিন? তা হলে পান্থপাদপ নাম রেখেছিলেন কেন এ হোটেলের।

মনটা বেশ ভালই ছিল বোর্ডারদেরও। বিশেষ করে মিসেস ভট্চায আর তাঁর স্বামী ব্রজমাধববাবুর। রাত্রির আহারটা বেশ যুৎসই হয়েছে। দু'তিনটে তরকারী ছাড়াও বড় বড় দুটো করে খান দিয়েছে মাছের। মাছটাও ভালো।

ভূরিভোজনের পর ঢেঁকুর তুলতে তুলতে ঘরে ঘরে একবার করে উঁকি দিয়ে এসেছেন মিসেস ভট্চায, বলেছেন, দেখেন আপনারা, ইউনাইট করলা কাজ অয় কি না অয়। হিমাদ্রিবাবু যে হিমাদ্রিবাব, হাড় কঞ্জুস, মাছ খাওয়াইল কিনা।

সুপ্রিয়র সারা মন বিরক্তিতে বিষিয়ে ছিল। সন্ধ্যেটা নষ্ট হয়েছে তার, বাইরে একবারও বেরোতে পায় নি। মিষ্টার সেনকে খবরের কাগজের সম্পাদকীয় পড়ে শোনাতে হয়েছে। রুমারা ফিরেছে রাত নটায়। ক্যাপিটেলের দোকান থেকে একরাশ জিনিসপত্তর কেনাকাটা করে। তারপর ছুটি পেয়েছে সুপ্রিয়।

তাই মিসেস ভট্চাযের কথা শুনে বিরক্ত হয়ে বললে, মাছ খাওয়াটাই কি সব? সেইজন্যেই এসেছি এখানে?

মিসেস ভট্চায হাসলেন।—কি খাওয়নের বাসনা আপনাগো তা জানি, আইবুড়া বয়সের ক্ষিদা আর···

আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন মিসেস ভট্চায, প্রফেসর ঘোষ অপছন্দের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাতে কথাটা শুধু অর্থপূর্ণ হাসিতেই শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজে শেষ হতে দেবেন কেন মিসেস

পুঁটুলির মধ্যে চাল চিঁড়ের সঙ্গে একটি পাতলা কাঁথা আর ক্ষুদে বালিশ সম্বল করে এসেছে বুড়ি তীর্থ করতে। তা শুনে হিমাদ্রিবাবুর স্ত্রী বেলুকে দিয়ে সন্ধ্যেবেলায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন বুড়িকে। চিক দিয়ে আড়াল করা নিজেদের ঘরটিতে।

তারপর একখানা তোষক, একটা বালিশ আর একটা কম্বল দিয়েছিলেন।—আপত্তি না থাকে তো যে-ক'দিন আছো মা, এগুলো ব্যবহার ক'রো। যা শীত এখানে।

বুড়ি হেসেছিল সে-কথা শুনে। বলেছিল, আমাকে কি শয্যা-সুখ দেবে গো এই লেপ তোষক? গায়ে বাজবে কাঠের তক্তায় শুতে, তাই তোষক দিচ্ছো মা, কিন্তু বুকের ভেতর যে দিনরাত বিঁধছে তার তোষক কে দেবে বাছা। জোয়ান জোয়ান পাঁচ বেটা আমার, এক এক বেটা পাঁচশো বিঘে লাখেরাজ। তাই যখন ভগমান নিয়ে নিলেন....

ডুকরে কেঁদে উঠেছিল বুড়ি স্বামী-পুত্রের শোকে। কিন্তু তোষক কম্বল নিতে রাজি হয়েছিল শেষ অবধি।

নিতে রাজি না হ'লে কি মুখ্যুমিই না হতো, মনে মনে ভাবলে বুড়ি, শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে কম্বলে মাথা অবধি ঢেকে দিয়ে।

ঘুম এলে তবু শীতের কাঁপুনি কমতো। কিন্তু বুড়ো বয়সে এমনিতেই ঘুম আসতে চায় না, তার ওপর এ আবার কি উৎপাত! যতবার চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করে বুড়ি, তন্দ্রা আসে, অমনি পাশের ঘর থেকে আওয়াজ আসে খটাখট খটাখট।

শব্দটা কিসের বুঝতে না পেরে বুড়ি এপাশ ওপাশ করলো। একবার উঠে বসলো, আবার শুয়ে পড়লো। কিন্তু ভয় গেলো না। কান পেতে রইলো শব্দটা শোনার জন্যে। প্রথমটা ভেবেছিল ইঁদুর ঢুকেছে ঘরে হয়তো, পুঁটুলির চাল চিঁড়ে টানাটানি করছে।

না, তেমন শব্দ তো নয়। তবে কি ছাদের ওপর প্যাঁচা নয়তো চামচিকে ?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বুড়ি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল, গলা শুকিয়ে এলো। ব্রহ্মদৈত্য নাকি ? হ্যাঁ, খড়ম পরে হাঁটছে যেন ছাদের ওপর—খটাখট্ খটাখট্ শব্দ যখন, খড়মের শব্দই হবে হয়তো।

ভয়টা আরো বেড়ে গেল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মন্ত্র পড়ছে যেন ব্রহ্মদৈত্যটা। এই তো খটাখট্ খটাখট্ হাঁটছে কয়েক পা, তারপরই বিড়বিড় করে কি বলছে।

ভয়ে আতঙ্কে দাঁত কপাটি লেগে গেল বুড়ির, চোখ বুজে পড়ে রইলো মড়ার মত, আর চুপচাপ নির্জীবের মত পড়ে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম ভাঙলো যখন, তখনও আকাশ ফর্সা হয় নি। চারিদিক অন্ধকার। ওদিকের তক্তপোশে মশারি খাটিয়ে ঘুমোচ্ছে শিখিনী।

সারা শরীরে ব্যথা, সারা শরীর টনটন করছে। একে ঘুম হয় নি, তার ওপর ভয়।

শুয়ে শুয়েই বুড়ি শুনতে পেলো পাশের ঘরে কে যেন চেঁচাচ্ছে।

—মিস্ত্রী, ও মিস্ত্রী। আরে সকাল হয়ে গেছে, উঠে পড়ো ব্রাদার।

কিছুক্ষণ পরেই বুঝলো, লোকটা মুখ ধুচ্ছে। জিবছোলার পর কেমন একটা বিচ্ছিরি অক্ অক্ শব্দ করছে।

তা করুক, রাত্তিরে ভালো ঘুম হয় নি, ভোররাতে ঘুমটা পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করলো বুড়ি। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই খটাখট খটাখট শব্দ।

ও হরি, ব্রহ্মদৈত্যটৈত্য নয়। ওই পাশের ঘরের লোকটাই কি যেন করছে। খটাখট খটাখট শব্দ করছে, আর কি পড়ছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে।

বুড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। না, ঘুমোতে দেবে না লোকটা। দরজা খুলে বেরিয়ে এলো সে। দেখলো, রাত ফর্সা হচ্ছে।

কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বারান্দায় এসে বসলো বুড়ি, হিমাদ্রিবাবুর দেওয়া তোলা-উনোনটার সামনে। বিধবা মানুষ, স্বপাক খাবার ব্যবস্থা তো নিজেকেই করতে হবে।

ঘুঁটে, দেশলাই, 'ক্রাচিন' সব আছে। কৌতুকী গতরাত্রেই দিয়ে গেছে।

উনোন পরিষ্কার করতে বসলো বুড়ি। গতরাত্রের রান্নার পর ছাইগুলো কাড়া হয়নি।

উনোন পরিষ্কার করে ছাইগুলো নিয়ে গিয়ে কলতলার কাছে ডাঁই করে রেখে এলো বুড়ি। তারপর তিনখানা ঘুঁটে আড়াআড়ি করে উনোনে বসিয়ে কেরোসিন ছিটিয়ে দিলে। দেশলাইটা জ্বেলে দিতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো, ছোট ছোট কয়লার টুকরোগুলো চাপিয়ে দিলো বুড়ি। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠলো, আর দমকা হাওয়ায় বুড়ি যত কাঁপে, ধোঁয়াও তত কাঁপে।

বুড়ি বড় বড় ছুটো কয়লার চাঙড় নিয়ে টুকটুক আবার কলতলায় গিয়ে একটা কাটারী তুলে নিয়ে কয়লা ভাঙতে বসলো। ঠুক ঠুক, ঠুক ঠুক।

কৌতুকী কোথায় ছিল, বেরিয়ে এসে বুড়িকে দেখে হাসলো। তারপর হাত থেকে দা'টা কেড়ে নিয়ে বললে, বুড়া মানুষ তুমি কোইলা ভাঙিব কাঁই, কৌতুকী কি মরি গলা ?

বুড়ি বুঝলো কি বুঝলো না, কৌতুকীর ওপর কয়লা ভাঙার ভার দিয়ে চলে এলো আবার ওপরে। নিজের ঘরটির সামনে। আসবার সময় একবার উঁকি দিয়ে দেখলো বারো নম্বর ঘরে।

একটা মিনষে ঘুমোচ্ছে মড়ার মত, আরেকটা টেবিলের সামনে বসে কি একটা যন্ত্রের ওপর আঙুল খোঁচাচ্ছে বারবার।

বুড়ি রেগেই ছিল শিবনাথবাবুর ওপর, লোকটা ঘুমোতে দেয়নি সারারাত। তাই দরজার এপাশ থেকেই টাইপরাইটারের চাবিতে আঙুল খোঁচানোর ভঙ্গিতে ভেংচি কেটেই সরে গেল।

শিবনাথবাবু টাইপ করাতেই ব্যস্ত ছিলেন, কে এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিল, কে তাঁকে অঙ্গভঙ্গি করে বিদ্রূপ করে গেল দেখতে পেলেন না। কিন্তু হাতটা কাজে ব্যস্ত থাকলেও নাকে তো ছিপি আঁটা ছিল না।

বেশ কিছুক্ষণ থেকেই ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছিলেন। নাক টানছিলেন, আর গন্ধটা কিসের তা বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। এবার চোখদুটো একটু জ্বালা করে উঠতেই ফিরে তাকালেন।

ভাঙা বাতাসে এক দমকা ধোঁয়া ঘরে ঢুকেছে তখন।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন শিবনাথবাবু। বাইরে বেরিয়ে এলেন, এবং তারপর তাঁর ঘরের পাশেই বারান্দায় উনোন ধরানো দেখে চোখ কপালে উঠলো তাঁর।

চেঁচাতে শুরু করলেন সঙ্গে সঙ্গে।—হিমাদ্রিবাবু, ও হিমাদ্রিবাবু।

খুরপি দিয়ে বেগুনের চারাগুলোর নীচে মাটি ঢিলে করে দিচ্ছিলেন হিমাদ্রিবাবু, যেমন প্রতিদিন করেন এ-সময়ে। ডাক শুনে খুরপি ফেলে এগিয়ে এলেন। ভাবলেন চায়ের জন্যেই বুঝি হাঁকডাক।

বললেন, চা হয়ে গেছে, দিচ্ছে। এক মিনিট।

রাগে ফেটে পড়লেন শিবনাথবাবু।—রাখুন আপনার চা। এটা কি হোটেল, না ধরমশালা, তাই বলুন। কি ভেবেছেন কি আপনি? গলা-কাটা চার্জ নেবেন আর পাণ্ডাদের মত যেখানে সেখানে যাত্রী বসিয়ে দেবেন!

হিমাদ্রিবাবু বুঝতে না পেরে নীচের উঠোন থেকেই প্রশ্ন করলেন, কেন, কি হলো কি স্যার?

হাজার হোক্, বাঙালী ঘরের বিধবা, তার ওপর সহায়সম্বলহীন বৃদ্ধা, একটু সহ্য করে নিন শিবনাথবাবু।

রান্নার জন্যে অবশ্য আপত্তি নেই শিবনাথবাবুর, আপত্তি ধোঁয়ার জন্যে। তা কৌতুকী যদি উনোনটা ধরে যাবার পর এনে দেয়...

আসলে আপত্তি করবার মত মনের জোরও আর ছিল না শিবনাথবাবুর। তাঁর টাইপরাইটারের দৌরাত্ম্যে যে বুড়ির ঘুম হয়নি, এবং অন্য বোর্ডারদেরও ঘুম হয় না, তা তাদের অট্টহাস্য শুনেই টের পেয়েছিলেন।

তাই মনমরা হয়ে ঘরে এসে বললেন, আজকের দিনটাই খারাপ যাবে, বুঝলে মিস্ত্রী! সকালে উঠেই চেঁচামিচি, দিনটা এখন ভালোয় ভালোয় গেলে বাঁচি।

মিস্ত্রী হেসে বললে, কল থাকলে একটু বিগড়ে যাবে বইকি মাঝে মাঝে, তা বলে মন খারাপ করবেন কেন স্যার! ও পাখা আপনার যেমন কখনো টিকটিক করে, ঢকঢক করে, স্পার্ক দেয়, তেমনি স্যার আমাদের খেয়েপরে বেঁচে থাকা। মন খারাপ করে সময় নষ্ট, তার চেয়ে একটু শিরীষ কাগজ ঘষে দিন, নয়তো কার্বনটা দেখুন পুড়ে গেছে কিনা, আর নয়তো অয়েল করে নিন, আবার ঠিক হয়ে যাবে।

শিবনাথবাবু হেসে ফেললেন।—মানে! মানুষও মেশিন নাকি তোমার কাছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ও দু'ই এক। অয়েল করে নেবেন একটু? বলে চোখের ইশারা করে তোষক তুললো মিস্ত্রী, একটি চ্যাপটা বোতল বের করলে।

—তাই বলো। বসে পড়লেন শিবনাথবাবু। বললেন, কাল বেশ গরম লাগছিল, আজ আবার যা ঠাণ্ডা পড়ে গেছে...তা

দাও একটু। এই একরত্তি—বলে দু'আঙুলে এমন একটা পরিমাণ দেখালেন যা হোমিওপ্যাথীর ডোজকেও হার মানায়।

মিস্ত্রী একটা হাতল-ভাঙা কাপে সামান্য একটু ঢেলে দিয়ে ঢকঢক করে নিজেও খানিকটা গিলে নিল।

শিবনাথবাবুও কাপটা সবে নামিয়ে রেখে ঠোঁট চাটছেন, শিখিনী এসে ঢুকলো।

—আরে শিউনাথবাবু, এ বুড়টি তো আমাকে হয়রাণ করছে দিনরাত। বিলকুল জংলী, বিলকুল জংলী।

শিবনাথবাবু তাড়াতাড়ি কাপটা সরিয়ে দিয়ে জিগ্যেস করলেন, কি হলো আবার ?

চোখে-জল-আনা হতাশার সুরে শিখিনী বললে, আমার ঘর তো বুড়টি রসুইখানা বানিয়ে দিল। ইধার চাবল, উধার মিরচা, আর দিনরাত পানি ঢালছে।

কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়। বুড়ি যত না রান্না করছে তার চেয়ে বেশী জল ঢালছে। সারা বারান্দা, সারা ঘর ধুচ্ছে বারবার। আর নিজের মনেই বিড়বিড় করছে। বিধবা মানুষ, নিজে রেঁধে খাবো দুটি, তা এ নষ্ট মেয়েটা দেবে না কিছুতে। যতবার ধুচ্ছি জল দিয়ে, ততবারই ছুঁয়ে দিচ্ছে। ছোঁয়া হচ্ছে না ? দু'গজ দূর দিয়ে যাতায়াত করলেও জলে জলে ছোঁয়াচ লাগছে যে।

শিখিনীর কথা শুনে হাসলেন শিবনাথবাবু, খানিকটা সান্ত্বনাও পেলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। কারণ বুড়ির স্পষ্ট কথা এবং বোর্ডারদের অট্টহাস শুনে শিবনাথবাবু একটু মনমরা হয়ে গিয়েছিলেন।

শিখিনী বুঝে নিলো, আড্ডা জমবে না। তাই চটি চট চট করে আবার বেরিয়ে এলো। তারপর ধোয়া বারান্দার ওপর দিয়ে চটির গোড়ালিতে জল ছিটোতে ছিটোতে বুড়ির উনোনের

কাছে এগিয়ে গিয়ে হাঁড়িতে উঁকি দিলো। বুড়িকে চটাবার জন্যেই।

বুড়ি চটেই ছিল। হাতা নেড়ে চেঁচিয়ে উঠলো।—তুমি বাছা আমাকে রাগিও না বলে দিচ্ছি, বেজাতের ছোঁয়া আমি খাবো না, না খেয়ে উপোস করে মরবো, তবু খাবো না।

শিখিনী প্রতিবাদে শুধু খিলখিল করে হেসে উঠলো, আর বুড়ি তা দেখে আরো রেগে গেল।

চেঁচামিচি শুনে রুমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াতেই শিখিনীর সঙ্গে চোখোচোখি হলো তার। আর শিখিনী হাসতে হাসতে লম্বা বারান্দার এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ছুটে গেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে রুমাকে বললে, আজব চীজ এ বুড়ি। খালি পানি ঢালছে বারাণ্ডায়।

রুমা ফিক করে একটু হাসলো, তারপর বললে, বিধবা মানুষ, কারও ছোঁয়া তো খায় না; কি দরকার ভাই রাগিয়ে?

শিখিনী বললে, বিধবা নয়, জংলী। আমি কি অচ্ছ্যুৎ আছি? 'অরোরা' আছি না আমি?

অরোরা বোরিয়ালিসের খবর তবু রাখে রুমা, কিন্তু অরোরা বংশের গৌরব কি করে জানবে। তবু সেটুকু গোপন করে বললে, অত সব কি বুড়ি জানে ভাই?

শিখিনীর গোপন উষ্মা এবার প্রকাশ হয়ে পড়লো। বললে, ও সব সমঝাবার বাত তো বলছি না বহেন, লেকিন আইন তো জানতে হবে। অচ্ছুৎকে ভি অচ্ছুৎ বললে জেল হয়ে যাবে আজকাল। বিলকুল জংলী, স্রিফ এক টুকরা ময়লা কাপড় পরবে, না চোলী না ব্লাউজ, আধা নাঙ্গা জংলীতো ও বুড়ি। খালি বকবক্ করে, আর পানি ঢালে।

রুমারও চোখে বুড়ির হাবভাব কথাবার্তা বেখাপ্পা লেগেছিল।

বিশেষ করে এই হোটেলের পরিবেশে। কারণ সকলেরই এখানে মোটামুটি সভ্যভব্য চালচলন। বুড়িকে এ হোটেলের চেয়ে ধর্মশালাতেই যেন মানাতো। তবু শিখিনীর কথাগুলো ভালো লাগলো না রুমার। বেশবাস ধরণধারণে শিখিনীর সঙ্গে ও নিজেকে প্রায় এক গোত্রের মনে করলেও হঠাৎ ওর মনে হলো, শিখিনী পাঞ্জাবী আর বুড়ি বাঙালী। একটুক্ষণের জন্যে হলেও ও বুড়ির সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে গেল। মনে হলো, একজন পাঞ্জাবী একটি বাঙালীকে উপহাস করছে 'জংলী' বলে।

রুমার চোখ দেখেই শিখিনী বুঝতে পারলো। বুঝলো, তার কথাগুলো রুমার কাছে খুব উপাদেয় ঠেকছে না। তাই টা টা করার ভঙ্গিতে হাতটাকে প্রজাপতি নাচিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল শিখিনী, হয়তো বাগানের গাঁদা ফুল তুলে খোঁপায় গুঁজতে।

ওপরের বারান্দা থেকে শিখিনীকে হেলে দুলে চলে যেতে দেখে রুমা নিজের মনেই বললে, কি আমার সভ্যরে।

বলে ধীরে ধীরে ছ'নম্বরের এপ্রান্ত থেকে তেরো নম্বরের ওপ্রান্তে গিয়ে হাজির হলো।

তারপর চটিজোড়া খুলে রেখে জিগ্যেস করলে, যাবো ঠাকুমা? বেশ মিষ্টি করেই বললে।

বুড়ি ফিরে তাকালো, ফোকলা মাড়ি বের করে হাসলো। তারপর বললে, আয় মা আয়। লক্ষ্মী মেয়ে আমার, কোন ঘরে আছো মা তোমরা?

রুমা আদুরে গলায় বললে, ঐ শেষ ঘরটায়, ছ-সাত নম্বরে। ঠাকুমা সব ছুঁয়ে দিলাম তো আপনার?

—না মা না। অত দূরে রয়েছো, ছোঁয়া হবে কেন?

রুমা বললে, বাঃ রে, জল শুকোয় নি যে বারান্দার।

বুড়ি হাসলো, সরল হাসি।—দেখো মা, তবেই দেখো ভদ্দরঘরের বাছবিচার। তা তুমি মা ভদ্দরঘরের মেয়ে, ছুঁলেও দোষ নোবো কেনে! কিন্তু ঐ যে ধিঙ্গি মেয়েটা, কি জাত কে জানে, কথাবার্তা তো বলে কাঠখোট্টা ধরণের, তা খাবার জিনিস মা, রান্নার হাঁড়িতে ছুট ছুট করে জুতোর জল ছিটিয়ে দিলি, জ্ঞানগম্যি নেই এতটুকু?

রুমা সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললে, ওদের কথা ধরতে নেই, বাঙালী তো নয়, পাঞ্জাবী।

—পাঞ্জাবী? চোখ কপালে তুললো বুড়ি। ঐ যাদের মরদগুলো মেয়েদের মত চুল রাখে? ইয়া ইয়া দাড়ি রাখে? গুণ্ডোর মত শরীর হয়?

রুমা হেসে ফেললো। বললে, হ্যাঁ।

বুড়ির কপালে এমনিতেই ভাঁজ পড়েছে অসংখ্য, সেই কপালও কুঁচকে উঠলো। বললে, তা সে যাই হোক মা, ও মেয়ে তোমার ভাল নয়, দেখে নিও। ও নষ্ট মেয়ে।

রুমা বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকালো বুড়ির মুখের দিকে।

বুড়ি তার ছানি পড়া চালশে ধরা চোখে কেমন একটা সবজান্তা ভঙ্গি করলো। বললে, ও আমি প্রথম দেখেই বুঝেছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, বেহায়ার মত সাজসজ্জা কি? লজ্জাশরম নেই মা এতটুকু? একা একা এসেছিস, ধিঙ্গির মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, হোটেল বলে জায়গা, সেখানে একা থাকছিস কি করে? নষ্ট মেয়ে না হলে এমন কেউ পারে, তুমিই বলো তো মা?

সায় পাবার আশায় বুড়ি তাকালো রুমার দিকে। কিন্তু এ-কথায় সায় দিতে পারলো না রুমা। সেই শিখিনী যখন বুড়িকে জংলী বলেছিল তখন যেমন আহত বোধ করেছিল সে, অস্বস্তি লেগেছিল, রাগ হয়েছিল, ঠিক তেমনি। এ আবার কি কথা?

বুড়ি নিজেও তো একা একাই এসেছে। শিখিনী না-হয় পেটখোলা চোলী পরেছে, কিন্তু শিখিনীর কথাও তো ফেলনা নয়, বুড়ি যে তাও পরেনি। পাড়াগাঁয়ের কত মেয়ে তো কম বয়সেও সায়া ব্লাউজ পরে না, পরতো না। অথচ সেটা অসভ্যতা নয়?

রুমা তাই আপত্তি করে বললে, ও-কথা কেন বলছেন? মেয়েটা ভালো।

—ভালো? ভালো মেয়ে অমনি বাইজীদের মত সাজগোজ করে? রঙ মাখে?

রুমা কথাটা শুনেই আড়চোখে একবার নিজের পোশাকটা দেখে নিলো। যাক্, যথেষ্ট আধুনিক হলেও শিখিনীর মত অতখানি উগ্র সাজ নয় তার। হলে না জানি কি বলতো বুড়ি।

রুমা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বুড়ি মুখটা রুমার কানের কাছে নিয়ে এসে চাপা গলায় বলে উঠলো, দেখো মেয়ে, আমার চোখ এড়িয়ে চলা শক্ত। ভালো যদি, তো ঐ মিনষেটা, ঐ যে সারারাত কি একটা যন্তর নিয়ে খট্ খট্ খট্ খট্ করে—ওর সঙ্গে এত ফষ্টিনষ্টি কেন বাপু তার?

শিবনাথবাবু শুনতে পেলেন কিনা এই আতঙ্কে ফিরে তাকালো রুমা। আর ফিরে তাকাতেই চোখে পড়লো বারান্দার ওপ্রান্তে মা বেরিয়েছে ঘর থেকে।

দেখতে পেয়েই রুমা বললে, ডাকছো মা? যাচ্ছি, যাচ্ছি। বলে ছুটে পালালো।

শ্রীলেখা দেবী মেয়েকে ডাকবার জন্যে বেরোন নি ঘর থেকে, ডাকেন নি। তিনি শুধু বেরিয়ে খোঁজ নিচ্ছিলেন রুমা গেল কোথায়। মেয়ের ওপর তাঁর যে অটল বিশ্বাস ছিল তা ভেঙে গেছে, এখন সারাক্ষণ চোখেচোখে রাখতে চান। প্রফেসর ঘোষ লোকটাকে তাঁর প্রথম দর্শনেই পছন্দ হয় নি। আর প্রথম দর্শনেই

মনে হয়েছে এ লোকটার যা চেহারা আর বয়স, রুমা না জানি কি করে বসে।

সুপ্রিয়র কথা অবশ্য ভাবেন না শ্রীলেখা দেবী। ছেলেটি ভালো, বেশ বিনয়ী, মিশুকে। কিন্তু ওর চেহারাটা তেমন কিছু আহা-মরি নয়। বয়সও প্রায় রুমার সমান সমান। তা ছাড়া খবর নিয়ে জেনেছেন, ছেলেটি বি-এ পাশও করে নি। সুতরাং ওদিক থেকে ভয় নেই। সুপ্রিয়কে নিশ্চয় রুমার মত মেয়ে মন দিয়ে বসবে না। অত বোকা নয় রুমা। কথাটা মনে হতেই ফিক করে হেসে ফেললেন শ্রীলেখা দেবী। সুপ্রিয়কে ভালবেসে ফেলবে রুমা? রুমার মত সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে? অসম্ভব!

রুমা অবশ্য অতশত মায়ের মনের খবর জানতো না। মাকে দেখে সে বুড়ির কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচলো।

এসে হাসতে হাসতে বললে, জানো মা, বুড়ির ধারণা সাজগোজ করলেই সে খারাপ মেয়ে। বলে কি, ঐ শিখিনী, পাঞ্জাবী মেয়েটা? ও নাকি খারাপ মেয়ে, পেট খোলা ব্লাউজ পরেছে কিনা।

শ্রীলেখা দেবী হেসে বললেন, বুড়ো মানুষ, বলবেই তো। তা ওর ঐ সাজগোজ আমারও খারাপ লাগে।

রুমা হেসে উঠলো খিলখিল করে।—তুমি মা হোপলেস। তুমিও পাড়াগেঁয়ে রয়ে গেলে।

শ্রীলেখা দেবী হাসলেন।—কি করবো বল। আমি যে আধা-শহরেই ছিলাম, আমার বাবা তো অফিসর ছিল না। তোর বাবার পাল্লায় পড়েই না বদলেছি, আর তোর পাল্লায় পড়ে এত সাজগোছ।

—তা বলে নাইলন পরলেই খারাপ বলবে? আমারও তো আছে একটা।

শ্রীলেখা দেবী মুচকি হেসে বললেন, যখনকার যা। বিয়ের পর আমি হাতায় ফুল দেওয়া পুরো হাতা ব্লাউজ পরতাম, সেমিজ পরতাম, তাই শাশুড়ীর কথা শুনেছি। মেম সাহেব। ফিরিঙ্গীয়ানা বেহায়া—এমনি কত কি বলতেন।

রুমা হেসে হাততালি দিয়ে উঠলো।—বাঃ রে, বেশ তো। গা ঢাকলেও বেহায়া, না ঢাকলেও বেহায়া? আসলে আমার কি মনে হয় জানো মা? বুড়িগুলো আমাদের দেখতে পারে না।

শ্রীলেখা দেবী বললেন, আর ছুঁড়িগুলোও তো বুড়িদের দেখতে পারে না।

—মা! গর্জ্জন করে উঠলো বললেই ঠিক বলা হয়। রুমা বেশ বিরক্তির কণ্ঠে বললে, ছুঁড়ি আবার কি কথা? তোমার ঐ পাড়াগেঁয়ে কথাবর্তা শোধরানো গেল না।

শ্রীলেখা দেবী হেসে বললেন, বেশ বাপু, আর বলবো না।

কথাটা তিনি যেন চাপা দিতে চাইলেন। এবং মনে হলো রুমা তাঁকে যতখানি ভয় করে, তিনিও যেন রুমাকে তার চেয়ে কম ভয় পান না। পাছে রুমা তাঁর এই অ-শহুরে উক্তিটা বাপের কানেও তোলে, পাছে মিস্টার সেনের কাছে একটা তীব্র ভৎর্সনা শুনতে হয়, এই ভয়ে চাপা দেবার চেষ্টা করলেন শ্রীলেখা দেবী। এবং সেকারণেই জিগ্যেস করলেন, হ্যাঁ রে, কোণারক যাবার কি হলো? যাবি না?

সকালের স্নান-খাওয়া সেরে প্রতিদিনের মতই শিবনাথবাবু তাঁর মিস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রিক্সায় চেপে বসলেন। বললেন, চলো ক্যাপিটেল।

ক্রিং ক্রিং ঘন্টি বাজিয়ে রিক্সাওয়ালা নতুন শহরের উদ্দেশে

শ্রীলেখা দেবী আর রুমার বাবা নিশ্চয় কোণারক মন্দিরের চূড়ায় উঠবেন না। রমণীবাবু বুড়ো মানুষ, চোখে দেখেনা ভাল করে. দু'পাক দিয়েই থেমে পড়বে, কিংবা নেমে পড়বে। এক শিখিনী, তা সে অন্য জাত। তাকে লজ্জাও নেই। আর রেশম? শ্রীলেখা দেবীর যেমন ছেলে-অন্ত প্রাণ, রেশমকে নিশ্চয়ই ওপরে উঠতে দেবেন না, পাছে পা পিছলে পড়ে যায়।

সুতরাং কোণারক মন্দিরের চূড়ায় শুধু সুপ্রিয় আর রুমা, রুমা আর সুপ্রিয়।

সুপ্রিয় তখন বলবে....রুমা উত্তর দেবে...। সুপ্রিয় অভিমান দেখাবে...রুমা অভিমান ভাঙাবে। সুপ্রিয় চূড়া থেকে লাফ দিতে যাবে, আর রুমা দুহাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলবে...। কান্নায় দুচোখ ভেসে যাবে রুমার। আর সুপ্রিয় তখন তাকে আলিঙ্গন করে বলবে...ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু কল্পনা করে রেখেছিল সুপ্রিয়।

কিন্তু প্রফেসর ঘোষ সঙ্গে যাবেন শুনেই তার সব উৎসাহ উবে গেল। কারণ, এই কাঠখোট্টা চেহারার, অর্থাৎ স্বাস্থ্যবান চেহারার মানুষটার যখন শিল্পটিল্প নিয়ে এত আগ্রহ, ও চূড়া পর্যন্ত উঠবেই। আর শুধু তাই নয়, এ-সব সম্পর্কে লেকচারও দেবে অনর্গল। লেকচারকে সুপ্রিয়র ভয় নয়, না শুনলেই হলো। কিন্তু সে না শুনলে কি হবে, রুমা নিশ্চয়ই শুনবে, আর যত শুনবে ততই ভাববে না-জানি কত পণ্ডিত ঐ প্রফেসর ঘোষ। মেয়েগুলোও এমন বোকা, তিনখানা বই মুখস্থ করেছে হয়তো কেউ, অমনি তাকে পণ্ডিত ভেবে বসবে। ইচ্ছে থাকলে কি সুপ্রিয়ও মুখস্থ করতে পারতো না দু'চারখানা বই। ছোটবেলায় মুখস্থ করেনি সেই রবীন্দ্রনাথের: আজি এ প্রভাতে রবির কর, কেমনে ঢুকিল প্রাণের ভিতর।

চোখ বুজে এমনি সব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন অস্ফুটে কবিতাটা গুনগুন করে উচ্চারণ করে ফেলেছে সুপ্রিয়, সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল হাসি।

চমকে ফিরে তাকালো সুপ্রিয়। দেখলে চেয়ারের ঠিক পিছনটিতে রুমা দাঁড়িয়ে হাসছে।

—হাসছো যে! রীতিমত উষ্মা তার কথায়।

রুমা আরো হেসে বললে, কবিতা আবৃত্তি করছেন, অথচ…

রুমার কথা শেষ হওয়ার আগেই কপট ক্রোধে তাকালো সুপ্রিয়, রুমার মুখের দিকে। বললে, আবার?

রুমা ফিক করে হাসলো।—বেশ, বেশ। করছেন নয়, করছো!

এবার খুশী হলো সুপ্রিয়। প্রশ্ন করলে, আবৃত্তি ভুল হয়েছে?

রুমা হঠাৎ কথার সুতো ছিঁড়ে দিয়ে বললে, এই! কোণারক যাওয়ার কি হলো কি? তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করো। তখন তো রোজ তাড়া দিচ্ছিলে।

সুপ্রিয় কিন্তু কিন্তু করে বলল, আরেকজন না হলে….

—বাঃ রে, আরেকজন তো হয়েই গেছে। প্রফেসর ঘোষ তো যাবেন বলেছেন।

প্রফেসর ঘোষ! নামটা শুনলেই সারা শরীর চিড়বিড় করে ওঠে সুপ্রিয়র।

রেগে গিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল সুপ্রিয়। তার আগেই দাঁতে পাইপ চেপে গলায় মাফলার জড়িয়ে রুমার বাবা এসে হাজির হলেন।—তা হলে কবে ঠিক করা হলো, কোণারক?

সুপ্রিয় বয়সে রেশমের মাসতুতো দাদা পশমের চেয়েও ছোট এ-কথা একবার শ্রীলেখা দেবী যদিও মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, তবু সরাসরি তাকে 'তুমি' বলতে বাধে মিস্টার সেনের। আবার 'আপনি' বলতেও ভয়, পাছে রুমা গিয়ে চুকলি কাটে তার মায়ের

কাছে, আর শ্রীলেখা দেবী নাক কুঁচকে 'লজ্জা করে না' গোছের কিছু একটা বলে বসেন। এই জন্মেই যথাসম্ভব ভাববাচ্যে কাজ সারেন মিস্টার সেন। সেদিন সারা সন্ধ্যেটা যে-ভাবে বার বার বলেছিলেন, 'এবার খেলার খবরটা শোনা যাক্', কিংবা 'লীডারটা পড়া হোক্', সেইভাবেই বললেন, 'তা হলে কবে ঠিক করা হলো, কোণারক ?'।

সুতরাং আপত্তি টিকলো না সুপ্রিয়র। বেরিয়ে পড়তে হলো ট্যাক্সির খোঁজে।

ট্যাক্সি বলতে একটাই ষ্টেশন-ওয়াগন। আট দশটা লোক ঠাসাঠাসি করে বসে, ড্রাইভারের পাশে একজন মিস্ত্রী। কারণ, ট্যাক্সিটাও নড়বড়ে, পথও যেতে আসতে একশো মাইলের বেশী। আর তাও প্রথম দিকে পিচঢালা হলেও পরে রাস্তা আর মাঠ এক এক জায়গায় একাকার। মাঝে মাঝে আবার রাস্তা কেটে ওদিকে চাষের ক্ষেতের জল এদিকে পার করানো হয়েছে। কোথাও বা নদীর ওপর কাঠের পুল।

লিঙ্গরাজ মন্দিরের কাছে গিয়ে ট্যাক্সিটা দেখতে পেল সুপ্রিয়, কিন্তু ড্রাইভারের পাত্তা নেই। দু'পাঁচজনকে জিগ্যেস করে শেষ অবধি লোকটাকে পাকড়াও করলে একটা ভাতের হোটেলে। হোটেল নয়, আসলে মিষ্টির দোকান একটা। দুপুর বেলাটা ভাত খেতে আসে ড্রাইভার মিস্ত্রী ধরণের কিছু লোক।

তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে পরের দিন সকালে পান্থপাদপে হাজির হবার ব্যবস্থা করে সুপ্রিয় যখন ফিরলো তখন বিকেল হয়ে এসেছে।

সুপ্রিয় ফিরে আসতেই রমণীবাবু ছুটে এলেন।—আরে মশাই, আপনাকে তখন থেকে গরু খোঁজা খুঁজছি।

হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে মিসেস ভটচাযের সঙ্গে কথা

বলছিল রুমা। রমণীবাবুর কথাটা কানে যেতেই খিলখিল করে হেসে উঠলো।

আর তা শুনে সুপ্রিয় বিরক্ত হয়ে বলে ফেললো, গরুর মত খুঁজলে পাবেন কি করে। আমি তো আপনাদের জন্যে কোণারকের ট্যাক্সি ঠিক করতে গিয়েছিলাম।

—আর কোণারক! গালাগালটা গায়ে মাখলেন না রমণীবাবু। বললেন, এদিকে যে একটা কাণ্ড ঘটে গেছে মশাই।

—কি হলো আবার? সুপ্রিয় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো রমণীবাবুর চশমার ঘষাকাচের আড়ালের অস্পষ্ট চোখ দুটির দিকে।

রমণীবাবু মুখটা সুপ্রিয়র কানের কাছে নিয়ে এসে ফিসফিস বললেন, পুলিশ, পুলিশ।

—পুলিশ? দুর্বোধ বিস্ময়ে তাকালো সুপ্রিয়।

রমণীবাবু চাপা গলায় বললেন, হ্যাঁ মশাই হ্যাঁ। দু' দুবার এসেছিল আপনার খোঁজে।

—আমার খোঁজে? ভয়টা যথাসম্ভব চাপা দেবার চেষ্টা করে সুপ্রিয় আবার জিগ্যেস করলো। যেন ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না।

রমণীবাবু বললেন, কি জানি কি ব্যাপার। ভাগ্যিস আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দুপুরে সবাই ঘুমোচ্ছে তখন, মচমচ শব্দ শুনে উঠে এসে দেখি পুলিশ। আপনার খোঁজ করলে। বললাম, নেই তিনি, বেরিয়ে গেছেন। তা সে হাজার প্রশ্ন। চলে গেল, ভাবলাম চলেই গেল। তা নয়, ঘণ্টাখানেক পরেই আবার ফিরে এলো। আর সে কি চোটপাট। ফিরে এলেই আপনাকে থানায় যেতে বলেছে।

—থানা? সুপ্রিয়ও এবার চাপা গলায় বললে, পাছে থানা পুলিশ ইত্যাদি কথাগুলো রুমার কানে যায়।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে সুপ্রিয় ফিসফিস করে আবার জিগ্যেস করলে, কেন খোঁজ করছিল জেনে নিলেন না?

—জেনে নেবো কি মশাই, জানতে চাওয়াতেই তো খেঁকিয়ে উঠলো?

—খেঁকিয়ে উঠলো? কেন বলুন তো? কেমন যেন বিমর্ষ দেখালো সুপ্রিয়কে। বেচারার গলা শুকিয়ে এলো, পা ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করলো।

নিজের ঘরে এসে তক্তপোশের ওপর বসে পড়লো সে। তারপরই আবার উঠে দাঁড়ালো। কি জানি, যেতে দেরী হচ্ছে দেখে দারোগা নিজেই যদি আবার এসে পড়ে। ছি ছি, রুমার সামনে, মাসীমার সামনে, এতগুলো বোর্ডারের সামনে কি লজ্জাতেই না পড়বে সুপ্রিয়!

হুঁ, নির্ঘাৎ সেই জন্যেই। ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে তা কে জানতো।

গতকাল সকালে ক্যাপিটালের দিকে গিয়েছিল সে দু টিন সিগারেট কিনে আনতে। আর সেই সময়ে বচসা হয়েছিল দোকানীর সঙ্গে। লোকটা অবশ্য শাসিয়েছিল ওকে, কিন্তু সেটা যে এতদূর গড়াবে.......

হ্যাঁ, নির্ঘাৎ সেই জন্যেই।

ট্যাক্সির খবরটা সকলকে জানিয়ে দিয়েই থানার উদ্দেশে ছুটলো সুপ্রিয়।

সন্ধ্যেবেলায় ফিরে এসেই শিবনাথবাবু হাঁক পাড়লেন, ও হিমাদ্রিবাবু, হিমাদ্রিবাবু!

হোটেলের অনেকেই তখন বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন, নিঃঝুম হয়ে আছে এদিকটা। শুধু ও দিকে চিকের আড়াল দেওয়া হিমাদ্রিবাবুর বাড়িতে রেডিও চলেছে, রেডিওতে বাংলা গান।

রেডিওটা আসলে চালানো হয় বেলু কিংবা বেলুর মা'র মর্জি মতো। শুধু নতুন বোর্ডার এলে একবার চালিয়ে দেন হিমাদ্রিবাবু। আগন্তুকদের খুশী করার জন্যে। তবে পুরনো বোর্ডারদের কেউ অনুরোধ করলে যে খুলে দেন না রেডিওটা এমন নয়।

রেডিওতে গান হচ্ছিলো বলেই হয়তো শিবনাথবাবুর ডাকটা ওদিকে গিয়ে পৌঁছলো না। আর পৌঁছলো না বলেই শিবনাথবাবু ডাক ছাড়লেন কৌতুকীর উদ্দেশে।

সজাগ কান কৌতুকীর, সাড়া দিলো সে সঙ্গে সঙ্গে।—যাউছি বাবু। যাউছি।

কালোকুলো উল্কি-আঁকা মুখটা তুলে তাকালো সে দোতলার বারান্দার দিকে, সাদা সাদা দাঁতের হাসি দেখা গেল আবছা অন্ধকারেও।

শিবনাথবাবু বললেন, বাবুকে পাঠিয়ে দে কৌতুকী। হিসেব মিটিয়ে নেবে, কাল সকালের ট্রেণে চলে যাবো আমরা।

—চলি যিব? কৌতুকীর গলার স্বরে কেমন একটা বেদনার্ত ভাব ফুটে উঠলো। পরমুহূর্তেই সে হিমাদ্রিবাবুকে গিয়ে খবরটা দিয়ে এলো।

এসে দাঁড়ালো শিবনাথবাবুর ঘরে।

শিবনাথবাবু ততক্ষণে নিজের ঘরে এসে হিসেব কষতে বসেছেন।

কৌতুকী বিষণ্ণ মুখে দাঁড়ালো কিছুক্ষণ, তারপরে বললে, আর ছুটা দিন রহিব নি?

—উঁহুঁ। ঠোঁট ফাঁক না করে শুধু নাকের ভেতর দিয়েই জবাব

দিলেন শিবনাথবাবু। একটু থেমে বললেন, আবার নতুন লোক আসবে, দুঃখ কিসের ?

বললেন, কিন্তু পরক্ষণেই চমকে উঠলেন কৌতুকীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দে। তার মুখের দিকে, চোখের দিকে ফিরে তাকালেন। কি আশ্চর্য! কৌতুকীর চোখদুটো কেমন যেন ছলছল করছে!

হোটেলের ঝি, কত লোক আসছে, যাচ্ছে, নিত্যনতুন লোকের আগমন—তবু কিনা তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে কেউ চলে যাবে শুনলেই।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন শিবনাথবাবু, তার আগেই হিমাদ্রিবাবু খাতাপত্র নিয়ে হাজির হলেন।

বললেন, এর মধ্যেই চলে যাবেন ?

—হ্যাঁ। কাজ তো ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু চলে যাব শুনে আপনার কৌতুকীর যে চোখ ছলছল করে উঠলো!

বলে কৌতুকীর মুখের দিকে সহাস্যে তাকালেন শিবনাথবাবু, আর কৌতুকী সঙ্গে সঙ্গে তার ময়লা সাড়ীর প্রান্তটা চোখে ঘষতে ঘষতে হেসে পালালো। হাসি তো নয়, দুঃখ চাপা দেওয়ার চেষ্টা।

হিমাদ্রিবাবু হাসতে হাসতে বললেন, সাংঘাতিক মায়া ওর বোর্ডারদের ওপর।

শিবনাথবাবু হাসলেন।—শুধু ওর ওপর মায়া দেখাবার কেউ নেই!

কথাটা নিছক কথার কথা, কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু হিমাদ্রিবাবু ভাবলেন, তাঁর ওপর বুঝিবা কটাক্ষ করছেন শিবনাথবাবু। তাই উত্তর না দিয়ে খাতা খুলে হিসেব মেটাতে বসলেন।

খানিক পরেই টাকাকড়ি নিয়ে রসিদ দিয়ে চলে গেলেন তিনি, আর শিবনাথবাবু বললেন, ওঠো মিত্রী, গুছিয়েগাছিয়ে নাও, সকালে সময় পাবে না।

বলে, নিজেও স্যুটকেশ গোছাতে লাগলেন। চিরুণী, আয়না, টুথপেস্ট, জুতোর কালি, ব্রাশ, টুকিটাকি।

সব গোছানোর পর হঠাৎ খেয়াল হলো, বললেন, আমার ভিজিটিং কার্ড ?

স্যুটকেশ খুলে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, বিছানার তলা, পোর্টফোলিও।

শেষ পর্যন্ত স্যুটকেশের এক কোণেই পাওয়া গেল প্যাকেটটা।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে মনে মনে কি যেন হিসেব করলেন। হিমাদ্রিবাবু, মিস্টার সেন, আট নম্বরের রমণীবাবু, ন' নম্বরের সুপ্রিয়বাবু এবং প্রফেসর ঘোষ। দশ নম্বরে মিস্টার ভট্টাচার্য, তেরো নম্বরে শিখিনী।

গুণে গুণে সাতটা কার্ড বের করলেন প্যাকেট থেকে। আইভরি কার্ডে সুন্দর অক্ষরে ছাপা নিজের নামটা পড়লেন একবার। নীচের লাইনটাও—সেল্‌স্‌ রিপ্রেজেন্টেটিভ, রোজলার ফ্যান ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, তারপর ঠিকানা, ফোন নম্বর।

গোছগাছ সেরে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লেন শিবনাথবাবু। বুড়ির দাঁত খিঁচুনির জন্যেও হতে পারে, কিংবা টাইপ করার মত চিঠিপত্র আর ছিল না বলেও হতে পারে।

উঠলেন একেবারে ভোরবেলায়। টুথব্রাশ ঘষলেন দাঁতে, মুখ ধুলেন, এ-ও-তা কাজ সারলেন, তারপর হোল্‌ড্‌-অল বিছিয়ে বিছানা বাঁধতে শুরু করলেন।

তৈরী হতে হতেই রোদ উঠলো, আর অন্যান্য বোর্ডাররাও।

চা নিয়ে এসে হাজির হলো চৈতন্য। ঠাকুরচাকরগুলো ছুতোনাতা করে একবার না একবার দেখা দিয়ে গেল। সবাই উদ্‌গ্রীব, যাতে পান থেকে চুন না খসে। সবারই চেষ্টা শিবনাথবাবুকে খুশী করার।

মনে মনে হাসলেন শিবনাথবাবু। সারা জীবন হোটেলে হোটেলে কাটলো, আর এটুকু বুঝবেন না।

আসলে সবাই মুখ দেখিয়ে যাচ্ছে, যাতে বকশিসটা না বাদ পড়ে যায় তার ভাগ্যে।

হাতঘড়িটা একবার দেখলেন শিবনাথবাবু।

হ্যাঁ, ট্রেণের আর বেশী দেরী নেই।

সুলোচনকে রিক্সা ডাকতে বলে বেরিয়ে এলেন। পকেট থেকে গুণে গুণে সাতখানা ভিজিটিং কার্ড বের করলেন।

তারপর হঠাৎ মুখে অদ্ভুত একটা মিষ্টি অমায়িক হাসি নিয়ে এসে দাঁড়ালেন মিস্টার সেনের ঘরের সামনে।

দরজা বন্ধ ছিল। টুকটুক করে কপাটে তর্জনীর গাঁট ঠুকে আওয়াজ করে ডাকলেন ধীরে ধীরে।—মিস্টার সেন।

চায়ের পেয়ালা হাতেই বেরিয়ে এলেন মিস্টার সেন।

শিবনাথবাবু হাতদুটো জুড়ে নমস্কার করলেন, কিন্তু মিস্টার সেনের হাতে চায়ের পেয়ালা থাকায় নমস্কার করতে না পেরে একটু নড্ করলেন তিনি।

শিবনাথবাবু হেসে বললেন, ভালো করে আলাপই হলো না আপনার সঙ্গে, আজই চলে যাচ্ছি।

—তাই নাকি। কোথায় যাচ্ছেন এখন? পুরী?

শিবনাথবাবু হাসলেন।—না, বেড়ানোর সময় কি আর আমাদের হবে কখনো। কাজ, কাজ আর কাজ। এই তো এসেছিলাম, গভর্ণমেণ্টকে আশিটা ফ্যান সাপ্লাই করেছিলাম তাই....বাই দি বাই, রোজলারের নাম শুনেছেন নিশ্চয়? রোজলার ফ্যান? আমি তার সিনিয়র রিপ্রেজেণ্টেটিভ। তা আপনার যদি কখনো ফ্যানট্যানের দরকার হয়.......

বলে একখানা কার্ড এগিয়ে দিলেন।—আমার ঠিকানাটা

বরং রেখে দিন, ফ্যান তো আপনার কখনো না কখনো লাগবেই···

ছ'নম্বর থেকে বেরিয়ে আট নম্বরে রমণীবাবুকে একখানা কাড দিয়ে সুপ্রিয়র ঘরে ঢুকলেন শিবনাথবাবু। একখানা কার্ড দিলেন সুপ্রিয়কে, আরেকখানা প্রফেসর ঘোষকে।

তারপর প্রফেসর ঘোষকে উদ্দেশ করে বললেন, চললাম স্যার, মনে রাখবেন নামটা। কোলকাতায় গিয়ে দেখা করবো একদিন।

—কেন বলুন তো? বুঝতে না পেরে প্রফেসর ঘোষ জিগ্যেস করলেন।

শিবনাথবাবু হাসলেন। —তা দেখুন এখানে যখন আত্মীয়তাই হয়ে গেছে, তখন আপনার রেকমেনডেশনে যদি উপকার হয়···মানে কলেজ টলেজে পাখা তো লাগেই, আর রোজলারের চেয়ে ভাল ফ্যানও যখন এদেশে হয় না·· রোজলারের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন ···আপনি তো নিশ্চয়ই, সারা ভারতবর্ষের লোকই শুনেছে। যেখানেই যাই দুটো নাম—গান্ধী আর রোজলার। রোজলার আর গান্ধী!

প্রফেসর ঘোষ হেসে ফেললেন। তারপর রেহাই পাবার জন্যে বললেন, বেশ, বেশ, যাবেন আপনি···তা হলে ঠিকানাটা আমার নিয়ে রাখুন....

হাত নেড়ে প্রতিবাদ করে উঠলেন শিবনাথবাবু।—কিচ্ছু দরকার নেই স্যার, আপনার আবার ঠিকানা! মুখ্যুসুখ্যু মানুষ আমরা, তা বলে আপনার পরিচয় জানি না ভাবছেন? প্রফেসর কমলকুমার ঘোষ, ইণ্ডিয়া লিখে চিঠি দিলে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে।

প্রফেসর ঘোষ খুশী হলেন। —তা কিন্তু মিথ্যে বলেন নি। বিলেত থেকে চিঠি আসে মাঝে মাঝে, ক্যালকাটা লেখা....

আরো খানিকটা তোষামোদের ভাষা ব্যবহার করে উঠে এলেন

শিবনাথবাবু। মনে মনে বললেন, ল্যাজ বাবা সবারই আছে। যত বড় পণ্ডিতই হও, চালাকই হও। একটু মোচড় দিলেই তিড়িং তিড়িং করে লাফ দেবে! বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসেন মনে মনে। তারপর····

না, দশ নম্বরে ঢুকতে হয় না। কারণ ততক্ষণে ভটচায দম্পতি ছেলে টমকে বাঁদুরে টুপি জুতো মোজা পরিয়ে তৈরী হয়েছেন বেড়াতে যাওয়ার জন্যে। তাই বারান্দাতেই দেখা হয়ে যায়।

কার্ডটা ব্রজমাধব ভটচাযকে দিয়ে বিদায় জানাতেই মিসেস ভটচায বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ মেলে বলে ওঠেন, কি কথা কন শিবনাথবাবু, আমাগো পথে বসাইয়া চইল্যা যাইবেন? বোর্ডারগো সব ইউনাইট করা হইল না, হিমাদ্রিবাবুরে উচিত শিক্ষা দেওয়া হইল না··

শিবনাথবাবু হেসে বললেন, আপনি তো রইলেন, আপনি একাই একশো। তবে হ্যাঁ, হিমাদ্রিবাবুকে বোঝাবেন যে, হোটেলে মডার্ন এমেনিটিজ না দিলে, এই যেমন ফ্যান···

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন শিবনাথবাবু, কিন্তু দূর থেকেই দেখতে পেলেন শিখিনী সেজেগুজে বেড়াতে বের হচ্ছে। তাই কথাটা অর্দ্ধসমাপ্ত রেখেই ছুটলেন তিনি শিখিনীর দিকে।

আর শিবনাথবাবু চলে যেতেই টম বললে, বাবা, কি দিল তোমারে? কি দিল ও কও না?

—কিছু না তো! ব্রজমাধব ভটচায বিস্মিত হয়ে তাকালেন ছেলের দিকে।

—বাঃ রে। ঐ যে দিল কি একটা?

এতক্ষণে বুঝতে পারলেন তিনি, শিবনাথবাবুর দেওয়া ভিজিটিং কার্ডটা ছেলের হাতে দিলেন।

আর টম সেটা দেখে ফেরত দিয়ে ঠোঁট উল্টে বললে, ছাই।

বাদল যাইবার দিনে সবারে লজেন্স দিয়া গেল, আমারে দুইটা দিল। আর এ লোকটা কেবল একটা কাগজ দিল! ছাই!

শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন ভটচায দম্পতি।

ওদিকে তখন শিবনাথবাবু শিখিনীকে রোজলার কোম্পানির গুণগান শুনিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসেছেন।

কৌতুকী তৈরীই ছিল। রিক্সা এসে গেছে শুনেই বাক্স বিছানা কাঁধে নিয়ে নীচে নেমে গেল সে, পিছনে পিছনে শিবনাথবাবু আর মিস্ত্রী।

গাঁদা ফুলের বাগানের পাশটিতে দাঁড়িয়েছিলেন হিমাদ্রিবাবু।

শিবনাথবাবু তাঁকেও একটা কার্ড দিলেন, তারপর ঝি-চাকরদের বকশিস মিটিয়ে রিক্সায় চেপে বসলেন। পাশে মিস্ত্রী।

ক্রিং ক্রিং ঘন্টি বাজিয়ে রিক্সা চলতে শুরু করলো, আর সঙ্গে সঙ্গে হিমাদ্রিবাবু বললেন, আরেকটা দিন থেকে গেলেন না শিবনাথবাবু, গায়ত্রী দেবী তো আজকেই আসছেন, কোলকাতার ট্রেনটা এলেই দেখা হয়ে যেতো। এত বড় একজন ফিল্‌ম্‌ অ্যাকট্রেস....

শিবনাথবাবু কোন উত্তর দিলেন না। ফিরেও তাকালেন না একবার হোটেলের দিকে। সারা জীবনই তো তিনি ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়িয়েছেন। আজ এখানে, কাল ওখানে। কোনদিন ফিরে তাকান নি। ফিরে তাকানো তাঁর স্বভাব নয়। দুদিনের জন্যে আসা, তার ওপর মায়া মমতা দেখাতে গেলে স্বভাবটাকেই বদলাতে হয়। আর স্বভাবই যদি বদলানো যাবে, তা হলে তো কবে বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার গুছিয়ে বসে পড়তেন। রোজলার পাখার মত বনবন করে ঘুরতেন না কেবল।

কৌতুকীর মত কার্বন পুড়ে গেছে যাদের, তারাই থেমে থাকতে পারে, পড়ে থাকতে পারে।

শিবনাথবাবুর রিক্সা স্টেশনের পথ ধরতে না ধরতে কোণারক যাবার ট্যাক্সি এসে হর্ন দিতে শুরু করলো।

এত তাড়াতাড়ি আসবার কথা নয়। কেউই তখনো তৈরী হয়নি। সাজপোশাক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো সকলে, আর তাড়া দিলো ঠাকুর-চাকরদের। কারণ দুপুরের আহারটা কোণারকেই সারতে হবে বলে হোটেল থেকেই লুচি মাংস করে নিয়ে যাবার কথা।

ঠাকুর সাড়া দিয়ে জানালো লুচি ভাজা হচ্ছে। লুচি যে ভাজা হচ্ছে তা অবশ্য টের পাওয়া যাচ্ছিল ঘিয়ের গন্ধে।

শুধু সুপ্রিয় বললে, হ্যাঁ মশাই রমণীবাবু, গন্ধটা কেমন লাগছে যেন, বাদাম তেল দিয়ে ভাজছে নাকি? বনস্পতি বলে তো মনে হচ্ছে না।

রমণীবাবু হেসে বললেন, কত বয়েস হলো আপনার?

—কেন বলুন তো? বয়স কম বলেই বয়সের কথায় চটে গেল সুপ্রিয়।

রমণীবাবু বললেন, যে গন্ধটা পাচ্ছেন ওটাই খাঁটি ঘিয়ের গন্ধ, আপনারা তো ঘি দেখেন নি কিনা, তাই গন্ধটা খারাপ লাগে।

কথাটা প্রায় সত্যি বলেই সুপ্রিয় চটে গেল, বললে, তা ঠিক। কত ভালো ভালো জিনিস খেয়েছেন আপনারা, বুড়োরা অনেক ভাগ্যবান।

বয়সটা একটু বেশী বলেই এবার রমণীবাবু চটে গেলেন বয়সের কথায়। এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার। মানুষকে কম বয়সে বয়স কম বললে চটে, বেশী বয়সে বয়স বেশী বললে চটে। তাই রেগে গিয়ে বলে উঠলেন, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি আসবে তা তো বলেন নি আপনি!

একা রমণীবাবু নয়, রুমা রেশম থেকে শিখিনী এবং প্রফেসর

ঘোষ পর্যন্ত সকলেই একে একে ঐ-কথা বলে গেল। আর সুপ্রিয় বেরিয়ে গিয়ে ধমক দিলে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার অমায়িক হেসে বললে, এ তো আর রেলগাড়ি নয় দাদা যে সিটি বাজিয়ে ছেড়ে যাবে। এসেছি খবরটা দেবার জন্যে হর্ন দিচ্ছি। আপনারা রাইট-টাইমে বেরোবেন। তা ঘড়িটা দেখুন তো স্যার, কটা বাজলো।

ঘড়ি!

ড্রাইভারের কথা শুনে রিস্টের দিকে তাকিয়েওছিল সুপ্রিয়। পরমুহূর্তেই মনটা খারাপ হয়ে গেল তার।

গৌতমকে মনে পড়ে গেল, আর সেই সূত্রে থানা পুলিশের কথাও।

ফিরে এসে রমণীবাবুকে বললে, আপনার সেই দারোগার সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

—তাই নাকি? জিগ্যেস করতে ভুলেই গেছি। কি ব্যাপার বলুন তো?

উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন রমণীবাবু।

সুপ্রিয় হেসে বললে, এক ব্যাটা চোর ধরা পড়েছে, আমাদের সেই গৌতমবাবু কিনা দেখবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিল দারোগাটা।

—গৌতমবাবু নয়?

সুপ্রিয় কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই কুমারা বেরিয়ে পড়লো সদলবলে, সেজেগুজে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে।

শিখিনী, প্রফেসর ঘোষ, রমণীবাবু এবং সুপ্রিয়ও ঘরে চাবি লাগিয়ে একে একে এসে বসলো ট্যাক্সি ওরফে স্টেশন ওয়াগনে। কারো হাতে চায়ের ফ্লাস্ক, কারো কাঁধে ক্যামেরা। লুচি মাংসের টিফিন কেরিয়ার আর জলের কলসী দিয়ে গেল কৌতুকী।

আটজন বসবার মত জায়গা নেই গাড়িতে। কিন্তু সে-কথা বলতেই চিৎকার করে উঠলো ড্রাইভার। —দিনে ছুটো করে শীফ্‌ট্‌ দিচ্ছি দশজন প্যাসেঞ্জার আর একজন মেরামত নিয়ে, বলেন কিনা আটজনের জায়গা হবে না। ঠেসেঠুসে বসুন না একটু, ছুটো জার্ক দিলেই দেখবেন জায়গা হয়ে গেছে।

সব পিছনের সীটে মিস্টার সেন বসেছিলেন সপরিবারে। এতক্ষণ একটাও কথা বলেন নি। পাইপ মুখে দিয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে মাফলারটা কান ঢেকে মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে অলস্টারের বুকের ফোকরে গুঁজে দিয়ে তিনি এতক্ষণে গুছিয়ে বসে বললেন, জার্ক দিতে হবে না ইচ্ছে করে, যা গাড়ি তোমার, জার্ক দিতে দিতেই চলবে। মাঝ রাস্তায় না খারাপ হয়ে যায়।

—সে ভয় করবেন না স্যার। ড্রাইভার স্টার্ট দেবার চেষ্টা করে বললে, পাশেই তো মেরামত বসে রয়েছে।

'মেরামত' যে মিস্ত্রীর প্রতিশব্দ তা প্রথমটা বুঝতে পারেন নি মিস্টার সেন। যখন বুঝতে পেরে লোকটার দিকে তাকাতে গেলেন তখন আর সে পাশে নেই। সেল্‌ফ্‌ স্টার্টারের ব্যাটারি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বলে তাকে তখন নেমে পড়তে হয়েছে হ্যাণ্ড্‌ল মারার জন্যে।

তা দেখে হো হো করে হেসে উঠলো রেশম। বললে, এই রে, স্টার্ট নিচ্ছে না।

ড্রাইভার স্টিয়ারিং ধরে বসেছিল, চেষ্টা করছিল স্টার্ট ধরাবার জন্যে, রেশমের হাসি শুনে ক্ষেপে গেল সে। বললে, ঠাণ্ডায় মানুষ জমে যাচ্ছে, আর মোটর জমে যাবে না। দেখুন না····

বলতে বলতেই ঘর ঘর ঘর ঘর শব্দ তুলে স্টার্ট নিলো ট্যাক্সিটা, এবং পরমুহূর্তেই পীচ-ঢালা পুরী রোড ধরে ছুটতে শুরু করলো।

আঃ। উল্লাস দেখা দিলো সবারই মুখে চোখে।

ঠাণ্ডা হাওয়া। দূরে সূর্য উঠছে, উঠেছে। দু'পাশে কেয়ার ঝোপ, বেত ঝোপ। বেতের স্ফুলিঙ্গ ঝোপের মাথা থেকে উঠে নুয়ে পড়েছে প্রণতা নর্তকীর ভঙ্গিতে। রাস্তার ধারে সারি সারি মহানিম আর নাক্সভমিকার গাছ। নিম গাছে নতুন পাতা— লালচে কচি পাতা সিরসির করে কাঁপছে। সকালবেলাকার রোদ লেগে মেটে রঙের পাতাগুলো মনে হচ্ছে যেন কোন অচেনা ফুলের গুচ্ছ। দূরে, ক্রমশঃ পিছনে সরে যাচ্ছে লিঙ্গরাজের মন্দির। পথের দুধারে কলাইয়ের ক্ষেত, ধানক্ষেত।

মাঝখানের সীটের একপ্রান্তে, জানালার ধারটিতে বসেছে শিখিনী, তার পাশে প্রফেসর ঘোষ। তারপর রমণীবাবু, সুপ্রিয়।

হঠাৎ গলা খুলে গান শুরু করলো সুপ্রিয়, সুরে সুর মেলালো রেশম। রুমারও ইচ্ছে হচ্ছিল, কারণ সুরটা তারও জানা। কিন্তু সিনেমার ডুয়েটের মত শোনাবে এই ভয়ে চুপচাপ শুধু মুচকি মুচকি হাসলো সে।

দীর্ঘ পথ। ট্যাক্সি ছুটছে পীচের রাস্তা ধরে। পীচের রাস্তা থেকে লাল ধুলোর রাস্তায় বাঁক নিলো এবার। এঁকেবেঁকে এগিয়ে চললো। কখনো রাস্তা বেয়ে, কখনো রাস্তা থেকে নেমে মেঠো পথ পার হয়ে।

ট্যাক্সিটা হঠাৎ স্পীড কমিয়ে দিতেই গান থেমে গেল।

রাস্তার মাঝখানের খানিকটা কেটে ওপাশের ক্ষেতের জল এদিকের ক্ষেতে পার করা হয়েছে।

ট্যাক্সি নামলো মাঠের ওপর, জলকাদা ডিঙিয়ে আবার উঠলো পাকা রাস্তায়।

ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে শিরশির করে। দু'ধারে বড় বড় গাছ,

মাঝে মাঝে দু'একটা ঝাউ। তারই ফাঁক দিয়ে মিষ্টি রোদ উঁকি দিচ্ছে।

সবাই চুপচাপ।

মিস্টার সেন নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, কি রাস্তা রে বাবা।

প্রফেসর ঘোষ হেসে বললেন, এখন তো তবু রাস্তা ভালো হয়েছে, আগের বার যা দেখেছিলাম।

রুমা জিগ্যেস করলে, আপনি প্রায়ই আসেন বুঝি!

তা কয়েকবারই এসেছি। প্রফেসর ঘোষ অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিলেন।

রমণীবাবু তোষামোদের ভঙ্গিতে বললেন—তা হলে তো রাস্তা-ঘাট আপনার চেনা। তা নিমাপাড়া না কি বলছিলেন হিমাদ্রিবাবু, সে কদ্দূর মশাই?

ড্রাইভার শুনতে পেয়ে বললে, নিমাপাড়ার বাজার তো সামনেই, রসগোল্লা কিনে নেবেন।

রসগোল্লা? এখানে রসগোল্লা? রেশম খবরটা জানতো না বলেই উল্লসিত হয়ে উঠলো।

ড্রাইভার বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, ফাস্ট ক্লাশ! এক আনায় এই এত বড় বড়।

মিস্টার সেন বললেন, তুমি বাবু সাইজ দেখাবার জন্যে স্টিয়ারিং ছেড়ো না, যা রাস্তা ঘাট....

রমণীবাবু দেখলেন আলোচনার বিষয়টা অন্য দিকে চলে যাচ্ছে, তাই বলে উঠলেন,—হিমাদ্রিবাবুও বলছিলেন, এখনো নাকি নিমাপাড়ায় টাকায় আট সের দুধ।

শ্রীলেখা দেবী এতক্ষণ শুনছিলেন, এবার রুমার কানে কানে ফিসফিস করে বললেন, তা হলে পাঁচ টাকার রসগোল্লা নিয়ে যেতে বল না!

অর্থাৎ মিস্টার সেনকে বলতে বললেন। কারণ তাঁর পাশে বসেছিল রুমা, তারপর রেশম, তারপর মিস্টার সেন।

রুমা নাক সিঁটকে বললে, কি যে বলো। কোথায় কোণারক দেখতে যাচ্ছি, এখন রসগোল্লা।

রমণীবাবুর কথাটা শিখিনীর কানেও গিয়েছিল। সে বললে, স্রিফ রসগুল্লা? পেড়া, লাড্ডু মিলবে না?

প্রশ্নটা বিশেষ কারো উদ্দেশ্যে নয় বলেই কেউ উত্তর দিলো না।

শুধু রমণীবাবু বললেন, ড্রাইভার, নিমাপাড়ায় থেমো যেন একবার। ছেলেটার জন্যে দুটো রসগোল্লা নিয়ে যাবো।

ড্রাইভার এ-কথার কোন উত্তর দিলো না, কারণ ততক্ষণে ট্যাক্সিটা একটা বাজারের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

দু'পাশে দোকানের সারি। সবই মিষ্টির দোকান। প্রতিটি দোকানের সামনে বড় বড় উনোন। উনোনে বড় বড় কড়াই, আর কড়াইয়ে মণ মণ দুধ জ্বাল দেওয়া হচ্ছে।

ট্যাক্সি থামিয়েই ড্রাইভার আর 'মেরামত' বললে, নিমাপাড়া। রসগোল্লা নিয়ে নিন আপনারা।

তারপর তারা চলে গেল কোথায় যেন। বোধহয় জলযোগ করতে।

একে একে সকলেই নামলো। কেউ আট আনার, কেউ চার আনার রসগোল্লা নিলো।

শিখিনী বললে, পেড়া নেই? লাড্ডু? কুছ নেই? স্রিফ রসগুল্লা?

মিস্টার সেন সপরিবারে এসে দাঁড়ালেন দোকানের সামনে।

বললেন, পাঁচ টাকার রসগোল্লা দাও।

দোকানদার হাঁ করে তাকালো মিস্টার সেনের মুখের দিকে। তারপর বললে, বাবু, পাঁচো টঙ্কার পাত্রো নাই অছি।

শেষ পর্যন্ত ছ'টাকার নিলেন ওঁরা। ভাবতেই পারেন নি, এক আনায় এত বড় বড় রসগোল্লা! ওরই মধ্যে রমণীবাবু গোটা চারেক খেয়ে নিলেন, আর হাঁড়িতে ছেলেটার নাম করে কিছু নিয়ে নিলেন।

একে একে গাড়িতে এসে উঠলেন সকলে। ড্রাইভার আর মেরামতও।

ট্যাক্সি আবার ছুটতে শুরু করলে রমণীবাবু বললেন, তাজ্জব ব্যাপার কিন্তু, এক আনায় এত বড় রসগোল্লা?

সুপ্রিয় বললে, রাজভোগ বলুন।

রুমা বললে, সম্রাটভোগ।

শ্রীলেখা দেবী বললেন, ছুধ এত সস্তা যখন, ঘি পাওয়া যায় কিনা খোঁজ নিলে হতো।

রসগোল্লার আলোচনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাল ধুলোর রাস্তা ছেড়ে এবার কাঁচা মাটির রাস্তায় নামলো ট্যাক্সি। তারপর টলতে টলতে উঁচুনীচু মেঠো পথ বেয়ে একটা নদীর ধারে।

সামনে তাকিয়ে সবাই আঁৎকে উঠলো। এ আবার কেমন পুল! রাস্তা থেকে বড় জোর ছ'হাত উঁচু লেভেলে শাল বল্লি দিয়ে বানানো একটা পুল নদীর ওপর। ছ'পাশে তার কোন রেলিং নেই, ছ'পাশই খোলা। এমনিতেই মনে হয় ট্যাক্সির চাকা বুঝি জল ছুঁয়ে যাবে, তার ওপর একটু বেচাল হলেই একেবারে নদীগর্ভে।

গাড়ির ভারে পুলটা যেন নড়ে উঠলো।

আর রেশম হেসে হাততালি দিলো। —এ কি ব্রীজ রে বাবা!

রুমা বললে, সাবধানে ড্রাইভার।

সাবধান সে এমনিতেই। শাল কাঠের সরু পুল, কোনরকমে একটা গাড়ি পার হতে পারে।

রমণীবাবু তাঁর রসগোল্লার হাঁড়িটা হাতে ঝুলিয়ে বসলেন।

মনে হলো একটু যেন ভয় পেয়েছেন। কিন্তু নিজের জীবনের চেয়েও বোধ হয় হাঁড়িটা হারাবার ভয়ই তাঁর বেশী।

শিখিনী জানালা থেকে হাত বাড়িয়ে জল ছোঁবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো।

সুপ্রিয় বেপরোয়া ভাব দেখালো, বোধ হয় রুমার কাছে নিজেকে দুঃসাহসী হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্যেই বললে, স্পীড বাড়াও ড্রাইভার, স্পীড বাড়াও।

শ্রীলেখা দেবী বললেন, চুপ করো সুপ্রিয়। এখন বেচারীকে ঘাবড়ে দিও না।

ঘাবড়ে যাবার লোক অবশ্য নয় ড্রাইভার। কতবার তো সে প্যাসেঞ্জার নিয়ে এ পুল পারাপার করেছে। তাই মেরামতের সঙ্গে চোখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসলো সে।

পুল পার হয়ে দু'পাশে ঘন ঝোপ। মাটি ক্রমশঃ বালিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

এবার মসৃণ উঁচু রাস্তা। সিধে চলে গেছে অনেক দূর অবধি। রাস্তার দু'পাশে ঝাউ গাছ, আকাশচুম্বি বড় বড় ঝাউ।

রেশম গোল গোল বড় বড় চোখ করে তাকালো রুমার মুখের দিকে।

বললে, দিদি! দিদি! কত বড় বড় ঝাউ দেখ্‌!

রুমারও বিস্ময়ের সীমা নেই। কোলকাতায় রুমা তার কলেজের এক বান্ধবীর বাড়িতে ঝাউগাছ দেখেছে বটে, কিন্তু সে তো ছোট ছোট। আর এখানে অযত্নে বালির ওপর এত বড় বড় ঝাউ? সারি সারি অসংখ্য ঝাউ!

মনটা ফুর্তিতে নেচে উঠলো। কি সুন্দর, কি সুন্দর! উঁচুনীচু বালির ঢেউ, বালি আর বালি। তার ওপর ঝাউয়ের শাখা দুলছে হাওয়ায়। যেন চামর দোলাচ্ছে কেউ।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো সুপ্রিয়।—কোণারক! কোণারক!

ছবিতে দেখা সেই মন্দিরটা অনেক দূর থেকে দেখা গেল। একেবারে নাকের সোজা। রাস্তাটা গিয়ে শেষ হয়েছে মন্দিরের গায়ে।

একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে ট্যাক্সি, একটু একটু করে মন্দিরটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কালো, ঘন কালো রঙের অপূর্ব সুন্দর একটি মন্দির।

রুদ্ধশ্বাসে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো সকলে। যেন এক গুপ্তধনের সুড়ঙ্গপথে এসে দাঁড়িয়েছে তারা, এখনই সরে যাবে বন্ধ কপাট।

নির্জন রাস্তা পেয়ে স্পীড বেড়ে গেছে ট্যাক্সির।

আর পাঁচ মিনিট, তিন মিনিট, দুই, এক....একেবারে মন্দিরের পাঁচিলের গায়ে এসে দাঁড়ালো ট্যাক্সি।

নামলো সকলে।

পাশেই একটা চায়ের দোকান। চিকের দেওয়াল, টিনের ছাদ।

আশে পাশে জনকয়েক লোক বসে আছে কাঁদি কাঁদি ডাব নিয়ে।

—এই শীতে ডাব কে খাবে রে বাবা! রেশম হেসে উঠে বললে।

প্রফেসর ঘোষ কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে নেমে পড়লেন। আর তা দেখে বুকের ভেতরটা জ্বলে গেল সুপ্রিয়র। ব্যাটা গৌতম ক্যামেরাটা চুরি না করলে আজ রুমার গোটাকয়েক ছবি তো তুলতে পারতো সে।

দল বেঁধে সকলে ছুটে গেল মন্দিরের দিকে। এত এত প্রশস্তি পড়েছে কাগজে কাগজে, ছবি দেখেছে...এবার নিজের চোখে দেখতে হবে।

ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে মাঝপথ থেকেই ফিরে এলেন রমণীবাবু।

—দূর, দূর, এর জন্যে এতদূর আসা? ঐ একই, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজও যা, এও তাই। চেহারাটা অন্যরকম, এই যা।

বলেই ফিরে এসে ট্যাক্সিতে গ্যাঁট হয়ে বসলেন রমণীবাবু। ড্রাইভারকে বললেন, দশটা টাকা ঠকিয়ে নিলে বাবা, এর জন্যে এতদূর আসার কোন মানে হয়।

শিখিনী এদিকে মন্দিরের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। যাকে দেখে, তাকেই জিগ্যেস করে ভেতরে যাবার রাস্তা কোনটা।

একজন গাইড জুটে গেল। মন্দির সারানোর কাজ দেখছিল ওভারসিয়র গোছের একটা লোক। খাঁকি কুর্তা গায়ে।

সমস্ত দলকে সঙ্গে করে মন্দিরের ভেতরে একজায়গায় নিয়ে গেল সে। কিন্তু ভেতরে তো কিছু নেই, পাথর দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

শিখিনী হতাশ হয়ে বললে, শিউজী নেই? পূজা চড়াবার কুছ নেই? তো এ কোন কিসমের মন্দির বাবুজী।

খানিকটা ঘুরে সেও ট্যাক্সিতে ফিরে গেল। গিয়ে রমণীবাবুকে বললে, শিউজী নেই, পার্বতী নেই, এ কোন মন্দির বাবুজী।

বাকী দল তখন গাইডের পিছনে পিছনে চলেছে মন্দির চক্র দিয়ে। আর এক একটা পাক দিয়ে ওপরে উঠতে থাকে সকলেই, মন্দিরের চূড়ার দিকে।

শ্রীলেখা দেবী আর মিস্টার সেন থেমে পড়লেন এক জায়গায়।

না, এতটা যেতে পারবেন না, উঠতে পারবেন না।

রুমা, রেশম, প্রফেসর ঘোষ আর সুপ্রিয় চলে যেতেই শ্রীলেখা দেবী বয়স্ক গালে টোল ফেলে খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন, তোমার যেমন বুদ্ধি, ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখানে আসে।

মিস্টার সেনও হাসলেন।—এতখানি কি ভেবেছিলাম! আমার ধারণা ছিল ছোট ছোট, অত চোখে পড়বে না।

—রেশমকে বরং হাঁক দিয়ে ডাকো।

—বেশ তো নিরিবিলিতে বসেছি দু'জনে, আবার কেন। হাসলেন মিস্টার সেন। চোখে চোখে চাইলেন।—বয়েসটা যদি কম থাকতো!

—অসভ্য এমন! খিলখিল করে হেসে উঠলেন শ্রীলেখা দেবী, যেন আঠারো বছরের তরুণী। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে তাকালেন রুমাদের দিকে।

রুমারা তখন পাক দিয়ে দিয়ে বেশ খানিকটা ওপরে উঠে গেছে।

—রেশম! ডাকলেন শ্রীলেখা দেবী।

রেশম ফিরে তাকালো।

—নেমে এসো।

থমকে দাঁড়ালো রেশম, অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামতে হ'লো তাকে। আর রেশম ফিরে আসছে অথচ রুমা ফিরছে না দেখে শ্রীলেখা দেবী তাকেও ডাকলেন।

—রুমা! ফিরে আয়।

—আমি ওপরে উঠবো। উত্তর দিলো রুমা।

—না, নেমে আয়।

—না, যাবো না। দুটো হাতকে মুখের সামনে চোঙার মত করে চেঁচিয়ে জবাব দিলো রুমা, তারপর গাইডের পিছনে পিছনে তরতর করে পাক দিয়ে দিয়ে উঠতে লাগলো।

বেশ খানিকটা উঠে যাবার পর, রুমার বাবা-মা আড়াল হতেই সুপ্রিয় বললে, এখানে একটু বসি।

—বাঃ রে, উঠবে না?

—উঠবো, একটু পরে।

ছ'জনেই বসে পড়লো একজায়গায়। প্রফেসর ঘোষ আর গাইড ওদের ছেড়ে আরো ওপরে উঠে গেল।

রুমা আর সুপ্রিয়। চুপচাপ বসে রইলো ছ'জনে। পাশাপাশি নয়। একটু দূরে দূরে।

সুপ্রিয়র মনের মধ্যে তখন অসংখ্য শানানো বানানো কথার আকুলিবিকুলি। কত কি বলবে বলে ঠিক করে রেখেছে সে।

রুমা হঠাৎ বললে, সত্যি, এখানে এসে মনটা এত ভাল লাগছে। কি মনে হচ্ছে জানো!

—কি? কি? উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলে সুপ্রিয়।

—মনে হচ্ছে ঘর-সংসার সব মিছে। কত কি আশা করি, স্বপ্ন দেখি আমরা, সবই মোহ।

—ফুৎ। একটা অদ্ভুত শব্দ করলো সুপ্রিয়। অর্থাৎ কত কি গূঢ় কথা শুনবে আশা করেছিল সে, কত কি বলবে, তা নয় যত সব দর্শন আওড়াচ্ছে।

সুপ্রিয় বললে, আমার কি মনে হচ্ছে জানো?

—কি? হাঁটুর ওপর কনুই আর ছড়ানো পাঁচটা আঙুলের ওপর গাল রেখে ছেলেমানুষি ভঙ্গিতে সুপ্রিয়র মুখের দিকে তাকালো রুমা, মনে হলো ও যেন হাসি চাপছে। হাসি চেপেই সে সুর করে প্রশ্ন করলো, কি?

সুপ্রিয় গম্ভীর হয়ে বললে, মনে হচ্ছে ঐ প্রফেসর না কি যেন, ওকে ল্যাং মেরে ফেলে দিই।

চমকে উঠলো রুমা।—কেন?

—কেন তা তুমি ভালো করেই জানো। বলেই উঠে পড়লো সুপ্রিয়। তারপর তরতর করে নামতে শুরু করলো। আর নামতে নামতে হঠাৎ একটা পাথর কুড়িয়ে নিলো, কাকে যেন ছুঁড়ে মারবে এমনি ভঙ্গিতে।

রুমাও তখন তর্‌তর্‌ করে নামছে পিছু পিছু, আর চিৎকার করছে, এই শুনুন না। এই, শোনো, শোনো বলছি।

ট্যাক্সিটা হোটেলে ফিরলো যখন, তখন তিনটে বেজে গেছে। এতখানি পথ যাওয়া আসা, তার ওপর মন্দিরের চূড়ায় ওঠার ক্লান্তিতে রুমা এবং প্রফেসর ঘোষের চোখ জুড়ে আসছে ঘুমে। অন্য সকলেও ক্লান্ত।

অক্লান্ত শুধু রমণীবাবু। ফেরবার পথে আরো আট আনার রসগোল্লা কিনে এনেছেন তিনি ছেলের জন্যে।

হাঁড়িটা হাতে ঝুলিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই মিসেস ভটচাযের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বললেন, কোণারক ঘুরে এলাম। গেলেন না তো মিসেস ভটচায, এইট্‌থ্‌ ওয়ান্‌ডারফুল নিয়ে এলাম নিমাপাড়া থেকে, এক আনায় এই বড়ো বড়ো······

প্রফেসর ঘোষ ভাবছিলেন কোন রকমে নিজের ঘরটিতে এসে বিছানায় গড়িয়ে পড়তে পারলে হয়, তারপর দু'চোখ বুজে ঘুম, ঘুম। কিন্তু রমণীবাবুর কথাটা কানে যেতেই সুপ্রিয়র দিকে ফিরে বললেন, রাবিশ্‌। কোণারকে গিয়ে মন্দিরের মধ্যে কিছু দেখবার পেলেন না, রসগোল্লা আর রসগোল্লা।

এদিকে শিখিনীকে ততক্ষণে ধরে বসেছে হিমাদ্রিবাবুর মেয়ে বেলু।—কেমন দেখলেন পাণ্ডাবৌদি।

—আরে ছিঃ। না আছে পাণ্ডা, না পূজা চড়াবার বন্দোবস্ত্‌। এ কোন্‌ কিসমের মন্দির বুঝলাম না।

মিস্টার সেনের কানে গেল কথাটা, ফিরে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন তিনি। আর শ্রীলেখা দেবী ডাকলেন বেলুকে। বললেন, এগারো নম্বরে কে এলো?

—ও মা, জানেন না বুঝি? বলেই ফিসফিস করে খবরটা দিলো বেলু।

—গায়ত্রী দেবী! সেই যে বলেছিলাম····

গায়ত্রী দেবী? মুহূর্তের মধ্যে খবরটা রটে গেল সারা হোটেলে। প্রায় সকলেই একবার করে ঘরটার সামনে দিয়ে অকারণে পায়চারী করে গেল। কারণ দরজায় তখন একটি রীতিমত ঝকমকে দামী পর্দা ঝুলছে, আর সকলেই আশা করছিল পর্দাটা হাওয়ায় দুলে উঠলেই এক ফাঁকে হয়তো গায়ত্রী দেবীকে সশরীরে দেখতে পাবে। যার অশরীরী চেহারাটা এতবার দেখেছে তারা, এতবার দেখেছে, তাকে রক্তমাংসের চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হতে দেখবে তা কেউ কোনোদিন কল্পনাই করে নি। সেই গায়ত্রী দেবী কিনা এই একই হোটেলে, পাশাপাশি ঘরে!

কিন্তু এগারো নম্বরের দরজায় টাঙানো ভারী পর্দাটা নড়লো না। ভেতর থেকে এক টুকরো কথাও ভেসে এলো না।

রুমা আর রেশম সেদিকে দু'বার ব্যর্থ উঁকি দিয়ে বলাবলি করলো, বোধহয় মেক-আপ নিচ্ছে।

মেক-আপ নয়। সারা রাত্রির ট্রেণ জার্নিতে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন বলেই দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন গায়ত্রী দেবী। উঠলেন যখন সন্ধ্যে হয় হয়।

পর্দা ঠেলে গায়ত্রী দেবী বেরিয়ে এলেন, বেরিয়ে এলেন এমন ভঙ্গিতে যেন পৃথিবীর সবকিছুই তাচ্ছিল্য করবার। কিংবা বলা যায়, কোন এক সম্রাজ্ঞী যেন এক রাজ্যে দরবার সেরে আরেক রাজ্যের সিংহাসনে যাচ্ছেন। আর হাঁটাচলার ধরণই বা কি! যেন একটি চওড়া ডানাওয়ালা পাখি আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে, ডানা দুটো স্থির হয়ে আছে দুদিকে, এতটুকু কাঁপছে না।

সাদা সিল্কের শাড়ীখানা একেবারে হাল ফ্যাশনের কলেও

রুচিসম্মত। পরার ধরণটা আরো। আঁটসাঁট ছন্দময় শরীর গায়ত্রী দেবীর, কিন্তু রঙটা ঈষৎ চাপা। মুখের গড়ন খুব একটা আহামরি গোছের না হলেও চোখে যেন চটক আছে। একটা সুপুষ্ট সাদা সারসের মত টানটান নরম শরীরের আড়ে-পিঠে আঁচলটা লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। সেটা মেঝে থেকে তোলার চেষ্টা না করে, বরং কেমন একটা শ্লথ বিস্রস্ত ভাব করে বেরিয়ে এলেন গায়ত্রী দেবী, চোখে মুখে জল দিলেন। তারপর পরনের শাড়ীটার আঁচলেই মুখের জল স্পঞ্জ করতে করতে নিজের ঘরটিতে ফিরে গেলেন। দেখতে পেলেন না, ওদিকে বারান্দার থামের গায়ে মিসেস ভটচায দাঁড়িয়ে আছেন।

গায়ত্রী দেবী দেখতে না পেলেও রুমা দেখতে পেলো তাঁকে।

আর রুমা এগিয়ে আসতেই মিসেস ভটচায একমুখ হাসি হেসে বললেন, ছাখলেন সিনেমা স্টাররে? ছামাকে পা পড়ে না মাটিতে, আমাগোর সাথে কথা কইলে য্যান মুখ্খান বাঁকা হইয়া যাইব!

রুমা হাসলো। বললে, হুঁঃ, ভারী তো চেহারা! রঙ তো আমার থেকেও কালো, নেহাৎ ক্যামেরা ফেস আছে তাই!

—ক্যামেরা-ফেইস কইবেন না। প্রতিবাদ করে উঠলেন মিসেস ভটচায। বললেন, ক্যামেরা-ফেইস আমার পিসাতো ননদের তো ছাখেন নাই, আসল হইল এই কপাল....ভাইগ্যটা... বলে নিজের কপালেই একটা টোকা মারলেন।

আর রুমাও সায় দিলো নাক কুঁচকে একটি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে।

বললে, পর্দাটা দেখেছেন? এই হোটেলে এত দামী পর্দা দেওয়ার কোন মানে হয়?

অর্থাৎ পর্দাটা সকলেই লক্ষ্য করেছে। আর লক্ষ্য করবার

মতই। দামী পর্দা, তার ওপর নানা রঙের সূক্ষ্ম কারুকার্য। সারা হোটেলের চেহারাটাই যেন বদলে গেছে ঐ একটা পর্দার জন্যে।

মিসেস ভটচায রুমার কথা শুনে হাসলেন বটে, কিন্তু মনে মনে সায় দিতে পারলেন না। কারণ, আজ রুমা এ-হোটেলে দামী পর্দা টাঙানোর কোন অর্থ না পেলে কি হবে, রুমারা যেদিন প্রথম এলো এখানে এবং তাদের দরজা থেকে যখন হোটেলের পুরোনো রঙচটা পর্দাটা সরে গিয়ে রুমাদের একটু রঙচঙে আর ভালো পর্দাটা ঝুললো সেদিন মিসেস ভটচাযও তো এই কথাই ভেবেছিলেন।

তাই মনে মনে বরং খুশীই হলেন তিনি, মনে মনেই বললেন, এবার দেখো মা-ঠাকরুণ, সেদিন তোমরা যে বড় নাকের সামনে পর্দা দেখিয়েছিলে!

রুমা তাঁর মনের গভীরে ঢুকবে কি করে, তাই সরল ভাবেই প্রশ্ন করলে, একা এসেছে নাকি ?

—না না, একা আসবো ক্যান! বুড়ি মা আছে, একটা বাচ্চা মাইয়া আছে, চাকর আছে।

বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হলো না। একে একে সকলেই ঘুম থেকে উঠলেন, সকলেই ঘোরাঘুরি করতে শুরু করলেন বারান্দায়। অর্থাৎ গায়ত্রী দেবীকে দেখে চক্ষু সার্থক করতে চায় সকলেই। অথচ তারই ফাঁকে পরস্পরের মধ্যে নানা আলোচনা চলতে লাগলো, নানান কটুকাটব্য!

রমণীবাবু বললেন, এদের সঙ্গে এক হোটেলে থাকলেও মশাই বদনাম।

ব্রজমাধব ভটচায বললেন, নামেই ফিলিম-স্টার আপনাগো গায়োত্রী দেবী, অ্যাক্‌টিং-এর জানে কচু। খালি ফ্যাশন দেখাইয়া....

মিস্টার সেন বললেন, তা যা বলেছেন, আজকালকার স্টার মানে অ্যাক্‌টিং-এর এ-বি-সিও জানে না। হ্যাঁ, আগেকার দিনে তাদের কত বড় একটা আদর্শ ছিল।

রমণীবাবু আর ব্রজমাধব ভটচায একসঙ্গে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন মিস্টার সেনের কথায়। সায়টা বক্তব্যের জন্যে ততখানি নয় যতটা বক্তার জন্যে। এ-কদিন তাঁরা লক্ষ্য করে দেখেছেন, মিস্টার সেন কেমন যেন তাঁদের এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন, যেন একটা আত্মম্ভরিতার আড়াল রাখেন সব সময়। সেই সেন সাহেব কিনা আজ তাঁদের সঙ্গে এমন একটা রসালো আলাপে একাত্ম হয়ে গেছেন। মনে মনে খুশী হলেন দু'জনেই।

খুশী হলেন না শুধু শ্রীলেখা দেবী। ছ' নম্বরে মিস্টার সেন ফিরে আসতেই তিনি বলে বসলেন, তোমার কি লজ্জাও করে না, ওদের সঙ্গে সিনেমা অ্যাকট্রেস নিয়ে গল্প করছো?

মিস্টার সেন প্রতিবাদ করতে গেলেন, বোঝাতে গেলেন যে আজকালকার ফিল্‌ম-স্টারদের কোন দাম নেই একথাই তিনি বলছিলেন, কিন্তু তার আগেই শ্রীলেখা দেবী বলে উঠলেন, বাজে বকো না, তোমরা সবাই ঘুরঘুর করছো ওকে দেখবার জন্যে।

—দেখবার জন্যে? কেন, কি আছে কি দেখবার! বলে ধপাস করে বসে পড়লেন তিনি বিছানার ওপর, হতাশ অসহায় ঈষৎ অভিমানের ভঙ্গিতে।

আর শ্রীলেখা দেবী হাসি চাপার চেষ্টা করে রুমাকে ইশারায় ডেকে বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, চল রুমা, আলাপ করে আসি, যাবি?

রুমা সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়লো। তারপর বললে, যদি কিছু মনে করে? যদি আলাপ না করে?

—চল না। বলে শ্রীলেখা দেবী হাঁটি হাঁটি পা পা এগিয়ে গেলেন। পিছনে পিছনে রুমা।

গায়ত্রী দেবীর চাকর ততক্ষণে জলটেরী কেটে এগারো নম্বরের দরজার সামনে হাজির হয়েছে। বোধহয় ছিল নীচের তলার কোন একটা ঘরে। সিনেমার হিরোর মত সাজগোজ তার, পায়ে হাওয়াই স্যাণ্ডেল, পরনে থ্রি কোয়ার্টার প্যাণ্ট আর গায়ে পাঞ্জাবি চাপিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে গায়ত্রী দেবীর হুকুম তামিল করার অপেক্ষায়।

শ্রীলেখা দেবী সাহসে ভর করে এগারো নম্বরের দরজা পর্যন্ত এলেন বটে, কিন্তু চাকরটাকে দেখে ভরসা করে গায়ত্রী দেবীকে ডাকতে পারলেন না।

ফিরে যাচ্ছিলেন তাই। মিসেস ভটচায পথ আগলে দাঁড়ালেন। তারপর ঠোঁট টিপে হেসে বললেন, চাকর না নাগর, মা ভবানীই জানেন!

শ্রীলেখা দেবীও হেসে ফেললেন। বললেন, বিধবা তো শুনেছি, পোষাক আশাকটা একবার দেখতাম!

রুমা বললে, আচ্ছা মা, ফিলম্ স্টার কি থান পরে থাকবে? তুমি কি?

রুমার কথা শুনে সশব্দে হেসে উঠলেন শ্রীলেখা দেবী আর মিসেস ভটচায। রুমাও।

সঙ্গে সঙ্গে এগারো নম্বরের পর্দা ফাঁক হলো। বছর পাঁচেকের একটা সুন্দর ফুটফুটে ছোট্ট মুখ ভয়ে ভয়ে উঁকি দিলো বাইরে। তারপর ফিসফিস করে মেয়েটি কি যেন বললে চাকরটাকে। চাকরটা মাথা নাড়লো। বাচ্চা মেয়েটা আবার ভেতরে ঢুকে গেল।

একটু পরেই ঘরের ভেতরে একটা চাপা স্বর শোনা গেল।—যা না লক্ষ্মীটি, চেয়ে আন। যা না…

আবার বাইরে উঁকি দিলো মেয়েটা। লজ্জা লজ্জা ভাব করে এদিক ওদিক চাইলো, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো রুমাদের দিকে।

রুমা ডাকলো।—শোনো।

শ্রীলেখা দেবী!—কি নাম তোমার?

—তুতুন।

—তোমার মা কি করছেন? তোমার মা হন তো গায়ত্রী দেবী?

মেয়েটি লজ্জা পেলো যেন। বললে, হ্যাঁ। মা তো আসতে বললো তোমাদের কাছে। বললো, একটু কাজল চেয়ে আন না লক্ষ্মীটি, আনতে ভুলে গেছি।

—কাজল?

তুতুন ঘাড় নাড়লে।—হ্যাঁ, মা যে কাজল আনতে ভুলে গেছে।

রুমা বললে, এসো তুমি আমার সঙ্গে, আমি পরিয়ে দিচ্ছি।

—না। তুতুন সুর করে টেনে টেনে বললে, মা পরবে। কাজল নেই বলেই তো মা বেরুতে পাচ্ছে না।

রুমা আর শ্রীলেখা দেবীর মুখ চাওয়াচাওয়ি হলো। মিসেস ভটাচয হাসি চাপলেন।

তারপর রুমা বললে, চলো দিচ্ছি।

রুমার পিছনে পিছনে শ্রীলেখা দেবী আর মিসেস ভটচাযও এগিয়ে গেলেন ছ' নম্বরের দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রজমাধববাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

স্ত্রীর ভয়েই হয়তো এতক্ষণ ঔৎসুক্য চেপে রেখেছিলেন।

মিসেস ভটচায ততক্ষণে ছ'নম্বরে গিয়ে ঢুকেছেন। আর শ্রীলেখা দেবীর সঙ্গে তাঁকে ঢুকতে দেখেই মিস্টার সেন ছ'নম্বর আর সাত নম্বরের মাঝের দরজা দিয়ে সুড়ুৎ করে ওপাশে চলে গেলেন

রুমা জিগ্যেস করলে, তোমার মা একা এসেছেন?

তুতুন পাকা মেয়ের মত বললে, একা আসবে মা? আমার দিদা এসেছে না সঙ্গে। অর্জ্জুন এসেছে।

—অর্জ্জুন কে?

তুতুন হাসলো।—ও একটা চাকর।

অর্থাৎ একমাত্র চাকর নয়। শ্রীলেখা দেবী আর মিসেস ভটচায চোখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসলেন। অবশ্য বোঝা গেল না, চাকরের নাম শুনে, না মেয়েটার পাকা পাকা কথা শুনে।

রুমা ততক্ষণে কাজললতাটা বের করে দিয়েছে তুতুনের হাতে। আর সেটা নিয়েই তুতুন বললে, যাই এখন, কেমন? প্লেনে উঠে থেকে মা কেবল ভাবছে কাজল আনতে ভুলে গেছে বলে।

শ্রীলেখা দেবী বললেন, তোমরা প্লেনে এসেছো বুঝি?

—বাবাঃ ট্রেনে আর কোথাও যাচ্ছি না। মাকে দেখলেই স্টেশনে লোকগুলো এত ভিড় করে। অটোগ্রাফ দিন, অটোগ্রাফ দিন....মা বলেছে, আর কখনো ট্রেনে যাবো না।

মেয়েটার কথাগুলো এতক্ষণ মন্দ লাগছিল না। এবার কিন্তু সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। ইচ্ছা হলো ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিতে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয় বলেই বললেন, যাও, তোমার মা কাজল না পেলে বাইরে বেরুতে পারবেনা।

—যাই; বলেই মেয়েটা টা-টার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে পালালো।

মিসেস ভটচায মন্তব্য করলেন, ফুল হইতে না হইতেই পাইকা কাঁঠাল হইয়া গেছে।

রাত্রির আহারের সময় হিমাদ্রিবাবু এসে হাজির হন প্রতিদিন। হাঁকডাক করেন চাকর ঠাকুরদের। বোর্ডারদের ঘরে ঘরে গিয়ে

জিগ্যেস করেন, আর কিছু দেবে কিনা, রান্না কেমন হয়েছে। পেটের গোলমাল থাকে তো জানাতে, ঝাল বা তেল না দিয়ে স্রেফ আলু পেঁপে কাঁচকলা সেদ্ধ ঝোলের ব্যবস্থা করে দেবেন, ইত্যাদি। আর যদিও ঘরে ঘরে গিয়ে সকলের সঙ্গেই বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করেন, তবু দু'একজনের ক্ষেত্রে যেন একটু বেশী নজরই দিচ্ছিলেন এ-কদিন। মিস্টার সেনের প্রতি একটু বেশী দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য অন্যায় নয়। তিনি পুরো একটা ফ্যামিলি নিয়ে এসেছেন, মোটা টাকাই দিয়ে যাবেন। আর প্রফেসর ঘোষ যদিও একা, এমন কিছু মোটা অঙ্কের লাভ হবে না তাঁর ওপর দিয়ে, তবু তিনি বিখ্যাত মানুষ, কত বড় বড় লোকের সঙ্গে চেনাজানা, হয়তো খুশী হলে আরো খদ্দের জুটিয়ে দেবেন। ওদিকে তেরো নম্বরের বুড়ি-মার খবরও নিতে হয়। কারণ বুড়ো মানুষটার ওপর প্রথম থেকেই কেমন একটা মায়া জন্মে গেছে।

কিন্তু আজ হঠাৎ একটু ব্যতিক্রম দেখা গেল তাঁর ব্যবহারে।

ঘরে ঘরে একবার উঁকি দিয়ে এসেই ঢুকলেন এগারো নম্বরে। গায়ত্রী দেবীর ঘরে। গায়ত্রী দেবীদের ঘরে তখন ভাত দেওয়া হচ্ছে।

সে কি হাঁকডাক। সে কি তদ্বির তদারক।

পাশের ঘর থেকে কেউ শুনে হাসলো, কেউ বা কিছু একটা মন্তব্য করলো। কিন্তু চটলেন মিস্টার সেন। প্রফেসর ঘোষও ক্ষুণ্ন হলেন। হিমাদ্রিবাবুর কাছ থেকে এ-কদিন বিশেষ দৃষ্টি পাওয়া অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল বলেই নিজেদের প্রতিপত্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে বেশ একটা আত্মগর্ব অনুভব করছিলেন তাঁরা। আজ তার ব্যতিক্রম দেখে চটে গেলেন।

একই টেবিলের দু'ধারে প্রফেসর ঘোষ আর সুপ্রিয়।

সুপ্রিয়র মনটা বেশ প্রফুল্লই ছিল, সারাটা দিন রুমার কাছে

কাছে থাকতে পেয়ে। তাই এগারো নম্বর ঘরের নতুন বোর্ডারদের হিমাদ্রিবাবু তদ্বির করছেন কি না করছেন তা নিয়ে তার মাথাব্যথা ছিল না।

কিন্তু প্রফেসর ঘোষের কাছে ব্যাপারটা ভাল লাগলো না। স্থপ্রিয়কে বলেই ফেললেন।—হিমাদ্রিবাবু দেখছি ঐ সিনেমা-স্টারকে নিয়েই মেতেছেন। আর যেন বোর্ডার নেই।

স্থপ্রিয় হেসে বললে, অনেক টাকা বাগাতে পারবেন তো! আর টাকা তো আজকাল ওদেরই, একটা ছবিতে নামলেই....

প্রফেসর ঘোষ বিরক্ত হয়ে বললেন, হ্যাঁ, নামতে হয়, ওঠবার রাস্তা নেই। আর টাকাই কি সব নাকি?

—তা অত টাকা পেলে বলতাম টাকাই সব, সারা জীবনে একজন ব্যবসাদারও যা রোজগার করতে পারে না, ওরা একটা ছবিতেই.......

প্রফেসর ঘোষের কণ্ঠে উষ্মা প্রকাশ পেলো এবার।—রাখুন মশাই, জীবনটা কি শুধু টাকা? একটা কালচার, আর্ট...... জীবনকে পূর্ণতা দিতে পারে যে-সব আদর্শ, তার কিছুই তো নেই ওদের।

স্থপ্রিয় প্রতিবাদ করতে সাহস পেলো না, সায় দিয়ে বসলো প্রফেসর ঘোষের কথায়।

আর প্রফেসর ঘোষ উৎসাহ পেয়ে বললেন, সিনেমা! এই যে কি এক হুজুগ হয়েছে, দেশের সর্বনাশ করছে। এই যে সারা ভারতবর্ষে এত সব মন্দির ছড়িয়ে রয়েছে, কত সব প্রাচীন স্থাপত্য ভাস্কর্য, সে-সবের দিকে চোখ নেই কারও, যত লাফালাফি সিনেমা নিয়ে, একটা স্মাষ্টি......

কথা শেষ করলেন না প্রফেসর ঘোষ, কারণ ততক্ষণে আরেক-জনের কথা মনে পড়ে গেছে তাঁর। বললেন, যাও বা দু'একজন

আসে, শিল্পের দিকে চোখ নেই তাদের, শিল্পরুচিই নেই। দেখলেন না, পাঞ্জাবী মেয়েটাকে, কোণারকের মন্দিরে পূজো দিতে পেলো না বলে আফশোস তার। শেষ পর্যন্ত ঐ নবগ্রহের পূজো দিয়েও এলো।

আরো হয়তো কিছু বলতেন প্রফেসর ঘোষ, কিন্তু তার আগেই সুপ্রিয়র খাওয়া হয়ে গেছে, তাই উঠে পড়লো সে। কিংবা আরো লেকচার শুনতে হবে এই ভয়ে।

আর বাইরে আঁচাতে এসে একেবারে গায়ত্রী দেবীর সামনা-সামনি পড়ে গেল। গায়ত্রী দেবীও তখন আহার শেষ করে আঁচাতে এসেছেন।

সে কি! সিনেমা-স্টারও খাওয়ার পর আঁচায়? কিংবা এই ধরণের কিছু একটা ভেবেই কেমন ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে গেল সুপ্রিয়। তারপর সামলে নিয়ে বললে, আপনি নিন।

গায়ত্রী দেবী মধুর করে হাসলেন, আপনি নিন না আগে।

—না, আপনি আগে নিন। এমনভাবে বললো সুপ্রিয়, যেন বিনয়ে সত্যিই বিগলিত হয়ে গেছে সে।

গায়ত্রী দেবী হেসে এগিয়ে গেলেন, ড্রামের জলে ঘটি ডুবিয়ে জল নিলেন, হাত ধুলেন, কুলকুচি করলেন, আর সুপ্রিয় বিমুগ্ধ তন্ময়তায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো, মনে হলো গায়ত্রী দেবীর ভাবেভঙ্গিতে, চলনে-বলনে, হাসিতে কটাক্ষে যেন এক-একটি মুদ্রা ফুটে উঠছে। যে-মুদ্রা মন্দিরের গায়ের ভাস্কর্যে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন প্রফেসর ঘোষ।

সুপ্রিয়র হাত মুখ ধোয়া হতেই গায়ত্রী দেবী জিগ্যেস করলেন, আপনি কতদিন এসেছেন এখানে?

সুপ্রিয় উত্তর দিলো।

প্রশ্ন এলো, এখানকার জলে উপকার পেয়েছেন কিছু? মাকে নিয়ে এলাম ডাক্তারের পরামর্শে, হবে কিছু উপকার?

সুপ্রিয় হেসে বললে, কারো হয়, কারো হয় না।

এরপরই গায়ত্রী দেবী যা বলে বসলেন, সুপ্রিয় তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

গায়ত্রী দেবী মৃদু হেসে বললেন, আসুন না ঘরে। একটু গল্প-গুজব করা যাবে।

সুপ্রিয় ঘাড় নাড়লো। তারপর গায়ত্রী দেবীর পিছনে পিছনে গিয়ে ঢুকলো এগারো নম্বরে। আর চৌকাঠ ডিঙোবার আগের মুহূর্তে ফিরে তাকালো সে ছ'নম্বরের দিকে, হয়তো অকারণেই। আর ফিরে তাকাতেই রুমার সঙ্গে চোখাচোখি হলো। চোখ নয়, একজোড়া অগ্নিগোলক। ক্রুদ্ধ একজোড়া চোখ।

বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। কিন্তু তখন আর উপায় নেই। গায়ত্রী দেবীর পিছনে পিছনে পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়তে হলো তাকে।

গায়ত্রী দেবীর মা বাতের ব্যথায় পড়েছিলেন একটা তক্তপোশে। অন্যটায় বসে একটা বড় আকারের ইংরেজী ছবির কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিল তুতুন।

গায়ত্রী দেবী চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বসতে বললেন। তারপর হোটেলের খবরাখবর নিতে শুরু করলেন। বেশ বোঝা গেল, হোটেল সম্পর্কে তিনি হতাশ হয়েছেন। হতাশ হবারই কথা। কারণ যে-সব হোটেলে তিনি এর আগে উঠেছেন সেগুলো সবই বড় বড় শহুরে হোটেল। তার তুলনায়........

গায়ত্রী দেবী বললেন, বাড়ি পেলাম না বলেই হোটেলে উঠতে হলো, দূর থেকে তো বুঝতে পারি নি এমন হোটেল!

সুপ্রিয় বললে, তবু এ হোটেল নাকি রীগ্যাল হোটেলের চেয়ে ভালো।

—রীগ্যাল? সেটা কোথায়?

সুপ্রিয় বললে, উঠে গেছে। আগে ছিল।

ক্রমশঃ কথাবার্তা ঘরোয়া হয়ে উঠলো। সুপ্রিয় জিগ্যেস করলো, এখন কি ছবি করছেন? গায়ত্রী দেবী জিজ্ঞেস করলেন, আজ কোথায় গিয়েছিলেন আপনারা দল বেঁধে?

সুপ্রিয় হেসে বললে, কয়েকটা দিন আগে এলে কোণারকটা একসঙ্গে ঘুরে আসতেন!

—আমার যে শুটিং ছিল!

ব্যস্। একটা ক্ষীণ সূত্র জুটে যেতেই আলাপ জমে গেল, আলোচনা সিনেমার দিকে মোড় নিলো। সুপ্রিয় এতক্ষণ ছ'একটা টুকরো টুকরো কথা বলছিল, প্রশ্ন করছিল, কিন্তু সারাক্ষণই বুকের ভেতরটা খচখচ করছিল তার। ক্ষণে ক্ষণেই মনে পড়ে যাচ্ছিল, কিংবা বলা যায় মনের চোখে পড়ছিল রুমার সেই অগ্নিক্রুদ্ধ চোখ-জোড়া। না জানি, কি ভেবেছে রুমা, সুপ্রিয়কে গায়ত্রী দেবীর সঙ্গে এগারো নম্বরে ঢুকতে দেখে! সারাক্ষণ আতঙ্ক, রুমা না ভুল বোঝে। অভিমানে কিংবা রাগে রুমা না সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়। রুমা যত কাছে আসছে তার, যত বেশী অন্তরঙ্গ হচ্ছে সে, দিনে-দিনে ততই যেন ভয় বাড়ছে সুপ্রিয়র। রুমাকে হারাবার ভয়। না পাওয়ার চেয়ে পেয়ে হারানোর ব্যথাটা বেশী বলেই হয়তো। কিন্তু সিনেমার কথা এসে পড়তেই সুপ্রিয় গল্পগুজবে এমন মশগুল হয়ে গেল যে বুকের খচখচ কাঁটাটাকে ঘড়ির কাঁটার মতই উপেক্ষা করলো।

শুধু সুপ্রিয়ই নয়, গায়ত্রী দেবীও ভুলে গেলেন যে সুপ্রিয়র সঙ্গে তাঁর সদ্য আলাপ। এত ঘনিষ্ঠ হবার মত বা এত প্রাণ খুলে কথা বলার মত কেউ নয়।

গায়ত্রী দেবীর মা বাতের ব্যথায় কাৎরাতে কাৎরাতে ছ'একটা কথা বলছিলেন, ঘুমে চোখ বুজে এলো তাঁর।

বললেন, রাত অনেক হয়েছে রে।

—তুমি শোও না, তোমার ঘুম পাচ্ছে বলে কি আমাকেও শুতে হবে নাকি! চেঁচিয়ে উঠলেন গায়ত্রী দেবী।

সুপ্রিয়ও চমকে উঠেছিল গায়ত্রী দেবীর ব্যবহারে। এত সুন্দর করে যে কথা বলে, এত ভদ্র ব্যবহার যার, সে কিনা মাকে এমন বিশ্রী ধমক দিয়ে বসলো!

গায়ত্রী দেবীর মা চুপ করে গেলেন। মুখটা দেখে বোঝা গেল সুপ্রিয়র উপস্থিতিতে এ ধরণের ধমক খেয়ে তিনি যেন লজ্জা পেলেন।

তবু মেয়েকে প্রায় তোষামোদের সুরে বললেন, আহা, রাগিস কেন, বুড়ো মানুষ বললাম না হয় একটা অন্যায় কথা!

কথাটা অন্যায় কেন, আর এমন ভঙ্গিতেই বা তিনি তোষামোদ করছেন কেন বুঝতে বাকি রইল না সুপ্রিয়র। মেয়ের রোজগারে নির্ভর করতে হয় তাঁকে, সেইজন্যেই কি?

তুতুন ছবি দেখছিল পত্রিকাটার পাতা উল্টে, সে একবার মার দিকে তাকালো, একবার দিদিমার দিকে, তারপর শুয়ে পড়লো। মায়ের মেজাজ দেখে বোধ হয় কিছু বলতে সাহস পেল না।

গায়ত্রী দেবী যেন স্বগতোক্তি করেই বললেন, আপনারা তো ভাবেন কত সুখের জীবন আমাদের। কত টাকা!

—নয়?

—মোটেই না। ঘরে এতটুকু শান্তি নেই মা আর মেয়েকে নিয়ে। বাইরে বের হবার উপায় নেই, লোকে ভিড় করে আসবে। অভিনয় কি একটা যে-সে ব্যাপার, একটা আর্ট, সাধনা দরকার তার জন্যে।

সুপ্রিয় বললে, তা তো বটেই।

—তবেই বলুন, শান্তি না পেলে অ্যাকটিং করবো কি করে?

তার জন্যে ভাবতে হয় না? চিন্তা করতে হয় না? সাধনা করতে হয় না? জানেন, যখন এক-একটা রোল করি, দিনরাত ঐ ভাবনা, কেমন করে ঠিকমতো করতে পারবো। এও তো সৃষ্টি! অথচ কোন সম্মান দেন না আপনারা, শুধু ভাবেন, অনেক টাকা রোজগার করছে।

সুপ্রিয় সায় দিলো।—তা সত্যি! এই তো আমার রুম-মেট প্রফেসর ঘোষ—যাচ্ছেতাই বললেন আপনাদের সম্পর্কে।

—প্রফেসর ঘোষ?

—হ্যাঁ, ঐ সব মন্দির-টন্দির নিয়ে কি সব আর্টের বইটই লেখেন।

—আর্ট? হঠাৎ সশব্দে খিলখিল করে হেসে উঠলেন গায়ত্রী দেবী। বললেন, মন্দিরে আর্ট? ঐ সব বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি মূর্তিগুলো? তবেই বলুন, একজন প্রফেসর, শিক্ষিতও হবেন হয়তো, অথচ অভিনয়ের কিছু বোঝেন না। অভিনয়কে মর্যাদা দেন না, হুজুগে মাতেন শুধু মূর্তি নিয়ে।

সুপ্রিয় বললে, মূর্তিটুর্তির মধ্যেও অবশ্য আর্ট আছে।

—কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। ও-সব পাগলামি। দেখুন, ওসব আমরা বুঝি, ঐ আর্ট বলে যাচ্ছেতাই ছবি ছাপেন সব বইয়ের মধ্যে। বইয়ের কাটতি বাড়াবার জন্যে। আর্ট না ছাই, দেখুন—কি নাম যেন আপনার?

—সুপ্রিয়।

—হ্যাঁ। সুপ্রিয়বাবু শুনুন, এই লোকগুলো দেশের কালচারের শত্রু। এরাই লোকের টেস্ট নষ্ট করছে। এ সব ছবি দেখে লোকে, আর চায় যে সিনেমাতেও এমনি সব.............

কথা শেষ হলো না। তার আগেই গায়ত্রী দেবীর মা তন্দ্রার ঘোর থেকে হঠাৎ জেগে উঠে বললেন, ঘুমোবি না পানু?

মুখে চোখে একটা হিংস্র ভঙ্গি করে মা'র দিকে তাকালেন গায়ত্রী দেবী, আর সেই মুহূর্তেই সুপ্রিয় উঠে পড়লো। বললে, আজ চলি এখন!

সুপ্রিয় সবে পর্দা সরিয়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে এসেছে অমনি শুনলো তুতুন বলছে, বাবা বাবা, তখন থেকে ভ্যাজ ভ্যাজ ভ্যাজ ভ্যাজ······

পরক্ষণেই আরেকটা শব্দ শুনলো সুপ্রিয়। না কথা নয়, একটা শব্দ। তুতুনের গালে ঠাস করে একটা চড় বসালেন, না, মশা মারলেন গায়ত্রী দেবী, সুপ্রিয় বুঝতে পারলো না!

ও শুধু অন্যমনস্কভাবে নিজের গালে হাত দিলো। কারণ, ঠিক সেই মুহূর্তে সুপ্রিয় দেখতে পেলো এবং বুঝলো যে ওদিকের বারান্দায় মাধবীলতার সেই দোদুল্যমান উঁকিঝুঁকির আড়ালে আবছা অন্ধকারে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল রুমা। সুপ্রিয় সেদিকে তাকাতেই বোঁ করে ঘুরে দপদপ করে পা ফেলে ছ'নম্বর ঘরে ঢুকে পড়লো রুমা এবং পরক্ষণেই দড়াম করে কপাট বন্ধ করে সশব্দে খিল দিয়ে দিলো।

সকালের কাগজ পড়েই চক্ষু চড়কগাছ মিসেস ভটচাযের। রেলের কর্মচারীরা নাকি ধর্মঘট করবে বলে শাসিয়েছে। সর্বনাশ। আর মাত্র একটা সপ্তাহ ছুটি ব্রজমাধববাবুর, এর মধ্যে যদি স্ট্রাইক করে বসে রেলের লোক, তা হলে ফিরতে পারবেন না তিনি, চাকরিতে জয়েন করতে পারবেন না! শুধু কি তাই, মিসেস ভটচায মনে মনে একটা হিসেবও করে নিলেন, প্রতিদিনের জন্যে কত বাড়তি টাকা তুলে দিতে হবে হিমাদ্রিবাবুর হাতে।

হোটেলওয়ালা তো শুনবে না যে ট্রেন বন্ধ আছে বলে যেতে পারছেন না।

ব্রজমাধববাবু নীচের উঠোনে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিব ছুলছিলেন।

তিনি ফিরে আসতেই মিসেস ভটচায বললেন, সংবাদ ভাল না, র‍্যালে ধর্ম্মঘট হইবে খবরের কাগজে ল্যাখছে।

—ক্যান? চমকে উঠলেন ব্রজমাধববাবু।

আর মিসেস ভটচায দৈনিক পত্রিকাখানা এগিয়ে দিলেন স্বামীর দিকে।

পড়ে চক্ষু চড়কগাছ।—তাইলে, তাইলে.......

বসে পড়লেন তিনি তক্তপোশের ওপর। নানা রকম জল্পনা-কল্পনা চললো। তারপর ঠিক করে ফেললেন, রিস্ক লওয়াটা বুদ্ধির কাজ হইব না।

অতএব পরের দিনই চলে যাবেন ঠিক করলেন ব্রজমাধববাবু। যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। এখন তাড়াতাড়ি পালাতে পারলে বাঁচেন।

নিজের মনেই বললেন, র‍্যালের লোকগুলার হুজুগ পাইলেই হইল। একটা কিছু হইলেই সব ইউনাইট্ করব, সরকাররে থ্রেটন করব। সরকারও হইছে এমন, ইউনিয়ানগুলারে ভাইঙ্গা দিতে পারে না?

ব্রজমাধববাবুও বিরক্ত হয়েছিলেন খবরটা পড়ে। বললেন, ক্যাবল ডিমাণ্ড আর ডিমাণ্ড। একবার ভাববে না গভরমেণ্ট টাকাটা দেবে কোন ভাণ্ডার থিকা। এডারে ডিমক্রেসী কয় না, কয় মবরুল। দশটা লোক এক জোট হইলেই কি অন্যায়টা ন্যায় হইয়া যাইবে।

স্বামীর কাছ থেকে আরো কিছু বলার কথা পেয়ে গেলেন

মিসেস ভটচায। তাই আর অপেক্ষা করতে পারলেন না, বেরিয়ে পড়লেন খবরটা রাষ্ট্র করবার জন্যে।

কিন্তু কেউই যেন কান দিলো না তাঁর কথায়। কেউই চিন্তিত হয়ে উঠলো না। একে একে সকলেই বেড়াতে বেরিয়ে গেল।

মিস্টার সেন বললেন, ও স্ট্রাইকের কথা হামেশাই হচ্ছে। সত্যি সত্যি কি আর স্ট্রাইক হবে।

আর শিখিনী স্নান সেরে উঠে আসছিল, খবর শুনে সে হেসে উঠে বললে, হরতাল তো হর দিন লেগে আছে, আর আমি তো আজ তুফেরের বাসে চলে যাবো। পুরী যাবো, পুরী থেকে কাল যাবো হরদোয়ার।

বলেই নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো সে। সাজগোজ করে বেরিয়ে এলো, ঘরে তালা লাগালো। বুড়ি এই ভোর সকালেই গেছে বিন্দুসরোবরে ডুব দিতে।

বুড়ির উনোনটার দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বললে, জংলী। তারপর মুখ বিকৃত করে সেদিকে একটুকরো ঘৃণা ছুঁড়ে দিয়ে নেমে গেলো ওদিকের কাঠের সিঁড়ি বেয়ে।

শিবনাথবাবু যদ্দিন ছিল, তবু একটা আশা ছিল, হয়তো মোহান্তি সাহেবকে বলে চাকরিটা বাগাতে পারবে। কিন্তু এখন থেকে লাভ নেই, শুধু টাকা খরচ। আর শান্তিতে থাকারও উপায় নেই বুড়ি আসার পর থেকে। দিনরাত এমন একটা বিরক্তিকর রুম-মেট নিয়ে কি শান্তিতে থাকা যায়। ওদিকে কে এক বাংগালী ফিল্ম-স্টার এসেছে, তাকে নিয়েই ব্যস্ত হোটেলওয়ালা। খেতে বসার পর আর রোটি লাগবে কি না, দু'বার জিগ্যেস করতে আসে না নোকর-ঠাকুর।

তাই লিঙ্গরাজ মন্দিরের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো শিখিনী। যাবার

আগে পূজো চড়িয়ে যাবে, যদি চাকরিটা পাওয়া যায়। দেওতা খুশী হলে সবই সম্ভব।

বিন্দুসরোবরের পাশ দিয়ে রাস্তা। এদিকে কয়েকটা পুরোনো ঘিঞ্জি বাড়ি, ধর্মশালা, দোকানপাট, আর ওদিকে বিরাট সরোবর, পানা আর পাঁকে জলের রঙ সবুজ হয়ে গেছে। তারই চারপাশে বাঁধানো ঘাট। ঘাটে তীর্থযাত্রীদের ভিড়, স্নান করছে সকলে।

যাত্রীদের মধ্যে বুড়িকে দেখতে পেলো শিখিনী, পাণ্ডার ছড়িদারটা মন্ত্র পড়াচ্ছে, বুড়ি স্তব করার ভঙ্গিতে এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে আছে চোখ বুজে!

সেদিকে তাকিয়ে শিখিনী আবার মনে মনে বললে, জংলী।

তারপর চক পার হয়ে লিঙ্গরাজের মন্দিরে ঢুকলো স্যাণ্ডেল খুলে।

এক দল পাণ্ডা পিছু নিলো তার। শিখিনী তাদেরই মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিলো। ফুল বেলপাতা পূজোর সন্দেশ কিনলো একটা দোকান থেকে। ভিড় ঠেলে অন্ধকার সুড়ঙ্গ পার হয়ে গিয়ে দাঁড়ালো মন্দিরের ভেতর, বিগ্রহের সামনে।

কি আশ্চর্য। সেই বিগ্রহের সামনে অন্ধকারের ভিড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কখন যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল সে। আর তন্ময়তা থেকে ভক্তিভাব।

চাকরিটা যাতে হয়, সংসারের আর্থিক টানাটানি থেকে যাতে পরিত্রাণ পায়, সেই উদ্দেশ্যেই পূজো দিতে এসেছিল। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে প্রদীপের ঈষৎ আলোয় বিগ্রহের যেটুকু দেখতে পেল, বড় বড় ধুনুচি থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠা ধোঁয়ার আবরণ ভেদ করে যে বিগ্রহ দেখতে পেল, তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সমস্ত মন কেমন যেন প্রসন্ন হয়ে উঠলো।

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো শিখিনী, অনেকক্ষণ পড়ে রইলো, আর উঠলো যখন, দু'চোখ বেয়ে দরদর ধারায় জল পড়ছে।

বিন্দু সরোবরে স্নান সেরে বুড়ি কখন যে সিঁদুর আর বাতাসার চুবড়ি হাতে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্য করে নি শিখিনী। আর বুড়িও প্রথমটা চিনতে পারেনি তাকে অন্ধকারে।

একটা মেয়েমানুষ ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে, এই দেখে অপেক্ষা করছিল বুড়ি। আহা, এমন ভক্তি যে মেয়ের, জীবন তার সার্থক। তাই বুড়ির বড় ইচ্ছে হলো, পূজো দেওয়া প্রসাদী চুবড়ি থেকে বেলপাতায় মুছে নেওয়া সিঁদুর মেয়েটির সিঁথিতে দিয়ে দিতে। এত ভক্তি যখন, নিশ্চয়ই এয়োস্ত্রী। সধবা মেয়ে, রঙিন কাপড় পরেছে যখন।

তাই শিখিনী উঠে দাঁড়াতেই বুড়ি বললে, দাঁড়াও মা, দাঁড়াও, একটু সিঁদুর দিয়ে নি, এ জন্মে তো সব হারিয়েছি, বিন্দে বলতো, কুমি তোর সোয়ামী নয়, লাখ টাকার জমিদারী, তাও হারালাম মা গত জন্মের পাপে, তা তোমার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে জীবন ধন্য করবো। পরের জন্মে যাতে....

শিখিনী ততক্ষণে চিনতে পেরেছে বুড়িকে। কিন্তু বুড়ি এমন স্নেহের চোখে তাকালো, শিখিনীর চিবুকে হাত দিয়ে মুখটি তুলে ধরলো যে আপত্তি করতে পারলো না। কেমন যেন ভাল লাগলো ওর। তাই শুধু বললে, বুড়ি মাঈ ?

—তুমি বাছা! মুখ দেখে আর গলা শুনে বুড়িও চিনতে পেরেছে ততক্ষণে। বুড়ির চোখেও জল এসে গেল। বললে, ভুল করেছিলাম মা, ভুল করেছিলাম। তোমার মা অনেক পুণ্য। এত ভক্তি তোমার যে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে···

বলে কপালে একটা টিপ পরিয়ে দিলে বুড়ি।—কুমারী মেয়ে, কোঁটা দিলাম তাই। ফোকলা দাঁতে হাসলো বুড়ি।

আর শিখিনীর কি হলো কে জানে, বাঙালীদের মতই পায়ে হাত দিয়ে বুড়িকে প্রণাম করলো সে। মনটা হঠাৎ খুশী হয়ে উঠলো। শুধু বলতে পারলো না, আমরা তো সিঁথিতে সিঁদুর দিই না বুড়ি মাঈ, বিয়ের পর আমরা কপালে টিপ দিই।

বুড়ির দেওয়া সিঁদুরের কৌটাটায় সুখের ভবিষ্যৎ দেখতে পেল যেন শিখিনী।

তবু বলতে পারলো না, চোখের জল তার ভক্তিতে নয়, ধুনোর ধোঁয়ায়।

—ভগমান তোমার ভাল করবেন। বুড়ি তখনো বলে চলেছে। বললে, বাইরেটা দেখেই লোক চিনতে যাই মা, কি ভুলই করি। তোমার মত মেয়েকে কত অকথা-কুকথাই না বলেছি। নাও, হাঁ করো…

বলে শিখিনীর মুখের কাছে এক টুকরো বাতাসা তুলে ধরলো, আর শিখিনী মুখব্যাদন করতেই সেটা টুপ করে তার মুখে ফেলে দিলো।

তারপর দু'জনে একসঙ্গেই ফিরলো পান্থপাদপে।

হাতে চুবড়ি নিয়ে হোটেলের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি প্রসাদ বিলি করতে শুরু করলো বুড়ি।

বারো নম্বরে খালি ঘরখানার সামনে একমুহূর্ত দাঁড়ালো, ঘরটার ভেতর উঁকি দিলো একবার। একটু যেন ভিজে এলো মনটা। আহা, মানুষটাকে অমন করে গালাগালি না দিলেই হতো। কাজের লোক, না হয় সারারাত খটা খট খটা খট করেছে। বুড়ি ভাবলে, তার বড় ছেলে বেঁচে থাকলে ঐ শিবনাথবাবুর মতই বয়স হতো হয়তো। লোকটা কি রেগেমেগেই চলে গেল, না লজ্জায়?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দু'পা এগিয়ে গেল এবার। দরজার কড়া নাড়লো।

মিসেস ভটচায বেরিয়ে এলেন।—ডাকতে আছেন আমারে!

বুড়ি হাসলো, বেলপাতায় মুছে আনা পূজোর সিঁদুর টেনে দিলো মিসেস ভটচাযের সিঁথিতে। তারপর বললে, হাঁ করো তো মা!

প্রসাদের কণিকা মিসেস ভটচাযের মুখে ফেলে দিতেই তিনি বুড়িকে প্রণাম করলেন।

—কই, ছেলে কই?

মিসেস ভটচায ডাকলেন, টম!

টম বেরিয়ে আসতেই বুড়ি বললে, হাঁ করো তো বাবা!

টম লজ্জা পেয়ে মার হাঁটু জড়িয়ে ধরলো।

—লজ্জা কেন গো, হাঁ করো। আমার পাঁচ বেটা বেঁচে থাকলে ঘর-ভরা নাতি নাতনি থাকতো তোমার বয়সের। নাও, হাঁ করো···

হাত ধুয়ে শুদ্ধ না হলে তো প্রসাদ দেওয়া যায় না, তাই একটার পর একটা ঘরে যায় বুড়ি, আর বলে, হাঁ করো।

প্রফেসর ঘোষ, সুপ্রিয়, শ্রীলেখা দেবী, রুমা, রেশম, মিষ্টার সেন সকলকেই প্রসাদ দিলো বুড়ি, দিলো না শুধু বুড়ো রমণীরঞ্জন দত্তকে। কেমন লজ্জা পেল, বয়সের জন্যেই হয়তো।

তাই রমণীবাবুর ছেলেকে ডেকে বললে, হাঁ করো তো বাবা।

তাকে প্রসাদ দিয়ে তার হাতেই রমণীবাবুর প্রসাদটা পাঠিয়ে দিলে। আর রমণীবাবু যদি তাকে দেখতে পান, এই ভয়ে ঘোমটাটা একটু বেশী করে টেনে দিলো বুড়ি।

তারপর ফিরে এসে শিখিনীকে বললে, দুপুরের বাসে পুরী যাচ্ছি মা, কটুকথা বলেছি বলে কিছু মনে করো না।

শিখিনী বিস্মিত হয়ে বললে, তাজ্জব বাত, দুফেরের বাসে তো আমিও পুরী যাবো। এক সাথ যাবো তা হলে।

বুড়ি খুশী হলো। বললে, জগন্নাথ দর্শন না করে কেউ কি

ফেরে এখান থেকে। বেশ হবে, একসঙ্গেই যাবো। তুমি মেয়ে সত্যি ভালো, ধর্ম আছে, ভক্তি আছে তোমার। যা ভক্তি দেখলাম তোমার আজ, চক্ষু সাথক হলো। গালাগাল দিয়েছি কতবার। কিছু মনে করো না মা। বুড়ো মানুষ, ক্ষ্যামা ক'রো।

শুধু শিখিনীকে বলেই ক্ষান্ত হলো না, হোটেলের যাকেই সামনে পায় তাকেই বলে, পাঞ্জাবী হলে কি হবে মেয়েটি সত্যিই ভালো। আর শিখিনী বলে, বুড়ি মাঈ বহুৎ ভালো, দিল্ সাচ্চা আছে বুড়ি মাঈয়ের। যারা শুনলো, হাসলো তারা, আবার বিস্মিতও হলো। রহস্যটা কেউই ধরতে পারলো না।

এক সঙ্গেই চলে গেল ছ'জনে ছপুরের বাসে। শিখিনী আর বুড়ি। হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালো বাসটা, ক্যাপিটেল থেকে ফিরে পুরী যাওয়ার পথে।

হিমাদ্রিবাবু পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে নিলেন। কৌতুকী মালপত্র তুলে দিলো। টুকিটাকি ছ'একটা স্যুটকেশ পুঁটলি যা ছিল।

রুমা ছ'নম্বরের জানালা থেকে দেখছিল ওদের। দেখলে, তাড়াহুড়ো করে শিখিনী বুড়ির পুঁটলিটা বাসে তুলে দিলো, আর বুড়ি শিখিনীর বেতের ব্যাগটা তুলে দিলো গাড়িতে।

তারপর শিখিনী বুড়িকে ধরে ধরে বাসে তুললো, আর তা দেখে রুমা হেসে উঠে ডাকলে, রেশম, শিগগির, শিগগির, মজা দেখবি আয়।

বলে খিলখিল করে হেসে উঠলো। অস্ফুটে বললে, কাণ্ড!

সকালের ট্রেন চলে যেতেই হ্যাণ্ডবিলের রাশি আর বাঁধানো খাতাটা নিয়ে ব্যর্থ বিষণ্ণ মনে প্যাড্‌ল্ করছিলেন হিমাদ্রিবাবু।

এবারের মরশুমটা এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে ভাবতে পারেন নি। ব্রজমাধব ভট্টাচার্যও চলে গেলেন রেলের ধর্মঘট হতে পারে এই ভয়ে। ওদিকে টেলিগ্রাফ এসেছে রমণীবাবুর কাছে, তাঁর ছোট ভাইয়ের মরণাপন্ন অসুখ। একে একে সব ঘরগুলোই খালি হয়ে যাচ্ছে, অথচ নতুন বোর্ডারের দেখা মিলছে না। এই শীতের সময়টুকুই যা কিছু রোজগার, এদিকে কাল থেকে আবার হঠাৎ গরম পড়ে গেছে। লক্ষ্মীবৌ আসছে না কদিন থেকে, তার ছেলের নাকি মায়ের দয়া হয়েছে। খবরটা চেপে রেখেছেন, বোর্ডাররা শুনলে সব একদিনে পালাবে। ফেরার পথে ডাক্তারখানায় একবার বলে গেলেন, হোটেলে টীকে দেবার লোক পাঠাতে।

সাইকেল চালিয়ে পান্থপাদপে ফিরে আসতে আসতে হিমাদ্রিবাবু ভাবলেন, এবছর আর তেমন বোর্ডার এলো না, সুতরাং স্যানিটারী আর হলো না। অথচ স্যানিটারী না হলে বোর্ডার আসবে না।

সিদ্ধেশ্বর মিথ্যে। হাজার হাজার লোক সিদ্ধেশ্বরের পূজো দিতে আসছে, অথচ হিমাদ্রিবাবু জানেন, সিদ্ধেশ্বরের পূজো দিয়ে যদি কিছু হতো, তাহলে পান্থপাদপের আজ পাঁচতলা বাড়ি হয়ে যেত, স্যানিটারী তো সহজ কথা।

সাইকেলটা হোটেলের কাছাকাছি এসে পড়তেই বাগানের দিকে চোখ গেল। বাঃ, বাঃ। সুপ্রিয়বাবু বাগানে আর মিস্টার সেনের মেয়ে রুমা ছ'নম্বরের জানালায়। এক পলকে দেখে নিলেন হিমাদ্রিবাবু, সুপ্রিয় ইশারায় ডাকছে রুমাকে, আর রুমা অভিমান-ভরে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানাচ্ছে। কৌতুকের হাসি হাসলেন হিমাদ্রিবাবু। নতুন কিছু নয়। এমন কত দেখেছেন তিনি, কতবার দেখেছেন। ক'টা দিনের জন্যে আসে, তার তারই মধ্যে দিব্যি ভাব জমিয়ে নেয়। মনে হয়, এই

বুঝি কিছু একটা ঘটনা ঘটে যাবে। কিন্তু তার সময় হয় না, ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। একজন আরেকজনকে ছেড়ে চলে যায়। মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে থাকে দ্বিতীয়জন। তারপর আবার সব ঠিক হয়ে যায়। শ্লেটের লেখা ঢুকোঁটা চোখের জলেই মুছে যায়। অবশ্য সব সময়েই মুছে যায় না। কেউ কেউ ফিরে গিয়েও লাটাইয়ে সুতো গুটোতে চেষ্টা করে। পারেও।

একবার মনে আছে, পুলিস তাঁর হোটেলেও খবর নিতে এসেছিল। এখানেই আলাপ হয়েছিল ছেলেটির আর মেয়েটির। হিমাদ্রিবাবু তখন অবশ্য সন্দেহ করেন নি। একদিন তারা চলেও গেল, দুদিন আগে পিছে। তারপর প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন তাদের কথা। মাস কয়েক পরে হঠাৎ খবর পেলেন তারা নাকি বাপ-মাকে না জানিয়ে বিয়ে করেছে, বিয়ে করে ঘর ছেড়েছে। তাঁর হোটেলেও খোঁজ নিতে এসেছিল পুলিস।

না, হিমাদ্রিবাবু এসব দিকে চোখ দেন না। উনি শুধু দেখে যান, দেখেন আর হাসেন মনে মনে। সুপ্রিয়কে যেমন গৌতম সম্পর্কে সাবধান হতে বলেন নি, তেমনি মিস্টার সেনকেও কিছু বলবেন না। জানেন, আগে থেকে সাবধান করতে গেলেই দু'পক্ষের এক পক্ষ চটে যাবে। চলে যাবে বাক্স বেডিং গুছিয়ে নিয়ে। তার চেয়ে নিঃশব্দে দেখে যাওয়াই ভালো।

নিঃশব্দে দেখে যায় সকলে, দেখে আর মনে মনে হাসে। কেউ কিছু বলে না। টের পেয়েছে সকলেই, কিন্তু টের পেয়েও চুপ করে থাকে। শুধু রমণীবাবু প্রথম প্রথম একটু চটতেন, আবার সুপ্রিয়কে উৎসাহও দিতেন। ইদানীং শিখিনীর দিকে নজর দিতে শুরু করেছিলেন তিনি। তাই চটতেন না, আলোচনাও করতেন না সুপ্রিয়র সঙ্গে। এবার গায়ত্রী দেবী আসায় শিখিনীর অভাবটুকু অনুভব করেন নি।

গায়ত্রী দেবী যখনই ঘরের বাইরে আসেন, রমণীবাবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। গায়ত্রী দেবীর সাজপোশাক দেখেন, না তাঁর রূপযৌবন, গায়ত্রী দেবী নিজেও বুঝতে পারেন না। কি করে বুঝবেন! পুরু লেন্সের চশমার ফাঁকে রমণীবাবুর চোখের তারাদুটো ঘোলাটে দেখায়।

গায়ত্রী দেবী বেড়াতে বেরোন না বড় একটা, বিশেষ করে সকালের দিকে। সন্ধ্যের পর একবার মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে যান, গিয়ে বসেন বিন্দুসরোবরের ধারে। কংক্রিটের বেঞ্চিতে, আবছা আলোয়। নিথর কালো জলের দিকে তাকিয়ে, ব্যাঙের ভয়ে পা তুলে বসে তুতুনের সঙ্গে গল্প করেন কখনো, কখনো বা চুপচাপ।

সুপ্রিয় জিগ্যেস করেছিল, বেড়াতে যান না সকালে?

গায়ত্রী দেবী হেসেছিলেন।—আমাদের কি শান্তি আছে বেরিয়ে। দেখতে পেলেই লোকে ভিড় করে আসবে। বিখ্যাত হওয়ার যে কি জ্বালা!

রমণীবাবুর কানেও গিয়েছে সে-কথা। তাই অর্থপূর্ণ হাসি হেসে প্রফেসর ঘোষকে উদ্দেশ করেই বললেন ফিলিম-স্টারও ভাবে সে বিখ্যাত, বুঝলেন প্রফেসর। দিনের বেলায় বেরোতে পারেন না, লোকে ওঁকে দেখবার জন্যে ভিড় করবে বলে। আরে বাপু, ভিড়কে তো তোমার ভয় নেই, ভয় তাদের বাক্যবাণকে। যা সব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে—

প্রফেসর ঘোষ কোন সায় দিলেন না দেখে তাঁকে রাগাবার জন্যেই সুপ্রিয় বললে, বিখ্যাত নয়তো কি, ভিড় হোক্ তো দেখি আর কাউকে দেখে। ওঁরা হলেন আর্টিস্ট, অভিনয়কে সাধনা মনে করে সারা জীবন....

প্রফেসর ঘোষ আর চুপ করে থাকতে পারলেন না!—অভিনয়ও আর্ট! হেসে উঠলেন সশব্দে।

আর রমণীবাবু টিপ্পনি কাটলেন, চামচিকেও পাখি।

সুপ্রিয় রাগাতে চেয়েছিল, কিন্তু নিজেই রেগে গেল। হাজার হোক্, গায়ত্রী দেবী তার সঙ্গে যেচে আলাপ করেছেন, উচ্ছ্বাসের স্বরে বলেছেন, তাঁদের সাধনার দাম দেয় না কেউ।

তাই সুপ্রিয় বললে, আর্ট নয় কেন? একটা চরিত্রকে অভিনয় করে যিনি জীবন্ত করে তুলতে পারেন....

—শাড়ি ব্লাউজ পরার কায়দাকানুন আর্ট? নাকি নাকি সুরে প্রেমের কথা বলা আর্ট? রমণীবাবু টিপ্পনি কাটলেন।

আর প্রফেসর ঘোষ বললেন, অশালীন অঙ্গভঙ্গি করাই যাদের একমাত্র মূলধন....

চটে গেল সুপ্রিয়।—তবে যে বড়ো সেদিন বলছিলেন, কোণারকে ভুবনেশ্বরে বেশীর ভাগ লোক শুধু ঐ মূর্তিগুলোর মধ্যে অশ্লীলতাই দেখতে পায়, শিল্প দেখতে পায় না। আপনিও তো মশাই ফিল্ম-স্টারদের অঙ্গভঙ্গিই দেখেন, অভিনয় দেখতে পান না।

বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সুপ্রিয়, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখোচোখি হলো রুমার সঙ্গে। এতক্ষণ লক্ষ্যই করেনি সে, রুমা তার ঘরের সামনে পায়চারী করছিল। আর চোখোচোখি হতেই দেখলে, রুমা এক ঝটকায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দূরে সরে গেল। তবে কি তার কথাগুলো শুনেছে রুমা?

সুপ্রিয় এতক্ষণ রাগে গরগর করছিল প্রফেসর ঘোষের ওপর, কিন্তু রুমাকে দেখতে পেয়েই রাগ চুপসে গেল, বরং ভয়ে কেঁপে উঠলো তার বুক। গতকাল রাত্তিরে তাকে গায়ত্রী দেবীর ঘরে ঢুকতে দেখে রুমা একবারও কথা বলেনি, ফিরে তাকায়নি, এমন কি বাগান থেকে যখন ইশারায় ডেকেছে, সাড়া দেয়নি। এখন আবার যদি শুনে থাকে যে গায়ত্রী দেবীর হয়ে সে ওকালতি করছিল....

সর্বনাশ।

রুমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই তাই সুপ্রিয় বললে, আপনারা যাই বলুন প্রফেসর ঘোষ, সিনেমাকে আর্ট বলা যায় না, আর অভিনয় জিনিসটা রীতিমত নীচুদরের আর্ট। ও একটা নোংরা ব্যাপার।

প্রফেসর ঘোষ আর রমণীবাবু চমকে উঠলেন, ফিরে তাকালেন, তারপর আমতা আমতা করে বলবার চেষ্টা করলেন, আমরা তো তাই····আপনিই তো....

—চুপ করুন মশাই, আপনি তো পৃথিবীর সব-কিছুর মধ্যেই আর্ট দেখছেন। বলে এক ধমকে প্রফেসর ঘোষকে থামিয়ে দিলো সে।

প্রফেসর ঘোষ আর রমণীবাবু কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত চোখ-চাওয়াচাওয়ি করলেন। আর সুপ্রিয় কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলো ওষুধে কাজ হয়েছে।

তবে পুরোপুরি মানভঞ্জন করতে সন্ধ্যে পর্যন্ত সময় লাগলো।

শেষ পর্যন্ত রুমা বেড়াতে বেরোবার সময় ফিসফিস করে বলে গেল, বেড়াতে চললাম মশাই, তর্ক করুন বসে বসে।

হোটেল থেকে বিন্দুসরোবর দূরে নয় মোটেই। কোন কোনদিন সেখানে একা একাই অনেকক্ষণ কাটিয়ে এসেছে রুমা।

সন্ধ্যের সময় যখন মিস্টার সেন সপরিবারে বেড়িয়ে ফিরছেন বিন্দুসরোবরের পাশ দিয়ে, রুমা বললো, আজ যা গরম পড়েছে!

শ্রীলেখা দেবী বললেন, সত্যি, তা এসো না একটু বসেই যাই।

মিস্টার সেন আর শ্রীলেখা দেবী এগিয়ে গেলেন, আর রেশমও দিদির পিছনে পিছনে এসে বসলো কংক্রিটের বেঞ্চিটাতে।

বেশ কিছুক্ষণ কাটলো গল্পগুজবে, চুপচাপ বসে। তারপর একসময় শ্রীলেখা দেবী ও মিস্টার সেন উঠলেন।

রুমা বললে, বসো না আরেকটু।

—তোরা বোস না। দেরী করিস না তা বলে। বলে চলে গেলেন হু'জনেই।

শ্রীলেখা দেবী অবশ্য বহুবচনের সম্বোধনটা বিশেষ কিছু ভেবে বলেন নি, তবু তাঁর ওপর রুমা রেগে গেল। মা চলে যেতেই রাগটা গিয়ে পড়লো রেশমের ওপর। কি দরকার ছিল তার রুমার সঙ্গে ছায়ার মত লেগে থাকার। ছায়া তবু শুধুমাত্র দিনের আলোয় লেগে থাকে, রাতের অন্ধকারে সেও মানুষকে ছেড়ে যায়। অথচ রেশমটা হয়েছে এমন, দিনরাত কোন সময়েই ছাড়বে না, পায়ে পায়ে লেগে আছে।

সুপ্রিয় এখনই এসে পড়বে নিশ্চয়। ওদের ঘরটিতে আলো জ্বলতে দেখলেই বুঝবে বাবা মা ফিরে গেছে। রেশমটা যে সেঁটে আছে আমার সঙ্গে তা কি আর বুঝতে পারবে!

রুমা চুপচাপ বসে বসে রেশমের আজেবাজে প্রশ্নের পিঠে অনিচ্ছার সাড়া দেয় আর এদিক ওদিক তাকায়। দূরে দূরে ইলেকট্রিকের আলো, এদিকটা তাই স্পষ্ট দেখাও যায় না, চেনা যায় না লোকগুলোকে। কত লোকই তো এপাশ দিয়ে যাচ্ছে আর আসছে।

কিছুটা আশায় আর কিছুটা ভয়ে তাকাতে তাকাতে দূর থেকে হঠাৎ সুপ্রিয়কে ছায়া ছায়া দেখতে পেয়েই রুমা উঠে দাঁড়ালো চট করে।—এই রেশম, সুপ্রিয়বাবু যাচ্ছেন রে।

রেশম সুপ্রিয়কে মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না, বিশেষ করে দিদি যখন তার সঙ্গে যেচে কথা বলে। তাই ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, তা কি-এমন অষ্টম আশ্চর্য ঘটলো? বেড়াতেই তো এসেছেন, বেড়াতে যাবেন না?

রুমা একটু ঘা খেলো, অপ্রতিভ হলো, তারপর বললো, না, তাই বলছি।

সুপ্রিয়কেও কেমন হতাশ দেখালো। বিচ্ছুটা যে রুমার কাছে কাছেই থাকবে তা একবারও ভাবেনি সুপ্রিয়।

তাই আবছা অন্ধকারে রুমাকে খুঁজতে খুঁজতে রেশমকে চিনতে পেরেই আমতা আমতা করে কি যেন বলতে গেল, কিন্তু তার আগেই ভয়ে আঁৎকে উঠে তিড়িংবিড়িং করে লাফ দিয়ে একেবারে সুপ্রিয়র ঘাড়ের ওপর পড়লো রুমা।—কি রে একটা, পায়ের ওপর দিয়ে গেল।

টর্চের আলোটা মাটিতে ফেলে সুপ্রিয় বললে, ব্যাঙ, ব্যাঙ লাফাচ্ছে!

বলে রুমার শরীরটা এক পলকের জন্যে স্পর্শ করেই সরে গেল। কারণ, ঠিক সেই মুহূর্তেই সুপ্রিয়র হাতের ওপর একটা চিমটি কেটে খিলখিল করে সশব্দে হেসে উঠেছে রুমা।

রুমা মরীয়া হয়ে সুপ্রিয়কে বললে, বসুন না এখানে, কোথায় আর যাবেন।

—তাই বসি। বলে বসলো সুপ্রিয়। প্রশ্ন করলে, বেড়াতে যান নি আপনারা?

—গিয়েছিলাম। আচ্ছা সুপ্রিয়বাবু···

ধেৎ, কেবল সুপ্রিয়বাবু, সুপ্রিয়বাবু! দিদিটা যেন কি।

আজেবাজে কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে রেশম উঠে পড়লো। ব্যাঙ দেখে ওর বোধহয় সেই ব্যাঙের গল্পটা মনে পড়ে গেল। সেই যে একটা ছেলে খোলামকুচি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ব্যাঙ মারতো।

বেঞ্চি থেকে উঠে বিন্দুসরোবরের আলসের ধারে গিয়ে দাঁড়ালো রেশম। পাড় থেকে দু'মুঠো পাথরকুচি তুলে নিয়ে জলের দিকে টিপ করে ছুঁড়তে শুরু করলো।

আর রেশম একটু দূরে সরে গেছে দেখেই সুপ্রিয়··ফিসফিস করে বললে, ওকে সঙ্গে আনার কি দরকার ছিল?

—আরে, আমি এনেছি নাকি, ও নিজেই তো থেকে গেল।

বলেই রুমা ডাক দিলো, এই রেশম, সরে আয়, ওদিকে যাস না।

সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিয় বিরক্তিতে দন্ত্য 'চিঃচিঃ' শব্দ করলো, আর রুমা তা শুনে স্ফূর্তিতে মূর্ধন্য 'ট্টঃ ট্টঃ' শব্দ করলো।

রেশম কিন্তু ফিরলো না, ফিরে তাকালোও না।

রুমা ফিসফিস করে বললে, হোটেলের সবাই কিন্তু আমাদের লক্ষ্য করে, দেখেছো?

—দেখুক গে।

আবার কি বলতে যাচ্ছিল রুমা, হঠাৎ রেশমকে ফিরে আসতে দেখে চুপ করে গেল ও।

রেশম বললে, দিদি চল্ রাত হয়েছে।

রুমা আর রেশম হোটেলের পথ ধরলো, আর সেদিকে তাকিয়ে রইলো সুপ্রিয়। বেশ খানিকটা গিয়ে ফিরে তাকালো রুমা, আর সেই মুহূর্তে তার মুখের ওপর টর্চের আলো ফেললো সুপ্রিয়। সঙ্গে সঙ্গে রুমাও টর্চের আলো ফেললো সুপ্রিয়র ওপর। পরক্ষণেই দুটো টর্চই নিভে গেল। দুটো আলোই। জ্বলে রইলো শুধু দু'জনের বুকের ভেতর।

ভোর হতেই হিমাদ্রিবাবু প্রতিদিনের মতই খুরপি হাতে গিয়ে ঢুকলেন রান্নাঘরের পিছনের বাগানটিতে। পায়ে মাড়ানো বেগুনের চারাগুলো আবার বেশ হলহলে হয়ে উঠেছে, ফুল ধরতে শুরু করেছে দু'একটা। কুমড়ো গাছটাও লতিয়ে লতিয়ে রান্নাঘরের টিনের চালায় উঠেছে। কুমড়ো ধরতে শুরু করেছে। কিন্তু হিমাদ্রিবাবুর

মনে আনন্দ নেই। শুধু দুশ্চিন্তা আর দুশ্চিন্তা। এত বড় পরিবারটার খাওয়া-পরা চালাতে হয় এই কটা মাসের রোজগারে। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল এই সীজন্‌টায় অনেক লাভ হবে। এমন কি স্যানিটারী ব্যবস্থাও করতে পারবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু কপালে না থাকলে হবে কি করে।

বুড়ি চলে গেছে। আর পাঞ্জাবী মেয়েটাও। ছোট ভাইয়ের অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে রমণীবাবুও চলে গেলেন। অবশ্য টেলিগ্রাম পেয়েও রমণীবাবুকে বিচলিত হতে দেখেন নি। যেন ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না রমণীবাবুর। তবু চলে যেতে হলো তাঁকে। একে একে সকলেই চলে যাবে। মিস্টার সেনের পরিবার, গায়ত্রী দেবী, প্রফেসর ঘোষ, সুপ্রিয় ছোকরা—এরাও চলে যাবে, আজ হোক্ কাল হোক। তারপর আবার শ্মশান হয়ে যাবে পান্থপাদপ হোটেল অ্যাণ্ড স্যানাটোরিয়াম।

খুরপি ফেলে হাত পা ধুয়ে হ্যাণ্ডবিলের তাড়াটা আর বাঁধানো খাতাটা নিয়ে সাইকেলে উঠলেন হিমাদ্রিবাবু। সকালের ট্রেনটা দেখতে হবে, যদি নতুন কেউ এসে পড়ে।

হিমাদ্রিবাবু চলে যাবার পর গায়ত্রী দেবী মেয়েকে নিয়ে গাঁদা ফুলের বাগানে ঢুকলেন। আর ছ'নম্বরের জানালা থেকে তাদের দেখে রুমাও নেমে এলো।

এসে এক মুখ হেসে বললে, আপনার সঙ্গে আলাপ করবো করবো ভাবি, আপনার দেখাই পাই না।

গায়ত্রী দেবী ওজন করে হাসলেন, তারপর নাকি সুরে বললেন, কি করে দেখবেন বলুন, একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বাইরে বের হতে পারি নে। লোকগুলো এমন ভিড় করে!

রুমা বললে, কত নাম আপনার, ভিড় তো করবেই।

—আমার কিন্তু, জানেন, একটুও ভিড় ভাল লাগে না। সেই

জন্যে তো প্লেনে এলাম। তাছাড়া সময়ও বাঁচে, ফিরে গিয়েই তো আবার শুটিঙের ডেট আছে।

—ও! আচ্ছা, এখন কি ছবি করছেন?

গায়ত্রী দেবী চোখ কপালে তুললেন, ওমা, একটা নাকি? পেপারে দেখেন নি। আমি একসঙ্গে ছ'টা ছবিতে সই করেছি। আজকাল অবশ্য নতুন অনেক আসছে। কিন্তু কেউ অভিনয়ও জানে না, আর প্রেজেণ্টেব্‌ল্ চেহারাও নেই। আমাদের হয়েছে বিপদ, সব প্রোডিউসরই ধরে বসে, আমার ছবিতে নামতেই হবে, তা না হলে বই ফ্লপ করবে। কি করি বলুন···

এ-সব কথা শুনতে অবশ্য ভাল লাগে না রুমার। কেবল বড় বড় কথা। আর এই সব শুনেই হিমাদ্রিবাবু এত আদর-যত্ন করেন গায়ত্রী দেবীর। প্রথম প্রথম রুমাদের সুখ-সুবিধের দিকেই চোখ ছিল হিমাদ্রিবাবুর। অন্যান্য বোর্ডাররাও কত সমীহ করতো মিস্টার সেনকে। বড় অফিসার, বাড়ি আছে বালীগঞ্জে, শিক্ষিত মেয়ে রুমা····এসবের কথা সকলেই ভুলে গেল গায়ত্রী দেবী আসতেই। মিস্টার সেনের সঙ্গে যেন কোন তফাৎ নেই বুড়ো রমণীবাবুর, যিনি চলে গেলেন ছোট ভাইয়ের অসুখের খবর পেয়ে। কিংবা ঐ শিবনাথবাবু, সারাদিন যিনি রোদ্দুরে রোদ্দুরে টহল দিয়ে বেড়াতেন আর সারা রাত টাইপরাইটার খটখট করতেন।

রুমাদের যতদিন পর্যন্ত বিশেষ মর্যাদা দিতো সকলে, ততদিন কোন অভিযোগ ছিল না রুমার। অন্যায় বলে মনে হতো না। কিন্তু গায়ত্রী দেবী আসার পর রুমারা যেই অন্য সকলের সঙ্গে এক হয়ে গেল, তখন থেকেই রুমাদের মনে হয়েছে, সবাই যখন সমান টাকা দেয় তখন একজনকে এত তোয়াজ করা হিমাদ্রিবাবুর উচিত নয়।

উচিত নয় জেনেও তুতুনকে কাছে ডেকে একটু আদর করে ফেললো রুমা। বললে, তুমি বড় হয়ে কি হবে তুতুন?

—আমি পুলিস হবো।

—পুলিস? সশব্দে হেসে উঠলো রুমা। গায়ত্রী দেবীও।

রুমা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই হর্ণ শুনতে পেলো। একটা গাড়ি ধুলো উড়িয়ে এসে দাঁড়ালো গেটের সামনে। গাড়ি থেকে নামলেন স্যুট পরা এক ভদ্রলোক।

এগিয়ে এসে জিগ্যেস করলেন, প্রফেসর কমলকুমার ঘোষ এখানে এসেছেন কিনা বলতে পারেন?

রুমা এগিয়ে এলো।—হ্যাঁ, আছেন। ন' নম্বর ঘরে।

ভদ্রলোক তর তর করে ওপরে চলে গেলেন, আর কৌতূহল চাপা দিতে না পেরে রুমাও পিছনে পিছনে গেল।

ন-নম্বরের সামনে এসে আর উঁকি দিতে হলো না। আগন্তুক ভদ্রলোক তখন রীতিমত ঝগড়া করতে শুরু করে দিয়েছেন।—না না, কমলবাবু। এখুনি যেতে হবে। এ আপনার অন্যায়।

প্রফেসর ঘোষ হেসে বললেন, বেশ তো, হিমাদ্রিবাবু আসুন, হিসেব মেটাই···

নবাগত ভদ্রলোক ততক্ষণে একটা ট্রাঙ্ক টানতে শুরু করেছেন। —না, না কমলবাবু। আপনি এখানে এসেছেন অথচ আমাকে খবর দিলেন না। ক্যাপিটলে আমার বাড়ি থাকতে আপনি কিনা এই হোটেলে···

প্রফেসর ঘোষ কি যেন বলতে গেলেন, কিন্তু ভদ্রলোক শুনলেন না কিছু। বললেন, হিমাদ্রিবাবু আমাদের বহুকালের চেনা, টাকাপয়সা পরে মেটালেও চলবে, চলুন আপনি।

হিমাদ্রিবাবু না এলেও হয়তো চলে যেতে বাধ্য হতেন প্রফেসর ঘোষ, কিন্তু ভাগ্যক্রমে হিমাদ্রিবাবু ফিরে এলেন তখনই, তাঁকে

সেবার লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে। ব্যাপারটা যখন শুনলেন, তখন মুখে হাসি টেনে তাঁকেও বলতে হলো, তা প্রফেসর ঘোষ, বিজনবাবুর সঙ্গে এতদিনের বন্ধুত্ব যখন....

টাকা পয়সা মিটিয়ে নিয়ে কৌতুকীকে ডেকে দিলেন হিমাদ্রিবাবু। কৌতুকী এলো, তেমনি হলদে দাঁত বের করে হাসলো, মালপত্র নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিলো।

আর প্রফেসর ঘোষ যখন বখশিস্ দিতে গেলেন তাকে, দেখলেন ঠাকুর চাকরের দলও সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সকলের হাতে বখ্শিস দিয়ে প্রফেসর ঘোষ বললেন, লক্ষীবৌ কই?

কৌতুকী চোখ ছলছল করে বললে, লক্ষীবহুর পিলাটা মরি গলা।

—মারা গেছে? ছেলে? কেন?

—গুটি হইছিলা, মরি গলা।

অর্থাৎ বসন্ত। প্রফেসর ঘোষ এক মুহূর্ত কি ভাবলেন। যাক, হোটেলটা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, ভালই করলেন। লক্ষ্মীবৌ দুধ দিয়ে গেছে সেদিনও—ঘর মুছে দিয়ে গেছে। অথচ বসন্ত হয়েছে ছেলের, বলেনি তো!

গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন প্রফেসর ঘোষ, হিমাদ্রিবাবু ছুটতে ছুটতে এলেন বাঁধানো খাতাটা নিয়ে। সামনে সেটা মেলে ধরে বললেন, একটা কিছু লিখে দিয়ে যাবেন না?

প্রফেসর ঘোষ খসখস করে খানিকটা লিখে সই করে দিতেই গাড়ি স্টার্ট নিলো।

রেশম অনেক আগেই লক্ষ্য করেছিল কৌতুকী প্রফেসর ঘোষের মালপত্র নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর তা দেখে ছুটে এসে খবর দিয়েছিল।

মিস্টার সেন তাড়াতাড়ি নেমে এলেন, রুমা এবং রেশমও।

—চলে যাচ্ছেন নাকি প্রফেসর ঘোষ?

—না, বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠতে হচ্ছে। হোটেলে থাকতে দেবেন না উনি। বলে হাসলেন প্রফেসর ঘোষ।

—নমস্কার।

—নমস্কার।

গাড়িটা চলে যেতেই রেশম বলে উঠলো, প্রফেসরটা কি রে দিদি, যাওয়ার সময় দেখা করেও যায় না। এর চেয়ে রমণীবাবু বুড়োটা অনেক ভালো ছিল, সবারই সঙ্গে দেখা করে গেছে।

মিস্টার সেন হাসলেন ছেলের কথায় সায় দিয়ে। ব্যাপারটা সত্যি তাঁরও খারাপ লেগেছিল। পাশাপাশি একসঙ্গে রইলেন ভদ্রলোক, কোণারক গেলেন এক গাড়িতে, অথচ যাবার সময় একটা কথাও না বলে চোরের মত চলে যাচ্ছিলেন, এই বা কিরকম! শ্রীলেখা দেবী বারবার বলেছেন, লোকটা ভালো মনে হচ্ছে না। তা শুনে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন মিস্টার সেন। এবার যেন স্ত্রীর বুদ্ধিকে আর স্ত্রীবুদ্ধি মনে হলো না।

রুমা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। হঠাৎ বললে, বাবা রিক্সা ডাকতে বলবে না? উদয়গিরি খণ্ডগিরি যেতে হলে···

—হ্যাঁ, ডাকতে বলি। বলে ঠাকুর-চাকরদের উদ্দেশে হাঁক দিলেন।

তারপর তৈরী হয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন চারজনেই। খাবার সময় রুমা একবার উঁকি দিলো ন'নম্বর ঘরে। দেখলে, সুপ্রিয় ঘুমোচ্ছে অকাতরে।

সন্ধ্যের একটু আগেই ফিরলো রুমারা। সিঁড়ি বেয়ে হৈ হৈ করতে করতে উঠছিল, হঠাৎ গলায় স্টেথ্‌সকোপ, হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে একজন ডাক্তারকে নামতে দেখে রুমা আর রেশম চোখ চাওয়াচাওয়ি করলো। কার অসুখ? সুপ্রিয়র?

না। গায়ত্রী দেবীর মেয়ে তুতুনের। সকাল থেকেই তুতুনের জ্বরজ্বর হয়েছিল, তাই চিন্তিত দেখাচ্ছিল গায়ত্রী দেবীকে। শ্রীলেখা দেবী বলেছিলেন, ছোট ছেলেমেয়েদের অমন হয় মাঝে মাঝে, ভাববার কিছু নেই, কিন্তু ব্যাপারটা যে এমন দাঁড়াবে কেউ ভাবে নি। দুপুর থেকেই নাকি তুতুনের জ্বর বাড়তে আরম্ভ করে। প্রলাপ বকতে শুরু করে মেয়েটা। ভয় পেয়ে তাই হিমাদ্রিবাবুকে ডাক্তার ডাকতে বলেছিলেন গায়ত্রী দেবী।

বৃদ্ধা মা, বাতের রুগী। এদিকে মেয়ের অসুখ। কি করবেন কিছুই ঠিক করতে পারেন না।

চাকরটাকে ক্যাপিটেলের দোকান থেকে বরফ আর আইসব্যাগ আনতে পাঠিয়ে মেয়ের কাছে এসে বসলেন গায়ত্রী দেবী। তার কপালে হাত দিয়ে দেখলেন একবার।

সকাল থেকেই কেমন নার্ভাস দেখাচ্ছিল তাঁকে। চুলে চিরুনী পড়ে নি, মুখটা ভয়ে শুকিয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। কি করবেন কিছুই যেন ভেবে পাচ্ছেন না।

কত বড় বড় ডিরেক্টর বলেছেন, গায়ত্রী দেবীর মত নার্ভ নাকি খুব কম অভিনেত্রীর আছে। টেক্‌নিশিয়ান আর অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সামনে কত দুরূহ চরিত্র অভিনয় করেছেন তিনি। থিয়েটারও করেছেন হাজার হাজার দর্শকের সামনে। একটুকু নার্ভাস দেখায় নি তাঁকে। অথচ আজ যখন স্টেথ্‌সকোপ হাতে ডাক্তার এসে দাঁড়ালো তুতুনের কাছে, বুক দুরদুর করে উঠলো গায়ত্রী দেবীর, পা কেঁপে উঠলো।

ডাক্তার ভরসা দিয়ে গেল, ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু ভরসা পেয়েই যেন ভয় বেড়ে গেল। চোখে জল এসে গেল তুতুনের কষ্ট দেখে। ডাক্তারকে বলে দিলেন, সন্ধ্যের সময় আবার এসে খোঁজ নিয়ে যেতে।

বিছানায় ছটফট করে তুতুন, মাঝে মাঝে অস্ফুটে কি যেন বলে, আর মা মা বলে ডাকে।

গায়ত্রী দেবী তুতুনের কাছে আধশোয়া অবস্থায় তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, কষ্ট হচ্ছে মা? তুতুন! ও তুতুন!

তুতুন সাড়া দিলো না, সে তখন জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে আছে।

গায়ত্রী দেবী সজল চোখে তাকালেন তাঁর মার দিকে।—কি করবো মা, তুতুনের জ্বর যে বাড়ছে। কি হবে কিছু বুঝতে পারছি না।

মার কাছ থেকে বোধহয় একটু সাহস খুঁজলেন।

বাতের শরীরটাকে সোজা করতে গিয়ে যন্ত্রণায় মুখবিকৃতি করলেন তিনি। তারপর ধমক দিলেন।—ছ্যাখ পানু, অত ভাবিস না।

গায়ত্রী দেবী হতাশ স্বরে বললেন, বিদেশ বিভুঁই জায়গা....

মার ধমক খেয়ে রাগে জ্বলে উঠতে ইচ্ছে হল। মনে হলো, মা কি স্বার্থপর, কি স্বার্থপর। এতটুকু সহানুভূতি নেই তাঁর জন্যে, এতটুকু ভালবাসা নেই তুতুনের জন্য। তুতুনকে ওরা যেন কেউ দেখতে পারে না। এক ফোঁটা মেয়ে, ওর কষ্ট দেখে মার মনে কষ্ট নেই এতটুকু, অথচ দুর্ভাবনায় ঘুম নেই গায়ত্রী দেবীর চোখে।

গায়ত্রী দেবীর মা তাঁর মেয়ের মনের কথা অতশত বুঝলেন না, তাই আবার মুখবিকৃতি করলেন।—মেয়েও বাপু সবারই আছে, অসুখবিসুখও সবারই হয়। তোর মত এত আদিখ্যেতা....

—কি বললে! আদিখ্যেতা? হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠলেন

গায়ত্রী দেবী।—মেয়ের জন্যে বাড়াবাড়ি করি আমি? কি করেছি আমি? একটা দিন কাছে থাকতে পাইনা, একটু আদর যত্ন করতে পাইনি কোনদিন, কেন কেন? তোমাদের জন্যে, তোমার ছেলেমেয়েদের জন্যে টাকা রোজগারের কল বানিয়ে দিয়েছো আমাকে। নিজের মেয়ের অসুখবিসুখে কাছে বসলেও হিংসে করো....

কান্নায় রাগে দুঃখে ভেঙে পড়লেন গায়ত্রী দেবী। দু'চোখ ঠেলে জল এলো তাঁর। আর চোখের জল লুকোবার জন্য তুতুনের গালের ওপর মুখ ঘষলেন। ছ্যাঁক করে উঠলো তুতুনের গাল স্পর্শ করতেই।

গায়ত্রী দেবীর মা ততক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। মেয়েকে তিনি রীতিমত ভয় পান, তবু মা বলেই দু' একটা সাহসের কথা বলে ফেলেন। মেয়ের রোজগারেই তাঁর অন্য দুটি ছেলেমেয়েরও মুখে অন্ন জোটে সত্যি। কিন্তু পান্নু বলে কিনা তিনিই ওকে টাকা রোজগারের কল বানিয়েছেন?

খানিক চুপ করে থেকে বললেন, পান্নু, এত বড় মিথ্যেটা তুই বললি? ফিলিমে তুই নিজে নামতে চাসনি? নিজেই সব ব্যবস্থা করিস নি? আমি একদিনও বলেছিলাম? বরং বাধাই দিয়েছি, তুই জোর করে ঢুকেছিস তখন। আর মান্নুর যে বিয়ে দিতে পারলাম না, সে তো তোর বদনামের জন্যেই। তুই সিনেমায় নামলি বলেই তো মান্নুর বিয়ে হলো না। এখন তুই তাদের দেখবি না তো কে দেখবে শুনি?

গায়ত্রী দেবীর সারা শরীর জ্বলে গেল রাগে। নিমকহারাম, সব নিমকহারাম। ভাই বোন, মা বাপ, সব—সব সমান। তা না হলে দিনরাত তুতুনের কথা তুলে খোঁটা দেবে কেন ওরা। হিংসে, তুতুনের জন্যে এতটুকু ভাবতে দেখলেও হিংসে হয় ওদের।

গায়ত্রী দেবী আর কোন কথা বললেন না। চাকরটা বরফ আর আইসব্যাগ নিয়ে এসেছে ততক্ষণে। তাই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বরফ গুঁড়ো করে নিজেই নিয়ে গেলেন। গিয়ে বসলেন মেয়ের মাথার কাছে।

সন্ধ্যের সময় ডাক্তার এলো আবার। নাড়ি দেখে বললে, ভয়ের কিছু নেই, জ্বর কমে আসছে।

কিন্তু জ্বর একেবারে ছাড়লো না।

রাত্রে রুমা আর শ্রীলেখা দেবী যতবার এসেছেন, উঁকি দিয়েছেন, ততবারই দেখেছেন তুতুনের মাথায় আইসব্যাগ ধরে বসে আছেন গায়ত্রী দেবী। চোখে ঘুম নেই।

শ্রীলেখা দেবী কাছে এসে দাঁড়ান এক একবার। ফিসফিস করে জিগ্যেস করেন, তুতুন কেমন আছে। জ্বর কমছে কিনা।

ফিসফিস করে উত্তর দেন গায়ত্রী দেবী, পাছে কথা শুনে তুতুনের ঘুম ভেঙে যায়।

নিজের ঘরটিতে ফিরে এসে শ্রীলেখা দেবী স্বামীকে উদ্দেশ করে বলেন, শুনছো, মেয়েটার অসুখ নিয়ে বেচারী বড় বিব্রত হয়ে পড়েছে। সারা রাত বোধহয় ঘুমোতে পাবেনা।

মিস্টার সেন হেসে বলেন, রেশমটা কি সেবার কম ভুগিয়েছিল। একবার তুমি আইসব্যাগ ধরছো, একবার আমি····

শ্রীলেখা দেবী সস্নেহ হাসির চোখে রেশমের দিকে তাকালেন। চোখের দৃষ্টিটা যেন সাদর আশীর্বাদের মত রেশমের মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে চাইলো। শ্রীলেখা দেবী বললেন, তাই বলছি, লোকে কত ভুল বোঝে। ফিল্‌ম্‌-স্টাররা যেন মা নয়, বউ নয়, শুধু ফিল্‌ম্‌-স্টার, মায়া দয়া নেই শরীরে। আমিও তাই ভাবতাম, ভুল ভেঙে গেল আজ গায়ত্রী দেবীকে দেখে।

রুমা বললে, কাল সকালেই নাকি টেলিগ্রাম করবেন, বড়

ডাক্তার আনবার জন্যে। সত্যি, একটা দিনে গায়ত্রী দেবীর চেহারাটা কেমন হয়ে গেছে দেখেছো!

—হুঁ। শ্রীলেখা দেবী কি যেন ভাবলেন একমুহূর্ত। তারপর বললেন, আমাদের আর থেকে কাজ নেই। যদি টাইফয়েড হয়, বলা তো যায় না, ছোঁয়াচে রোগ ··রেশম সেবারে যা ভোগান ভুগেছিল!

মিস্টার সেন বললেন, না, টাইফয়েড নয় বোধ হয়।

খাওয়াদাওয়ার পরে আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়েও কথাবর্তা চললো। কিন্তু শ্রীলেখা দেবীর ইচ্ছে নেই থাকার। কি থেকে কি হয় কে বলতে পারে।

মিস্টার সেন শুধু বললেন, এতদিন পরে ছুটি নিয়ে বেড়াতে এলাম, তাও হুদিন যেতে না যেতেই পালাবো?

শেষ পর্যন্ত মিস্টার সেনের মতটাই রইলো, কারণ তাঁর কথার উত্তরে শ্রীলেখা দেবী কি প্রতিবাদ করলেন তা শুনতে পেলেন না মিস্টার সেন। তিনি তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সকালে ঘুম থেকে উঠলেন যখন, তখন রীতিমত ভিড় জমে গেছে সুপ্রিয়র ঘরের সামনে। চাকর-ঠাকুর, কৌতুকী, হিমাদ্রিবাবু।

কি ব্যাপার!

ব্যাপারটা জানবার জন্যেই মিস্টার সেন পাইপ মুখে দিয়ে এগিয়ে আসছিলেন। কিন্তু হিমাদ্রিবাবুকে কিছু জিগ্যেস করার আগেই ওদিকের ঘর থেকে গায়ত্রী দেবী ডাক দিলেন।

এ কি চেহারা হয়েছে গায়ত্রী দেবীর? মিস্টার সেনও চমকে উঠলেন। চোখ হুটো লাল হয়ে উঠেছে, সারারাত না ঘুমোনোর জন্যে মানুষের চেহারা কি এতখানি বদলে যায়! চুলে যেন জট পড়ে গেছে, শুকনো মুখে বয়সের রেখা।

গায়ত্রী দেবী এগিয়ে এলেন।—হিমাদ্রিবাবু! ভেবেছিলাম বড় ডাক্তার পাঠাবার জন্যে টেলিগ্রাম করে দেবো কোলকাতায়, কিন্তু আমি আর ভরসা পাচ্ছি না। আমাকে আজ বিকেলের প্লেনেই টিকিট জোগাড় করে দিন চারখানা।

মিস্টার সেন বললেন, জ্বর কমে নি তুতুনের?

—না, দেখুন তো কি মুশকিল, আমি একা মানুষ, ভালো ডাক্তার নেই...

হিমাদ্রিবাবু সান্ত্বনা দিলেন।—ডাক্তার এনে দিচ্ছি, ক্যাপিটেলের ভালো ডাক্তার, এত ভয় পাবেন না।

—না, না, প্লেনের টিকিট এনে দিন। আমি আজই চলে যাবো। কোলকাতায় না গেলে ও সারবে না।

মিস্টার সেনও সায় দিলেন।—হ্যাঁ, কোলকাতায় ফিরে যাওয়াই ভালো, বলা তো যায় না, যদি বাড়াবাড়ি একটা হয়।

বাধ্য হয়েই হিমাদ্রিবাবুকে বেরিয়ে পড়তে হলো সাইকেল নিয়ে। আর হিমাদ্রিবাবু বেরিয়ে যেতেই কৌতুকী এসে ঢুকলো ছ'নম্বর ঘরে।

শ্রীলেখা দেবী তখন মৌজ করে সকালের চা-খাবার খাচ্ছেন। রুমা দাঁত মাজছে।

কৌতুকী এসে ফিসফিস করে বললে, নয় নম্বরেরো অঙ্গে দরদ হউছি।

ন'নম্বর, অর্থাৎ সুপ্রিয়।

রুমা বিস্মিত হয়ে জিগ্যেস করলো, কি হয়েছে?

—দরদ। ব্যথা হউছি।

রুমা খিলখিল করে হেসে উঠলো।—গায়ে ব্যথা হয়েছে? তা হলেই বা।

কৌতুকী রুমার মুখের দিকে একবার, শ্রীলেখা দেবীর মুখের দিকে একবার তাকালো। বিস্মিত হলো রুমাকে হাসতে দেখে। তারপর কিছু না বলে বেরিয়ে গেল।

ব্যথা হউছি। নিজের মনেই আবার হেসে উঠলো রুমা। বাতের ব্যথা না ফিক ব্যথা; দেখতে হবে তো ব্যাপারটা কি। একটু ঠাট্টাও করা যাবে। ঠাট্টা করলে অবশ্য রেগে যাবে সুপ্রিয়। যা রাগ মহাপুরুষের। মন রেখে চলা দায়। পান থেকে চুন খসলেই বাতাবি লেবুর মত মুখ করে থাকবে।

মুখ হাত ধুয়ে, ব্রাশটা সেলফে তুলে রেখে আঁচলে ভিজে মুখ মুছতে মুছতে সুপ্রিয়র ঘরে ঢুকলো রুমা। ঠাট্টার সুরে কি বলবে, তাও বোধহয় ঠিক করেই এসেছিল। কিন্তু সুপ্রিয়র দিকে তাকিয়ে ও থমকে দাঁড়ালো। কি ব্যাপার। এমন ছটফট করছে কেন সুপ্রিয় বিছানায় পড়ে পড়ে। বালিশে মুখ গুঁজে শুয়েছিল সুপ্রিয়। তবু ওর মুখের ভাবটুকু দেখে রুমা বুঝতে পারলো অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।

রুমা কাছে এসে দাঁড়ালো।—এই! কি হয়েছে? অমন করছো কেন?

বালিশ থেকে মুখ তুলে অনেক কষ্টে যেন তাকালো সুপ্রিয়। আর তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিয়র চোখের কোণ থেকে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো বালিশের ওপর।

সুপ্রিয়র কপালে হাত রাখলো রুমা। উঃ, গা যে পুড়ে যাচ্ছে। মাথার কাছে বসে পড়লো।

সুপ্রিয় চোখ মেলে তাকালো, হাত বাড়িয়ে রুমার একখানা হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে ধীরে ধীরে বললে, এখানে বোসো না, লক্ষীটি, যাও, ঘরে যাও।

—তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো তো। আমি ডাক্তার ডাকতে বলছি।

সুপ্রিয় বিষণ্ণ হাসি হেসে বললে, ডাক্তার! খবর দিয়েছেন হিমাদ্রিবাবু। তুমি যাও, তুমি যাও।

সুপ্রিয়র অবস্থা দেখে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল রুমার। তবু মুখে হাসি টানবার চেষ্টা করে বললে, কেন, তাড়িয়ে দিতে চাইছো কেন বলোতো!

সুপ্রিয় যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠলো হঠাৎ। রুমা দেখলো, যেন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে সুপ্রিয়র। ধীরে ধীরে সুপ্রিয়র মাথায় চুলে হাতে বুলিয়ে দিলো রুমা। কোন কথা বললে না।

খানিক পরে সুপ্রিয় চোখ মেলে তাকালো রুমার মুখের দিকে। তাকিয়ে রইলো দুটি ব্যথাক্লিষ্ট চোখ মেলে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, তুমি যাও রুমা, তুমি যাও।

—এমন করছো কেন বলো তো। রুমার চোখেও যেন অভিমান ফেটে পড়লো। বললে, আমাকে তাড়াতে পারলেই তুমি বাঁচো, না?

ম্লান হাসি খেলে গেল সুপ্রিয়র মুখে। ঠোঁট দুটো যেন কেঁপে কেঁপে উঠলো। তারপর বললে, আমার ভয় হচ্ছে রুমা, মনে হচ্ছে···

বাইরে জুতোর শব্দ শুনেই উঠে দাঁড়ালো রুমা, বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। দেখলে, কৌতুকীর পিছনে পিছনে হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে সেই ডাক্তার ঢুকলো ঘরে।

বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন মিস্টার সেন। ডাক্তার দেখে তিনিও এলেন। আর তাই রুমাকে বাধ্য হয়েই সরে যেতে হলো।

কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলেন মিস্টার সেন। এসে শ্রীলেখা দেবীকে বললেন, হাঙ্গামা বাধালে দেখছি। ডাক্তার তো সন্দেহ করছে···

সন্দেহ নয়। সন্ধ্যের আগেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা গেল। সারা শরীরে তখন গুটি উঠেছে।

স্মল পক্স। বসন্ত। বড় বড় ফোস্কার মত গুটি সারা শরীরে, মুখে, চুলের গোড়ায়।

না, গায়ত্রী দেবী অসুস্থ মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছেন। বিকেলের প্লেনে চলে গেলেন তিনি, আর তা দেখে মিস্টার সেন ভেবেছিলেন, বাঁচা গেল। তুতুনের যদি টাইফয়েড হয়, আর তার ছোঁয়াচ লেগে যদি রেশম বিছানা নেয়, এই ভয়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন। গায়ত্রী দেবী যখন চলে গেলেন, মিস্টার সেন স্ত্রীকে এসে বলেছিলেন, যাক্ বাঁচা গেল।

কিন্তু নতুন একটা বিপদ দেখা দেবে ভাবতে পারেন নি। সন্ধ্যের আগেই ডাক্তার এলো আবার। বললে, হ্যাঁ, পক্সই।

ভয় পেয়ে গেলেন মিস্টার সেন আর শ্রীলেখা দেবী। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন বিভ্রান্তের মত।

তারপর কি যেন ভাবলেন দু'জনেই। কৌতুকীকে ডাকলেন। বললেন, মালপত্র তেরো নম্বরে নিয়ে চল।

ছ-সাত নম্বরের একটা ঘর পরেই সুপ্রিয়। তার চেয়ে হোটেলের একেবারে ও-প্রান্তে তেরো নম্বরে সরে যাওয়া অনেক ভালো। তবু কিছুটা দূরত্ব থাকবে।

তেরো নম্বরে উঠে গিয়ে রুমা আর রেশমকে বললেন, খবরদার, ওদিক দিয়ে যেও না। সাংঘাতিক রোগ—পক্স।

রুমা শুনলো, চুপ করে রইলো। রোগের নাম শুনে ওরও যে ভয় না হয়েছে তা নয়। সুপ্রিয়র জন্যে যত না কষ্ট হয়েছে নিজের জন্যে ভয় হয়েছে তার চেয়ে বেশী। ওর এক কলেজের বন্ধুর ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো হঠাৎ। কি সুন্দর চেহারা ছিল মেয়েটার, কি কুৎসিতই না হয়ে গিয়েছিল। শুধু রূপের কথাই নয়। চিরজীবনের জন্যে দুটো চোখই হারিয়েছিল মেয়েটি। অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কলেজে আসতো একটি ঝিয়ের

হাত ধরে ধরে, ফিরতো তার সঙ্গেই। কতদিন তাকে সিঁড়িতে হোঁচট খেতে দেখেছে রুমা, কতবার অনুনয় করেছে সে রুমার কাছে, পড়ার বই থেকে দু'পাতা পড়ে শোনাতে।

তার কথা মনে পড়তেই শিউরে উঠলো রুমা। ভাবলে, না, যাবে না সে সুপ্রিয়র কাছে। ছিঃ ছিঃ, কি বোকা সে, সকালে অতবার করে সুপ্রিয় ওকে চলে যেতে বললো, তবু বোকার মত কেন সুপ্রিয়র বিছানায় বসতে গেল। কেন স্পর্শ করলো সুপ্রিয়কে, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে গেল কেন? যদি সেজন্যই কিছু হয় রুমার?

তেরো নম্বর ঘরে শুয়ে পড়লেন মিস্টার সেন আর শ্রীলেখা দেবী। বললেন, শুয়ে পড় রুমা, কাল ভোরে উঠতে হবে। কাল সকালের গাড়িতেই চলে যাবো, আর নয়।

সেই ভালো। বারো নম্বর ঘরের দু'খানা তক্তপোশের একখানায় গড়িয়ে পড়লো রুমা, আরেকখানায় রেশম।

—দিদি, তোর ভয় করছে না?

—কিসের।

—ভূতের, আবার কিসের। কেউ কোথাও নেই।

রুমা উত্তর দিলো না। না, আজ আর ভূতের, চোরের, ডাকাতের, এমন কি মানুষেরও ভয় নেই তার। আজ শুধু রোগের ভয়। অথচ গতকাল পর্যন্ত সন্ধ্যের পর বারান্দায় একা একা দাঁড়িয়ে থাকতেও গা ছমছম করেছে তার। একে একে সব ঘরই তো খালি হয়ে গেছে।

এই সেদিন, প্রথম যখন এলো ওরা। সারা হোটেল গমগম করছে। ঘরে ঘরে লোক, কত হাসি-হল্লা, কত ফুর্তি। কত আশা, আনন্দ। আর আজ? চোখের সামনে একে একে সকলেই চলে গেল। রমণীবাবু, ব্রজমাধববাবু, মিসেস ভটচার্য, গৌরী

দেবী। গৌরী দেবীর ছেলে বাদল যাবার দিনে সকলকে একটা করে লজেন্স দিয়ে গিয়েছিল। আর শিখিনী, শিবনাথবাবু, বুড়ি-মা। সকলেই চলে গেল, এমন কি প্রফেসর ঘোষও। সকলকেই বুঝি চলে যেতে হয়। কেউ আগে, কেউ পরে। রুমাদেরও চলে যেতে হবে।

কত কি উদ্ভট কথা মনে আসে রুমার। চিন্তার জাল জট পাকায়। জট পাকায় আর জট খোলে। আর ফাঁকে ফাঁকে চমকে ওঠে সুপ্রিয়র আর্তনাদ শুনে। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছে সুপ্রিয়।

সুপ্রিয়। সুপ্রিয়কে সত্যিই কি ভালবেসে ফেলেছে রুমা? নাকি শুধুই ভালো লাগা? ভালবেসেছে যদি, তবে কেন সুপ্রিয়কে ভয় পাচ্ছে সে, রোগকে ভয় পাচ্ছে! ভালবাসেনি? তাহলে ঘুম নামছে না কেন তার চোখে! বারবার সুপ্রিয়কে মনে পড়ছে কেন? সুপ্রিয়র আর্তনাদ ভেসে আসছে যখনই, ওর বুকের ভেতর কেন একটা মোচড় দিয়ে উঠছে।

না, কিছুতেই ঘুমোতে পারছে না রুমা। ঘুমোতে পারছে না। কাল সকালেই চলে যেতে হবে। এ হোটেল ছেড়ে, সুপ্রিয়কে ছেড়ে। এই দিন ক'টিকে ছেড়ে।

শুধু ছেড়ে যেতে পারবে না এ ক'টা দিনের স্মৃতি। স্মৃতিটুকু।

—রেশম। খুব হাল্কা চাপা গলায় ডাকলো রুমা।

সাড়া পেলো না।

রেশম বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। বড় তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে রেশম।

বিছানা ছেড়ে উঠলো রুমা। জানালার কাছে গিয়ে কুঁজো থেকে জল গড়াতে গেল। এ কি, কৌতুকী জল দিয়ে যায় নি? কৌতুকীর তো ভুল হয়নি কোনদিন। ভুল হয় না।

জল নেই এক কৌটাও। অথচ বড় তেষ্টা পেয়েছে তার। মাকে ডাকবে?

থাক্।

উঠলো রুমা। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে খিল খুললো কপাটের। বাইরে বেরিয়ে এলো।

সুপ্রিয়র চিৎকার ভেসে আসছে থেকে থেকে। বেচারী একা মানুষ, কেউ কোথাও নেই। হয়তো বাপ-মার কাছে খবরও দেন নি হিমাদ্রিবাবু। হয়তো—

আঃ, কি চমৎকার ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। কি সুন্দর জ্যোৎস্নার রাত। দূরে দূরে সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চাঁদের আলোয়। মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে। গাছপালা, রেল লাইনের বাঁকটা। ওদিকের বারান্দায় মাধবীলতার একগোছা ফুল নুয়ে পড়েছে, দুলছে হাওয়ায়।

পা টিপে-টিপে এগিয়ে এলো রুমা। যাবে? ঢুকবে সুপ্রিয়র ঘরে? ভয়? ভয় কিসের? সকালে তো সুপ্রিয়র শিয়রের কাছটিতে বসেছিল সে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। হবার হলে ঐটুকু স্পর্শের জন্যেই হয়তো ভুগতে হবে।

রূপ চলে যাবে? চোখের আলো নিভে যাবে? না, ওসবকে ভয় করে না রুমা। সুপ্রিয়ই যদি না থাকলো, রূপ নিয়ে কি হবে তার? চোখের দৃষ্টি কি শুধু দেখবার জন্যেই, দেখা দেবার জন্যে নয়!

লম্বা অন্ধকার নির্জন নিঃশব্দ বারান্দার ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল রুমা।

সুপ্রিয়র ঘরে আলো জ্বলছে। বেচারী একা একা পড়ে আছে। চিৎকার করছে। ভয় নেই রুমার, ও গিয়ে একটা সান্ত্বনার হাত রাখবে সুপ্রিয়র কপালে।

মাধবীলতার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো রুমা। লাল আর সাদা ফুলের থোকাটা ভেঙে নিলো।

মনে পড়লো সেই প্রথম দিনের দৃশ্যটুকু। ফুলটা খোঁপা থেকে পড়ে যেতেই কুড়িয়ে নিয়ে খোঁপায় গুঁজে দিতে গিয়েছিল সুপ্রিয়। পারেনি।

ফুলের থোকাটা হাতে নিয়ে ন' নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়ালো রুমা। লম্বা বারান্দার ও-প্রান্তের দিকে তাকালো। না, বাবা-মা জানে না, জানতে পারে নি।

পর্দাটা সরালো রুমা। আর চমকে উঠলো।

কৌতুকী। কৌতুকী তক্তপোশের নীচে মাটিতে বসে বসে বাঁ হাতে একটা তালপাতার পাখা নিয়ে ধীরে ধীরে বাতাস করছে সুপ্রিয়কে। আর ডান হাতে তার চুলে বিলি কাটছে।

টুক করে একটা শব্দ হলো বুঝি। ফিরে তাকালো কৌতুকী।

প্রথমটা সে চমকে উঠেছিল। তারপর নিঃশব্দে হাসলো সাদা সাদা দাঁত বের করে। সেই নোংরা হলদে দাঁতগুলো সাদা দেখালো রাতের আলোয়। আর সেই বীভৎস উল্কি-আঁকা কালো মুখখানা কত সুন্দর দেখালো। স্নেহ আর সেবায় উজ্জ্বল। ঠিক যেন মায়ের মুখের মত। রুমার মায়ের মত, সুপ্রিয়র মায়ের মত, সব মায়ের মত—ম্লান, উদ্বিগ্ন, আশ্বাসে আশায় স্থির।

ইশারায় কাছে ডাকলো কৌতুকী।

রুমা এলো, দাঁড়ালো, তাকালো সুপ্রিয়র তন্দ্রাচ্ছন্ন মুখের দিকে। কপালে—বড় বড় ফোস্কার মত গুটি ওঠা কপালে হাত রাখলো।

তারপর বেরিয়ে এলো। বেরিয়ে এসে আবার ফিরে তাকালো কৌতুকীর মুখের দিকে। আর কি আশ্চর্য। রুমা এবং কৌতুকী দু'জনের চোখ বেয়ে একই সঙ্গে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়লো।

ছুটে পালালো রুমা। ছুটে পালিয়ে এসে ঘরের কপাটে খিল লাগিয়ে দিলো।

ভোর হতে না হতেই ঘুম ভেঙে গেল মিস্টার সেনের। শ্রীলেখা দেবীও উঠে পড়লেন।

রুমা ঘুমোচ্ছে। রেশম ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক্, ততক্ষণ নিজেদের বেডিং গুছিয়ে নেয়া যাক্।

পর্দা সরিয়ে বাইরে একবার উঁকি দিলেন শ্রীলেখা দেবী। সবে একফালি রুপালি আলো উঁকি দিয়েছে। সূর্য ওঠে নি। বারান্দার ওপারটা আবছা অস্পষ্ট। মাধবীলতার ঝাড়টা ছায়া ছায়া দেখাচ্ছে। শিরশিরে হাওয়া আসছে ধীরে ধীরে, দুলছে মাধবীলতার শাখা।

পর্দাটা খুলে ভাঁজ করে রাখলেন শ্রীলেখা দেবী। হোল্ড্-অলের ভেতর পুরে দিতে হবে। শেষ মুহূর্তে যাতে ভুলে না যান, ফেলে না যান, তাই আগে থেকেই পর্দাটা খুলে নিলেন। আর ওটা খুলে নিতেই বেশ মিষ্টি আমেজী বাতাস ঢুকলো এক দম্‌কা।

মিস্টার সেন বললেন, শীত চলে গেছে একেবারে, দেখছো। বেশ হাওয়া দিচ্ছে, কোলকাতায় গিয়ে আবার সেই ঘাম আর ঘামাচি।

শ্রীলেখা দেবী হাসলেন।—যা বলেছো। কোলকাতায় শুধু গ্রীষ্ম আর বর্ষা। ছয় ঋতু শুধু রেশমদের বইয়েই আছে।

মিস্টার সেন সায় দিলেন। বললেন, বসন্ত যে কত মিষ্টি, বাইরে না থাকলে বোঝাই যায় না।

শ্রীলেখা দেবী গম্ভীর হলেন।—মিষ্টিতে কাজ নেই, ও-নাম মুখে এনো না আর। পালাতে পারলে বাঁচি।

মিস্টার সেন চুপ করলেন। একটুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। বললেন, তবু ভালো যে হিমাদ্রিবাবু বুদ্ধি করে টাকে দেবার লোকটাকে এনেছিলেন।

শ্রীলেখা দেবী ততক্ষণে টুকিটাকি জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়েছেন। ওয়াটার-বট্‌ল্‌-এ জল ভরে নিয়েছেন। তোয়ালে ঢুকিয়ে নিলেন স্যুটকেশে। পুরোনো খবরের কাগজগুলো ফেলে দিয়ে যাবেন কিনা এক মুহূর্ত ভাবলেন, তারপর দু'খানা ট্রাঙ্কে রাখলেন। বাকীগুলো সেল্‌ফেই পড়ে রইলো।

হোল্‌ড-অল্‌ বাঁধতে গিয়ে হিমসিম খেলেন মিস্টার সেন। বিছানাটা রোল করে তার ওপর চেপে বসলেন শ্রীলেখা দেবী। কিন্তু বেল্‌ট্‌ আঁটতে পারলেন না মিস্টার সেন। গলদঘর্ম হয়ে উঠলেন দু'জনেই।

বেল্‌ট্‌ ধরে টানেন মিস্টার সেন, আর স্ত্রীকে বলেন, আরো চেপে বসো না একটু।

শ্রীলেখা দেবী হাসেন আর ছোটছেলেদের মত এক একবার উঠে দাঁড়িয়ে ধপ করে বসেন পাকানো বিছানাটার ওপর। কিন্তু বেল্‌টের কড়াটা কিছুতেই লাগাতে পারেন না মিস্টার সেন। এক চুলের জন্যে কেবলই ফসকে যায়।

শেষ পর্যন্ত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রুমা আর রেশমকে ডাকলেন।

ধড়মড় করে উঠে পড়লো দু'জনেই। মাঝখানের দরজা খুলে এ-ঘরে এলো। তারপর ঘুম চোখের ওপর আঁচলটা ঘষে, হাত দুটো টান টান করে একটা আড়মোড়া ভেঙে রুমা বললে, আমি দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি ঠিক করে।

মা আর মেয়েতে চটপট ছুটো হোল্‌ড-অল্‌ই বেঁধে ফেললো।

তারপর চোখমুখ ধুতে গেল রুমা আর রেশম। ছু'জনের চোখেই ঘুম জড়িয়ে আছে তখনও।

রুমার চোখে শুধু ঘুম নয়, স্বপ্নও। ছুঃস্বপ্ন। বেচারী সারা-রাত কাটিয়েছে ছুশ্চিন্তায়। প্রথমটা ওরও ভয় হয়েছিল। কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্যে। ভয় কাটিয়ে উঠেছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই। আর ভয় চলে যেতেই ওর মনে হয়েছিল, সবাই কত স্বার্থপর। মা-বাবা, এমন কি নিজেকেও বড় স্বার্থপর মনে হয়েছিল রুমার। এভাবে, এই বিপদে সুপ্রিয়কে একা ফেলে যাওয়া কি উচিত হচ্ছে তাদের? কে দেখবে তাকে, কে চিকিৎসা করাবে।

মুখেচোখে জল দিয়ে একবার সুপ্রিয়র ঘরের দিকে তাকালো রুমা। একবার গিয়ে উঁকি দিয়ে আসতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু সাহস হলো না। যদি মা-বাবা দেখতে পায় বকুনি দেবে নির্ঘাৎ।

কৌতুকীকে একবার খুঁজলো। কৌতুকীকে তবু জিগ্যেস করতে পারবে সুপ্রিয় কেমন আছে। কিন্তু ডাকতে সাহস হলো না তাকে। যেমন বোকা আর গোবেচারী, হয়তো মা-বাবার সামনেই বলে বসবে, কাল রাতে সুপ্রিয়কে দেখতে গিয়েছিল ও।

বলুক। হঠাৎ তীব্র একটা জ্বালা অনুভব করলো রুমা। সে না বড় হয়েছে, কলেজে পড়ে! স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করে! তবে! এত মা-বাবাকে ভয় পাবে কেন। কি এমন অন্যায় কাজ। বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসে যদি একটা অসুস্থ মানুষের খোঁজ-খবর নিতে যায় কি এমন দোষ হবে। আর রোগের ভয়ই বা কোথায়। টীকে তো নিয়েছে।

না, শেষ অবধি সাহস হলো না রুমার।

ঘরে ফিরে এলো। আর সে ফিরে আসতেই শ্রীলেখা দেবী বললেন, ছেলেটা কেমন আছে কে জানে।

বুঝেও না-বোঝার ভান করলো রুমা।—কে? কার কথা বলছো?

শ্রীলেখা দেবী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।—সুপ্রিয়র কথা বলছি। ছেলেটার ওপর আমার বাপু বড্ড মায়া পড়ে গেছে। একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না ওকে এভাবে ফেলে যেতে।

সারা শরীর চিড়বিড় করে উঠলো রুমার। রেগে গিয়ে বলে ফেললো, ন্যাকামি করো না। তোমাদের যদি এতটুকু মায়াদয়া থাকতো, এভাবে ফেলে যেতে না বেচারীকে। বলতে বলতে শেষের দিকে গলা ভারী হয়ে এলো রুমার, চোখে হয়তো আর একটু হলেই জল টলটল করতো।

রুমার গলার স্বর আর চোখের দৃষ্টিতে কি যেন পড়লেন শ্রীলেখা দেবী। কি যেন সন্দেহ হলো। এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে রুমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বিস্মিত হলেন। তারপর বললেন, কি করবো বল। নিজেদের কথা তো ভাবতে হবে, শেষে কি চেঞ্জে এসে একটা বড় রোগ ধরিয়ে নিয়ে যাবো।

রুমা কোন কথা বললো না, ছুটে চলে গেল জানালার ধারে। তাকিয়ে রইলো রাস্তার দিকে। পাছে চোখে জল এসে পড়ে, আর মা দেখতে পায়, বুঝতে পারে।

সত্যি, এতটা বয়স হলো রুমার, কিন্তু এ-কটা দিনের মত এত আনন্দ সে বুঝি কখনো পায়নি। আনন্দ? না, এ এক অবোধ্য নেশার মধ্যে, একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘোরের মধ্যে যেন কেটে গেছে দিনগুলো। কখনো মনে হয়নি এখান থেকে একদিন চলে যেতে হবে। এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে, এই পান্থপাদপ হোটেল ছেড়ে, সুপ্রিয়কে ছেড়ে। এতদিন তার জীবনে সুপ্রিয় ছিল না তা ভাবতেই পারছে না রুমা। মনে হচ্ছে যুগ যুগ ধরে যেন এমনি পাশাপাশি কাছাকাছি ছিল দু'জনে। একজন আরেকজনকে ছেড়ে যাবে, কোনদিন ভাবে নি।

না, এভাবে চিরকালের মত সুপ্রিয়কে ছেড়ে যেতে পারবে না রুমা। মা-বাবা, রেশম যে যা ভাবে ভাবুক। একবার, যাবার আগে অন্তত: একবারটি সুপ্রিয়র কাছে গিয়ে দাঁড়াবে রুমা।

বলবে, ভুলবো না।

বলবে, ভুলো না।

কিংবা অন্য কিছু, অন্য কোন কথা। অথবা কথা নয়, শুধু চোখ মেলে দেখবে সুপ্রিয়র রোগপাণ্ডুর মুখখানা। আর সুপ্রিয়ও হয়তো চোখ মেলে দেখবে তাকে, একবার এক পলকের জন্যে বিষণ্ণ হাসি হাসবে তাকে দেখে।

না, ওসব সুন্দর সুন্দর কথা ভাববার অনেক সময় পাবে এরপর। এখন তার চেয়েও বড় কাজ আছে।

একটা কাগজে রুমা নিজের নাম আর ঠিকানা লিখলো। কোনরকমে একটা রেখে যেতে হবে সুপ্রিয়র কাছে।

কি বোকা সে, কি বোকা। এতদিন ধরে এত কথা, এত অন্তরঙ্গতা, অথচ কেউ কারো ঠিকানাটুকুও নিয়ে রাখতে পারলো না।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো রুমা, ঠিকানা লেখা কাগজটা হাতের মুঠোয় লুকিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল সুপ্রিয়র ঘরের দিকে। কিন্তু তার আগেই সিঁড়ির মুখে দেখা হয়ে গেল হিমাদ্রিবাবুর সঙ্গে।

—এই যে, উঠেছেন দেখছি। এক মুখ হেসে হিমাদ্রিবাবু বললেন, চলুন, চা দিচ্ছে। গোছগাছ করে নিয়েছেন তো?

রুমা কোন কথা বললো না। শুধু ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলো।

তারপর পা বাড়ালো আবার, সুপ্রিয়র ঘরের দিকে। আর হিমাদ্রিবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, ওদিকে যাবেন না, ওদিকে যাবেন না। পক্স....সাংঘাতিক রোগ।

চিৎকার শুনে শ্রীলেখা দেবী বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বারান্দার ওপ্রান্ত থেকে এপ্রান্ত অবধি স্পষ্ট দেখা যায়। রুমাকে দেখতে পেলেন। দেখেই তীব্র ভর্ৎসনায় কণ্ঠে বললেন, রুমা!

হাঁটু ছুটো কেঁপে উঠলো রুমার। ধীরে ধীরে ফিরে এলো সে। ফিরে এসে মুখ নীচু করে বসে পড়লো তক্তপোশের ওপর, জানালার ধারটিতে। চোখ ছাপিয়ে জল এলো। আর তো সময় নেই। সময় নেই। কাগজের টুকরোটা জানালা গলিয়ে ফেলে দিলো রুমা। আর পরক্ষণেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক নিঙড়ে।

এই শেষ। এই শেষ। আর কোনদিন বুঝি সুপ্রিয়র সঙ্গে দেখা হবেনা। বানের মুখে শেষ খড়কুটোর মতই কাগজটা বাতাসে উড়ে গেল রুমার চোখের সামনে।

এদিকে চা খাওয়া হয়ে গেল সকলের।

ছ'খানা রিক্সা এসে দাঁড়ালো একটু পরেই।

হিমাদ্রিবাবু ডাক দিলেন কৌতুকীকে।—ও কৌতুকী! কৌতুকী, হরতুকী, যৌতুকী, আরে ও কৌতুকী!

কৌতুকী সুপ্রিয়র ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললো, যাউছি বাবু, যাউছি।

কৌতুকী এগিয়ে এলো। এসে দাঁড়ালো সে তেরো নম্বর ঘরের সামনে।

রুমা ফিরে তাকালো। আর অনুশোচনায় মন ভরে গেল রুমার। কাগজের টুকরোটা তখন ফেলে না দিতো যদি!

কৌতুকীর দিকে তাকিয়ে শুধু ম্লান হাসলো রুমা।

সেই বীভৎস কালো চেহারা, গায়ে কপালে উল্কি। কুৎসিত চেহারার নাকে কানে রুপোর ভারী ভারী গহনায় আরো যেন

বীভৎস করে তুলেছে তাকে। হলদে দাঁত বের করে হাসলো কৌতুকী। ঠিক সেই প্রথম দিনের মতই।

কিন্তু, কি আশ্চর্য, রুমার একবারও মনে হলো না কৌতুকীর চেহারাটা কুৎসিত। মনে হলো না, বীভৎস। কৌতুকীর হাসিটাও বড় মধুর মনে হলো রুমার। অপরূপ রূপবতী একটি ম্লান বিষণ্ণ সেবার প্রতীক যেন। কত আপনজন, কত অন্তরঙ্গ মনে হলো।

না, এখন আর অন্য কোন বাসনা নেই রুমার। ও শুধু চায় সুপ্রিয় ভাল হয়ে উঠুক, সুপ্রিয় যেন ভাল থাকে। রুমার সঙ্গে জীবনে আর দেখা হবেনা। তবু সুপ্রিয় যেখানেই থাকুক, যেন ভাল থাকে।

বিষণ্ণ হাসি হেসে উঠে এলো রুমা, দাঁড়ালো কৌতুকীর সামনে, কৌতুকীও হাসলো, তাকালো চোখে চোখ রেখে। যেন নির্বাক দৃষ্টির মুখরতায় সান্ত্বনা দিতে চাইলো সে, বলতে চাইলো, ভয় নেই।

শ্রীলেখা দেবী বুঝলেন না, মিষ্টার সেন বুঝলেন না, শুধু কৌতুকী আর রুমা পরস্পরের চোখের ভাষা পড়ে নিলো। একজনের চোখে অনুনয়, অনুরোধ, আরেকজনের চোখে সান্ত্বনা, শান্তি!

ধীরে ধীরে ট্রাঙ্ক বেডিং সুটকেশ মাথায় নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেল কৌতুকী। একে একে সাইকেল রিক্সায় তুলে দিলো।

তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

ঠাকুর-চাকরের দলও এসে দাঁড়ালো রিক্সার সামনে।

হিমাদ্রিবাবুর হাতে তাদের বখশিসের টাকা দিয়ে রিক্সায় চেপে বসলেন মিস্টার সেন, রেশমকে পাশে নিয়ে। পিছনেরটায় উঠলেন শ্রীলেখা দেবী।

শ্রীলেখা দেবী ডাকলেন, আয় রুমা, তাড়াতাড়ি আয়।

এক পলকের জন্যে থমকে দাঁড়ালো রুমা। ন'নম্বরের খোলা

জানালার দিকে ব্যর্থ দৃষ্টি ফেললো একবার। তারপর কৌতুকীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

ঠোঁট কেঁপে উঠলো থরথর করে।

পাঁচ টাকার একখানা নোট বের করে কৌতুকীর হাতে গুঁজে দিলো রুমা, কৌতুকীর হাতখানা চেপে ধরলো। কোন কথা বলতে পারলো না।

ম্লান হাসি হাসলো কৌতুকী। পাঁচ টাকার নোটখানা রুমার হাতে ফিরে দিলো। বললে, কৌতুকী অছি। কৌতুকী অছি।

কৌতুকী আছে। কৌতুকী আছে। ভয় করবার কারণ নেই। ভয় নেই। কৌতুকী আছে।

হাসলো কৌতুকী। হাসতে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।

আর রুমা ছুটে এসে রিক্সায় উঠলো।

ক্রিং ক্রিং ঘন্টি বাজিয়ে সাইকেল রিক্সা চলতে শুরু করলো। স্টেশনের পথে।

আঁকাবাঁকা লাল ধুলোর রাস্তা। ছ'পাশে পাথরের বাড়ি। কুচালি গাছের ছায়া, দূরে দূরে খাটো মাপের টিলা। রাস্তার ছ'পাশে কেয়ার ঝোপ, কেয়া আর বেতের, সরু সরু কচি সবুজ বেতের স্ফুলিঙ্গ, দূরে দূরে পরিত্যক্ত প্রাচীন মন্দিরের চূড়া।

একপাশে মুখ ফিরিয়ে চুপচাপ বসে ছিল রুমা, আর গম্ভীর মুখে শ্রীলেখা দেবী মাঝে মাঝে আড়চোখে মেয়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

স্টেশনে এসে মালপত্র নিয়ে প্লাটফর্মে ঢুকতে না ঢুকতেই গাড়ি এসে গেল। হৈ চৈ হট্টগোলের মধ্যে কখন যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত ট্রেনের কামরায় উঠেছে, উঠে বসেছে রুমা, সে নিজেও যেন টের পায় নি।

ঘন্টি দিয়ে হুইসল বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিতেই তন্ময়তা ভেঙে

গেল রুমার। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ট্রেনের কামরার জানালায় মুখ রাখলো সে। বাইরের আকাশের দিকে তাকালো। আকাশ বাতাস মাটির দিকে।

ট্রেনের লাইন বঁড়শির মত বেঁকে গেছে। নতুন শহরকে দূরে ফেলে বাঁক নিয়েছে পান্থপাদপ হোটেল অ্যাণ্ড স্যানাটোরিয়ামের পাশ দিয়ে। এক দৃষ্টে হোটেলটার দিকে তাকিয়ে রইলো রুমা। রোদ উঠছে, উঠেছে। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে হোটেলের পাথুরে দেয়াল। গাঁদা ফুলের বাগান।

হঠাৎ টম আর বাদলকে মনে পড়ে গেল রুমার। ট্রেন যেতে দেখলেই সারা বারান্দা ছোটাছুটি করতো ছুটিতে, আর চিৎকার করতো—রেলগাড়ি চললো, রেলগাড়ি চললো।

বাদল যেদিন চলে গেল, টমকে বলেছিল, ট্রেনের জানালা থেকে দেখবো আমি, 'রেলগাড়ি চললো' বলবে কিন্তু।

লাজুক ছেলেটা বলেনি। রুমাল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। নাড়তে ভুলে গিয়েছিল সেদিন। আজ রুমাও যেন বাদলের মত ছোট্ট হয়ে গেছে, জানালায় মুখ রেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে হোটেলটার দিকে। ট্রেন চলেছে ঝিকঝিক করে। চলছে, চলবে। কিন্তু তার জন্যে কেউ আজ রুমাল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না।

হোটেলটা অদৃশ্য হতেই হঠাৎ দু'হাতের ওপর দু'চোখের প্লাবন বাঁধ মানাবার চেষ্টা করলো রুমা।

তারপর অনুভবে একটা নরম স্নেহের সান্ত্বনার স্পর্শ পেলো মাথার ওপর। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো রুমা।

সুখের সময়ে, শীতের সময়ে সবাই আসে। তারপর একে একে সকলেই চলে যায়।

শীত সরে গেছে, বসন্ত যায় যায়। আবার সেই পাথুরে মাটির ক্ষয়রৌদ্রের দুপুর। শীতের দিনের সবটুকু আরাম যেন এক নিঃশ্বাসে শুষে নেয় গ্রীষ্মের পিপাসা।

সকলেই একে একে চলে গেল। কিন্তু হিমাদ্রিবাবুর চলে যাবার উপায় নেই। এই হোটেলটার পাথুরে দেয়ালগুলোর মতই স্থাণু আর নির্জীব পড়ে থাকতে হবে তাঁকে। পাথুরে শরীর ঐ কৌতুকীর মত। জনমানুষের আর দেখা মিলবে না জেনেও আশায় আশায় চোখ চেয়ে থাকতে হবে। যদি কোন ইন্সিওরেন্সের দালাল, কিংবা ওষুধ কোম্পানীর রিপ্রেজেন্টেটিভ হঠাৎ এসে হাজির হয়। না, তার চেয়েও বড় আশা, আরেক শীতের স্বপ্ন নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে।

সুপ্রিয় ভাল হয়ে উঠছে, উঠেছে। দুর্বল শরীর নিয়ে ধীরে ধীরে বারান্দায় এসে বসে সে বিকেলে। দোতলার বারান্দা থেকেই হিমাদ্রিবাবুর সঙ্গে, কখনো বা বেলুর সঙ্গে দু'একটা কথা বলে।

লোকজন চলে গেছে বলেই হিমাদ্রিবাবুর প্রৌঢ়া স্ত্রীর মুখ দেখতে পাওয়া যায় মাঝেসাঝে। ঘোমটা খাটো করে বেলুর মা নীচের উঠোনে এসে জিজ্ঞেস করেন, কেমন আছো আজ?

—ভালই। ম্লান হাসি হাসে সুপ্রিয়।

কখনো বা সুপ্রিয় নিজেই বলে, রেডিওটা খুলে দিন না একটু।

বেলু ছুটে গিয়ে রেডিও খুলে দেয়।

ছেলের অসুখের খবর পেয়ে সুপ্রিয়র বাবা এসেছিলেন। সেদিন যথারীতি গৌরীকুণ্ডে স্নান সেরে এসে বললেন, কালই সুপ্রিয়কে নিয়ে চলে যাবো হিমাদ্রিবাবু।

এমন কিছু নতুন খবর নয়। হিমাদ্রিবাবু জানেন, যে আসে সে থাকবার জন্যে আসে না। সকলেই চলে যায়।

সন্ধ্যের সময় সুপ্রিয় কৌতুকীকে ডাকলো।—কাল সকালেই চলে যাবো কৌতুকী, হিসেবটিসেব মিটিয়ে নিতে বল।

বলতে গিয়ে খটকা লাগলো যেন। কৌতুকীর হিসেব কি মেটাতে পারবে সে! কে কার হিসেব মেটাতে পারে এ-সংসারে।

সুপ্রিয়র নিজেরই ভয় ছিল বিদায় নেবার মুহূর্তে সে হয়তো নাটকীয় কিছু একটা করে বসবে, হয়তো কৌতুকীর হাত ধরে উচ্ছ্বাসের স্বরে কত কি বলবে। হয়তো মেয়েদের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে সে।

না, কিছুই করলো না সুপ্রিয়। শুধু ওর ইচ্ছে হলো কৌতুকীকে কিছু মোটা টাকা বকশিস দিয়ে যেতে। কিন্তু লজ্জায় পেরে উঠলো না। এমন কি, স্বাভাবিক অবস্থায় যে টাকাটা দিয়ে যেত, সেটুকুও দিতে বাধলো। মনে হল, তার নিখাদ মনের ওজনটুকুও বুঝি বা একটা নিকেলের টাকার সঙ্গে সমান হয়ে যাবে।

রিক্সায় মালপত্র তুলে দিলো কৌতুকী। হিমাদ্রিবাবু বললেন, আবার আসবেন। বেলু বললো, আবার আসবেন সুপ্রিয়দা।

দূরে খাটো ঘোমটার আড়াল থেকে দুটি চোখ চেয়ে রইলো রিক্সার দিকে। সে দুটি চোখও যেন বলতে চাইলো, আবার এসো।

কৌতুকী কিছুই বললো না। ও শুধু তাকিয়ে রইলো। ওর চোখের সামনে দিয়ে রিক্সাটা ক্রিং ক্রিং শব্দ করে চলে গেল।

কৌতুকী জানে, যে যায় সে আর ফিরে আসে না। জীবনে কত মানুষকেই তো আসতে দেখেছে। জমজমাট হয়ে উঠতে দেখেছে পান্থনিবাস। তারপর একে একে সবাই চলে গেছে। ঠিক যেমনভাবে ওর জীবনে সকলেই এসেছে, হেসেছে, তারপর একে একে চলে গেছে। ওর স্বামী, পুত্রকন্যা, ওর মা-বাবা···আরো কত কে। তাই কাউকেই আর ফিরে আসতে বলে না ও। শুধু নরম স্মৃতির ঝাপসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তাদের চলে যাওয়ার পথের দিকে।

কিন্তু এমন হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে চলে না হিমাদ্রিবাবুর। আশা নেই জেনেও আশায় আশায় রাস্তায় ছুটে আসেন সাইকেল রিক্সার ক্রিং ক্রিং ঘণ্টি শুনলেই। মোটরবাসের হর্ন শুনলেই ছুটে আসেন। কিন্তু রিক্সা চলে যায় গেঁয়ো তীর্থযাত্রীদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে। মোটরবাস থামে না পান্থপাদপের সামনে।

তবু প্রতিদিন সকালে বাঁধানো খাতাটা আর হ্যাণ্ডবিলের তাড়া নিয়ে সাইকেলে চেপে বসেন হিমাদ্রিবাবু। স্টেশনের পথ ধরেন। নতুন যাত্রী খোঁজেন।

ট্রেন আসে, ট্রেন চলে যায়। হিমাদ্রিবাবু জানেন, বৃথাই তাঁর আসা-যাওয়া।

ক্লান্ত শরীর আর মন টেনে টেনে পান্থপাদপে ফিরে আসেন।

স্ত্রীর উদ্‌গ্রীব দুটি চোখের দিকে তাকাতে ভয় পান হিমাদ্রিবাবু।

চোখ না তুলেই বলেন, না, আসেনি কেউ।

কেউ আসে না, আসবে না, পরের শীত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, জানেন হিমাদ্রিবাবু। তবু প্রতিদিন স্টেশনের পথ ধরেন ট্রেনের সময় হলেই।

আর রাত্রে ঘুমের ঘোরে কখনো কখনো চমকে ওঠেন। ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙে গেলেই কোনদিন শুনতে পান, কৌতুকী বাসন মাজতে মাজতে কান্নার মত একটানা সুরে গান গাইছে। কোনদিন বা মনে হয়, পোষা বেড়ালটা সারা হোটেল ঘুরে বেড়াচ্ছে মিউ মিউ করে। যেন বেড়ালটাও কাঁদছে নির্জন নিস্তব্ধ প্রাণহীন পান্থনিবাসটার দুঃখে।
